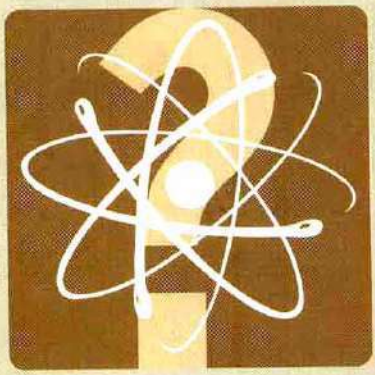
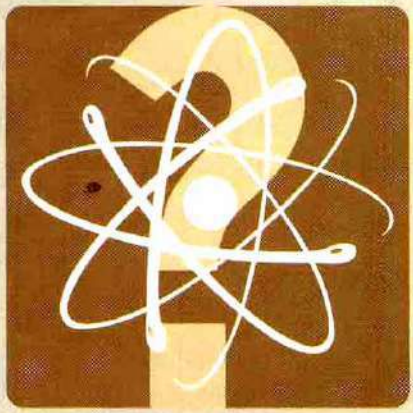
বিজ্ঞান জিনিসটি কী

এ কেমন বাস্তবতা



মুহাম্মদ ইব্রাহীম



বিজ্ঞানকে কিছুটা অন্তরঙ্গভাবে চেনার চেষ্টা করার জন্যই এই বই। এখানে তা করা হয়েছে বিজ্ঞানের বক্তব্যগুলোর মধ্যে বাস্তবতার খোঁজ নিয়ে। বিজ্ঞান দাবী করে যে দেখা না গেলেও তার তত্ত্বে দেয়া সব জিনিসই সত্য, এগুলো প্রকৃতিতে বাস্তবেই রয়েছে। এ দাবী আমরা মেনে নিই বিজ্ঞানের সাফল্যের কারণে, আর তার পদ্ধতিগুলোর নায্যতার কারণে। কিন্তু পদ্ধতিগুলোর কিছু কিছু দিকের দার্শনিক সমালোচনা আছে, সেগুলোর জবাব দিয়েই পদ্ধতিকে নায্য হতে হয়েছে। এ এক বড় কৃতিত্ব। প্রকৃতি আসলে অত্যন্ত জটিল। গাণিতিক মডেলিং করেই বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয়েছে প্রকৃতির এই জটিল আচরণকে সরল গাণিতিক নিয়মে ধারণ করা, যা প্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। অথচ গণিত জিনিসটি প্রকৃতিতে নেই, আছে গণিতবিদের মস্তিষ্কে। প্রকৃতিতে না থেকেই গণিত শুধু বিজ্ঞানের ভাষাই হয়নি; বরং গণিতের ভেতরেই প্রকৃতি কথা বলছে। এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার যার রহস্যও ভেদের চেষ্টা হয়েছে। বিজ্ঞানের বক্তব্য যে প্রকৃতির বাস্তব সত্য একথা স্বীকার না করলে বিজ্ঞানের সাফল্যকে অলৌকিক বলতে হয়। অবশ্য বিজ্ঞানের এই বাস্তবতার স্বরূপ প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। এ প্রশ্নগুলোর ভেতর দিয়ে গিয়েই বিজ্ঞান তার অনন্যতা লাভ করেছে। এই অনন্যতাকে বুঝতে ও উপভোগ করতে আমাদেরকেও সে পথেই যেতে হয়েছে।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বিজ্ঞান জিনিসটি কী

দ্বিতীয় খণ্ড

এ কেমন বাস্তবতা

বিজ্ঞান জিনিসটি কী

দ্বিতীয় খণ্ড

এ কেমন বাস্তবতা

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উ|ৎ|স|র্গ

আমার ছোট ভাই অকাল প্রয়াত

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরকে—

এদেশের সাংবাদিকতার অনেকগুলো ক্ষেত্রে যে তার অনন্য ছাপ রেখে গেছে। ছোটবেলা থেকে শেষ দিনগুলো পর্যন্ত যার প্রেরণা ও পরামর্শ আমার নানা কাজে ধারণ করেছি।

ভূমিকা

বিজ্ঞানকে কিছুটা অন্তরঙ্গভাবে চেনার চেষ্টা করার জন্যই এই বই। বিজ্ঞান কী বলেছে তা জানাটি এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। কিন্তু বিজ্ঞান কী ভাবে এ কথাগুলো বল্‌তে পারলো সেটি জানাও কম চমকপ্রদ নয়। বিজ্ঞানের কথাগুলো আমাদের সামনে প্রকৃতির রহস্যকে যেই রূপে হাজির করে আসল প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কটি কী ধরণের সেটি বুঝতে পারলে আমাদের কাছে বিজ্ঞান নিজে আর ম্যাজিকের মত রহস্যময় থাকে না; বরং তখন নিজেরাই দেখতে পাই বিজ্ঞানের অসামান্য সাফল্যের চাবিকাঠিটি কোথায়। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে আমরা এ কাজটি কিছুটা করার চেষ্টা করেছি বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোর গড়ে ওঠার ও বদলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করে, অনেকটা ইতিহাসের আদলে। ওটি বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ইতিহাস যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি সে আবিষ্কার করতে গিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলো যেভাবে গড়ে ওঠেছে তার ইতিহাস। ওখানে দেখেছি বিজ্ঞানের অনেকখানি সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্কের অনুমানে, আর অনেকখানি সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির পর্যবেক্ষণে। এই 'ভেবে জানা' আর 'দেখে জানার' টানাপোড়েনে ও মিশ্রণে আধুনিক বিজ্ঞান যে অনন্যতাটি পেয়েছে সেখানেই রয়েছে তার সাফল্যের সোনার খনি। আমাদের চেষ্টাটি ছিল সেই অনন্যতাটিকে ধরতে পারা।

বইয়ের এই দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা বিজ্ঞানকে চেনার চেষ্টা করেছি তার বক্তব্যগুলোর মধ্যে বাস্তবতার খোঁজ করে। বিজ্ঞান যা বলে তার সবকিছুকে আমরা সাদা চোখে প্রকৃতিতে দেখিনা। কিন্তু বিজ্ঞান দাবী করে যে তার বক্তব্যগুলো প্রকৃতির বাস্তবতারই অনুরূপ; অর্থাৎ কিনা বিজ্ঞানের তত্ত্বে দেয়া বাস্তবতাই প্রকৃতির আসল সত্য। আমরা এ দাবী মেনে নিই প্রধানত বিজ্ঞানের সাফল্যের কারণে। কিন্তু বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলোর নায্যতার মধ্যেই রয়েছে তার এরকম বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের প্রাণ-ভোমরা। বিজ্ঞানের জন্য পদ্ধতিগুলো চমৎকার কাজ দিলেও এগুলোর কিছু কিছু দিক কিন্তু দার্শনিকের কড়াকড়ি বিচারের ঊর্ধ্বে নয়। তাই সেই বিচারের এপিঠ-ওপিঠ দেখতে পেলে বিজ্ঞানকে চেনার কাজটি অনেক বেশি সম্পূর্ণ হয়, অনেক বেশি আনন্দেরও হয়। বিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব ধোপে টেকে শেষ পর্যন্ত এক্সপেরিমেন্টের যাচাইয়ের নিরিখে। কিন্তু সেই আনুমানিক তত্ত্বটি যদি আগে থেকেই এক্সপেরিমেন্টটির ওপর ভর করে তবে? সেটি যে তা করেনি তারও প্রমাণ চাই। এক্সপেরিমেন্টটি

যদি তত্ত্বটি থেকে স্বাধীন ভাবে হয়েও থাকে, তত্ত্বের একটি ভবিষ্যদ্বাণী এতে সত্য প্রমাণিত হলেই কি তত্ত্বটিও সত্য হয়ে যায়? তা হলে তত্ত্বকে কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে? পর্যবেক্ষণে যা দেখা গেলো তা তো ঠিক আছে, কিন্তু দেখা না গিয়েও যা তত্ত্বে এলো সেগুলো যে নেহাৎ কল্পকাহিনী নয় তার গ্যারান্টি কী? এটম, ইলেকট্রন জিন, রেডিয়ো তরঙ্গ এগুলোর সেরকম গ্যারান্টি কোথায়? এসব প্রশ্ন রয়েছে বৈকি।

পর্যবেক্ষণে বার বার ঘটতে দেখলে বিজ্ঞানী তাকে চিরকাল ঘটার মত সত্য মনে করে তত্ত্ব খাড়া করেন— কিন্তু চিরকাল না দেখে চিরকালের সিদ্ধান্তটি তিনি নিয়ে নেন কোন্ যুক্তিতে? এ ধরণের প্রশ্নগুলোকে গায়ে না মেখেই আমরা শুধু বিজ্ঞানের বক্তব্য ও তার দুর্দান্ত সাফল্য দেখেই মুগ্ধ হতে পারি। কিন্তু তা হলে বিজ্ঞানকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানার আরো বড় মুগ্ধতা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো। তা হতে চাইনা বলেই এসব প্রশ্নে বিজ্ঞানের জবাবগুলো জানার চেষ্টা করেছি।

হাজার হলেও প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল জিনিস। নিজের সীমাবদ্ধতার ভেতর প্রকৃতিকে পাওয়ার যে চাহিদা বিজ্ঞানের রয়েছে সেই সরল সুন্দর নিয়মে চল্‌তে প্রকৃতি বাধ্য নয়। বিজ্ঞানকে ওই জটিলতার মধ্য থেকেই সরল নিয়ম তৈরি করে নিতে হয়েছে এমন ভাবে যেন তা প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। প্রকৃতির যা যেমন দেখা গেছে শুধু তার বিবরণী দিয়ে গেলেই একাজ সম্ভব হতো না। এজন্য বিজ্ঞানীকে জটিল প্রকৃতির সরল মডেল খাড়া করতে হয়েছে। এ মডেলের যতগুলো না ধরা-ছোঁয়ার মত বাস্তব মডেল তার থেকে অনেক বেশি হলো গাণিতিক মডেল। প্রকৃতির জটিল আচরণকে গণিতের সরল সুন্দর নিয়মের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টাই সেই গাণিতিক মডেল। এতে প্রকৃতির আচরণের অনেক বেদরকারী দিক ছেঁটে ফেলে তাকে বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট করে ফেল্‌তে হয়— এক ভাবে যেমনটি করা হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে। এটি করতে পারার অনেক সুবিধা। এই গাণিতিক মডেল দিব্যি প্রকৃতির ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। কম্পিউটারের সুযোগ নিলে সেখানে বাস্তব ঘটনার সিম্যুলেশনে এই কাজে অনেক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েও তা তড়িৎ গতিতে করা যায়।

পদার্থবিদ্যার মতো ভৌত বিজ্ঞানে গাণিতিক মডেল এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছে যে বিজ্ঞান আর গণিত সেখানে একাকার হয়ে গেছে। এখন অন্যান্য বিজ্ঞানেও তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সেখানেও গণিতে-বিজ্ঞানে অদ্ভুত সখ্যতা। অথচ গণিত ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা জগতের বিষয়। গণিত জিনিসটাও যে কী তা একটুখানি দেখার চেষ্টা করে এখানে আমরা বরং দেখি গণিতের কোন জগতই নেই। এর জিনিসগুলো— সেই বিমূর্ত সংখ্যা, রেখা, সেট ইত্যাদি— বাস্তবে স্থানের কেথাও নেই, কালেরও কোথাও নেই। কেউ কেউ যদিও মনে করেন সে সবের জন্য রয়েছে স্থান-কালের বাইরে এক

মায়াবী জগত, অধিকাংশরা অবশ্য মনে করেন এসব শুধু গণিতবিদদের মস্তিষ্কের সৃষ্টি করা জিনিস। তাঁদের কেউ বলেন গণিত গুটিখেলার নিয়মের মত, আবার কেউ বলেন গল্প-উপন্যাসের মত— একেবারে বাস্তবতা বিবর্জিত খেলার নিয়মটার বা গল্পের প্লট্টার ভেতর পারস্পরিক সম্পর্কটাই সব কথা। এতে অবশ্য গণিতের অসামান্য সৌকর্যের একটুও হানি ঘটেনা, বরং এমনটি হওয়ার মধ্যেই তার সৌকর্য, বিজ্ঞানের কাছে তার এমন মূল্য। সেই গ্যালিলিওর আমল থেকে সবাই জানে গণিত বিজ্ঞানের ভাষা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এটি তার চেয়ে অনেক বেশি— গণিতের মধ্যেই প্রকৃতি কথা বলে। আইনস্টাইন এই ব্যাপারটিকে বলেছেন অত্যাশ্চর্য ঘটনা। যার স্থান শুধু মানুষের মস্তিষ্কে সেই গণিত প্রকৃতির কথা জান্‌লো কী করে? অত্যাশ্চর্য হলেও তারো কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সব কিছুর মধ্যে যেই প্রশ্নটি বার বার আসে— বিজ্ঞান যা বলে সেগুলো কি প্রকৃতির বাস্তব সত্য? এগুলোকে সত্য বল্‌তেই হবে, নইলে যে বিজ্ঞানের সাফল্যকে অলৌকিক ঘটনা বলা ছাড়া উপায় থাকে না। তবে ওই বাস্তবতায় সন্দেহ করেন এমন কেউ কেউ বলেন যে সাফল্যটি অর্জিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের 'কৌশলের' দ্বারা, এর জন্য বিজ্ঞানের সব জিনিসের সত্য হবার প্রয়োজন নেই। তাঁরা বরং আরেকটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন্— বিজ্ঞানের তত্ত্ব তো ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, আগের তত্ত্বও সত্য ছিল, তার জায়গায় ভিন্ন যে তত্ত্ব এলো তাও সত্য, এটি কেমন করে সম্ভব? বিজ্ঞানীরা অবশ্য একে সমস্যা মনে করেন্‌না— তাঁরা বলেন প্রত্যেকটি আসলে এক রকম 'আসন্ন সত্য'— তত্ত্ব যতই উন্নত হচ্ছে— তা ততই বাস্তব সত্যের কাছাকাছি যাচ্ছে। এটম, ইলেকট্রন, বা জিন্‌কে বিজ্ঞানী 'হাতুড়ি বাটালির মতই' দেখ্‌তে পাওয়া ধরাছোঁয়ার জিনিসগুলোর মতই বাস্তব মনে করেন, কারণ ওগুলোকে তিনি বিভিন্ন বিচিত্র ক্ষেত্রে হাতুড়ি বাটালির মতই অবলীলাক্রমে ব্যবহার করতে পারেন সাফল্যের সঙ্গে। বিজ্ঞানের বাস্তবতার এই স্বরূপটি না বুঝলে তার মর্মকথাটি বোঝা যায়না। ওপরের প্রশ্নগুলোকে তুচ্ছ না ভেবে তার ভেতর দিয়েই বিজ্ঞান অনন্য হয়েছে— সেই অনন্যতাকে উপভোগ করার সময় প্রশ্নগুলোর ভেতর দিয়ে গেলে আমাদের মুগ্ধতাটিও বাড়ে।

বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের মুগ্ধতা আরো এক ধাপ এগিয়ে যায় যখন এখানে দেখি প্রকৃতি নিজে কোয়ান্টাম তত্ত্বের মতো আচরণ করে, এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধু এভাবেই ধরা দেয়— যা কিনা আমাদের বোধশক্তিকে একেবারে হক্‌চকিয়ে দেয়। এমন প্রকৃতিকেও ধারণ করতে পারার মধ্যে বিজ্ঞানের যে রোমান্স তা আমাদেরকেও রোমাঞ্চিত করে বৈ কি!

মুহাম্মদ ইব্রাহীম
১০ ডিসেম্বর ২০১৯

সূচিপত্র

কষ্টিপাথরে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ১৩
জটিল প্রকৃতির মডেলিং ৬১
গণিত জিনিসটাও বা কী ৯৮
প্রকৃতির নিয়ম কেন গণিতে পাওয়া যায় ১৩৩
বিজ্ঞানের কথাগুলো কতটা বাস্তব সত্য ১৫৩
এলেম কোয়ান্টাম দেশে ১৯২
বিজ্ঞানের বেশধারী অন্য কিছু ২২০

কষ্টিপাথরে বিজ্ঞানের পদ্ধতি

বিজ্ঞানকে অন্য সব কিছু থেকে আলাদা করে প্রধানত তার কাজের বিশেষ পদ্ধতি। কিন্তু যতই ভাবা হয়েছে দেখা গেছে বিজ্ঞানের পদ্ধতি খুব সোজা-সাপ্টা কিছু নয়। যেহেতু বিজ্ঞান এ পদ্ধতির মাধ্যমেই প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান সৃষ্টির দাবী রাখে, কাজেই এগুলো যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে এসেছে, আজও হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এবং আরো বেশি করে বিজ্ঞান-দার্শনিক ও বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদরা এ পদ্ধতিগুলোকে সব সময় যেন কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখছেন। প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান সৃষ্টির ওই দাবীর এপিঠ-ওপিঠ ভাল করে দেখতেই এই যাচাই। এই যাচাই করে দেখাটাকে আমরাও যদি কিছুটা অনুসরণ করি তাহলে বিজ্ঞান কতখানি তার বক্তব্যকে বাস্তব সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে, আর তা কীভাবে সম্ভব হতে পারে, সেটি বুঝতে আমাদের অনেক সুবিধা হবে।

প্রকৃতির ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান যে খুবই সফল তা বুঝতে পারি যখন দেখি বিজ্ঞানের তত্ত্ব এ সম্পর্কে খুবই খুঁটিনাটি পর্যায়ে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। মনে করা হয় এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে প্রকৃতিকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা বিজ্ঞানীর অপরিহার্য কাজ বলে। বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব যদি প্রকৃতির সত্যকে ঠিক মতো ধরতে না পারতো তা হলে কি এমন সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হতো? অথচ প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল জিনিস। এর পরতে পরতে থাকা জটিলতাকে বিজ্ঞান যতটুকু আবিষ্কার করে তার থেকেই প্রকৃতির চূড়ান্ত জটিলতাকে কিছুটা আঁচ করা যায় মাত্র। পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞানী প্রকৃতির কতটাই বা দেখতে পান? অথচ কোন না কোন ভাবে বিজ্ঞানের তত্ত্বকে এইটুকু পর্যবেক্ষণের তথ্যের ওপরই নির্ভর করতে হয়। চোখে দেখা (যন্ত্রের মাধ্যমে হলেও) তথ্যটুকু কী ভাবে বিজ্ঞানের এমন সফল তত্ত্বে পরিণত হয় সেটি একটি বড় রহস্য—বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যেই যা লুকানো। পদ্ধতির ওপর ওই সব আলোচনা-সমালোচনা সেই রহস্যটি ভেদ করতে আমাদের সহায়ক হবে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকেই জ্ঞান, বাকি সব কথার হেরফের

অর্থপূর্ণ কথার কড়াকড়ি বিচার:

যে সময় বিজ্ঞানী আর দার্শনিকে তেমন কোন পার্থক্য ছিলনা সেই প্রাচীন কালে বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিতে পর্যবেক্ষণ যে করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা সব সময় মানা হয়নি। কিন্তু পরে এদিকটাতে বিজ্ঞানীরা বেশি তৎপর হয়েছেন, পর্যবেক্ষণের ওপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। আরো পরে পর্যবেক্ষণের পরিবেশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে এক্সপেরিমেন্টের দ্বারা একাজ করেছেন যেখানেই সম্ভব। সব পর্যবেক্ষণেই শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানী নিজের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ওপরেই নির্ভর করেন— সেটি সরাসরি চোখ-কানের মাধ্যমেই হোক, কিংবা যন্ত্রের ভেতর হয়ে তারপর চোখ-কানের মাধ্যমেই হোক। কাজেই পর্যবেক্ষণ থেকে যা পাই তা ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই পাই। বোঝাই যাচ্ছে বিজ্ঞান-জ্ঞানের বড় উৎসটাই হলো এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি (সেন্স ড্যাটা)। কিন্তু জ্ঞানের উৎস হিসেবে এর বাইরে কি কিছু নেই? এ নিয়ে বিতর্ক চলেছে বিজ্ঞানের পুরো ইতিহাস জুড়ে। সব বিজ্ঞানী জ্ঞান-বিচারের এ বিতর্কে অংশ নেননি বটে, কিন্তু সবাই নিজেদের মত করে বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে বুঝে সেভাবে চালিয়ে নিয়ে গেছেন বিজ্ঞান চর্চা।

পর্যবেক্ষণের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপরেই বিজ্ঞানের তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা উচিত— এ কথাটির ওপর খুব জোর দিয়েছেন আধুনিক কালে লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা। গত শতাব্দীর বিশের দশক থেকে তাঁরা খুব মনোযোগ পেয়েছেন এই ব্যাপারে— তাঁদের অত্যন্ত চাঁছাছোলা স্পষ্টবাদিতার কারণে। বিজ্ঞানের এই দার্শনিক গোষ্ঠির নামের মধ্যে 'পজিটিভিস্ট' কথাটি আছে কারণ তাঁরা অভিজ্ঞতায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে স্পষ্ট, এমন তত্ত্বই দেখতে চান; তাঁদের কাছে সেটিই শুধু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তার বাইরে যে কোন বক্তব্য হবে অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স), যা গ্রহণযোগ্য নয়। আর ওই 'লজিক্যাল' কথাটি এসেছে ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে পাওয়া তথ্যগুলো কীভাবে তত্ত্বে পরিণত হবে সে বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য থেকে। তাঁদের মতে এই প্রক্রিয়াটি হবে এক রকম লজিক বা যুক্তি অনুসরণ করে। সেটি নানা বিশেষ ক্ষেত্র সমূহে পর্যবেক্ষণের তথ্য থেকে সাধারণ একটি নিয়ম গড়ে তোলার যুক্তি।

অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব আরোপে তাঁরা শুধু বিজ্ঞানের কথা বলেননি— যে কোন অর্থপূর্ণ বাক্যের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে শুধু অভিজ্ঞতার কথাই একটি বাক্যকে অর্থপূর্ণ করতে পারে। অবশ্য এ ছাড়া সাধারণ যুক্তির কথাও (ডিডাকটিভ) বাক্যের মধ্যে থাকতে পারে। তবে সেটি অর্থপূর্ণ হলেও জ্ঞান-পূর্ণ হবেনা, কারণ যুক্তির কথায় কোন নতুন জ্ঞান থাকে না— একটি বক্তব্য থেকে অন্য একটি বক্তব্যে যাওয়া শুধু যায়। উদাহরণ স্বরূপ 'মানুষ মরণশীল' এই সাধারণ বক্তব্য থেকে যুক্তি অনুযায়ী 'এরিস্টোটল মরণশীল' এই নতুন

বক্তব্যে যাওয়া যায়— যেহেতু এরিস্টোটল একজন মানুষ। এক বক্তব্য থেকে অন্য বক্তব্যে এভাবে যাওয়াটি অর্থপূর্ণ বটে কিন্তু এতে নতুন কোন জ্ঞান নেই— জানা কথাটি ভিন্ন ভাবে বলা মাত্র। কাজেই লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা এরকম যুক্তির কথাকে বলেছেন নেহাৎ 'কথার হেরফের' (টটোলজি)। নতুন জ্ঞান আসতে পারে শুধু অভিজ্ঞতা থেকে, অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ থেকে। পর্যবেক্ষণে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাই তাই বিজ্ঞানের তত্ত্বের সুউচ্চ ভবনের আসল ইট। এই ইটকে গাঁথবার সুবিধার্থে তার সঙ্গে কিছু যুক্তির কথা থাকতে পারে— যদিও সেটি নেহাৎ কথার হেরফের। এই দুইয়ের বাইরের কোন কথা বিজ্ঞানে তো নয়ই, কোন অর্থপূর্ণ বাক্যেই সম্ভব নয়।

লজিক্যাল পজিটিভিস্টদের মতে তত্ত্বের মধ্যে জ্ঞানকে আসতে হয় অভিজ্ঞতায় যাচাই হয়ে— সেটিকে তাঁরা বলেছেন প্রত্যায়নের নীতি (ভ্যারিফিকেশন প্রিন্সিপল)। এতে কোন জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে স্পষ্ট ধরা পড়লে তবেই সেটিকে প্রত্যায়িত হয়েছে বলে ধরা যাবে এবং অর্থপূর্ণ হবে। কিন্তু পরে দেখা গেছে এত কড়াকড়ি ভাবে অভিজ্ঞতায় প্রত্যায়িত করতে গেলে অনেক প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও 'অর্থপূর্ণ' হওয়া থেকে বাদ পড়ে যায়। এ জন্য প্রত্যায়নের নীতির একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর রূপকেই অনেকে গ্রহণ করেছেন। এই দুর্বলতর রূপে জ্ঞানটি সরাসরি পর্যবেক্ষণে এসেছে এই মর্মে প্রত্যায়িত না হলেও চলে, পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় এর সম্ভাবনাটি প্রত্যায়িত হওয়াই যথেষ্ট। 'আর্সেনিক বিষক্রিয়া করে' এমন একটি বক্তব্য সব সময় প্রত্যায়িত হবে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায়না, কিন্তু বক্তব্যটি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এসেছে— সে জন্য এর আবার প্রত্যায়নের সম্ভাবনাটি রয়েছে। কাজেই সম্ভাবনার দুর্বলতর নীতিতে এটি গ্রহণযোগ্য। অন্য দিকে 'মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা এই দুটি প্রাচীন নগরী একই সভ্যতার মানুষের সৃষ্টি'— এ বক্তব্যটিও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এসেছে, তবে তা সাক্ষ্য প্রমাণের পরোক্ষ পর্যায়ের সম্ভাবনার অভিজ্ঞতা; নিশ্চিত করে এমন কোন পর্যবেক্ষণ এখন করা যাবেনা যে কড়াকড়িভাবে প্রত্যায়নের নীতি প্রয়োগ করা যাবে। এই দুটি বক্তব্যকেই তাই প্রত্যায়নের কড়া নিয়মে পাশ করানো যায়না, শুধু দুর্বলতর সম্ভাবনার নিয়মে প্রত্যায়ন করা যায়। সে যাই হোক, লজিক্যাল পজিটিভিস্টদের মতে দুর্বলতর রূপে হলেও প্রত্যায়নের নীতিতে পাশ করা অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যই তত্ত্বে স্থান পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। কিন্তু সেই তথ্যটি তত্ত্বে পরিণত হবে কী উপায়ে?

ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে জ্ঞান সৃষ্টি:

একটি বক্তব্যে কোন জিনিসের থেকে ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে আসতে পারে এমন সব গুণ বাদ দিয়ে যদি বলি শুধু 'জিনিসটি' তা হলে তার কোন অর্থ হয় না। জিনিসটির নীল হওয়া, গরম হওয়া, গোল হওয়া, নমনীয় হওয়া ইত্যাদি

রকমের সব কথা বাদ দিয়ে যদি মনে করার হয় যে জিনিসটি একাই যথেষ্ট (থিং ইন ইটসেল্‌ফ)— লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা তাকে একটি অর্থহীন হেঁয়ালী মনে করেন। ওটি নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হয়না, কোন জ্ঞানও সৃষ্টি হয়না। অভিজ্ঞতাতে প্রত্যায়নই ঠিক করে দেয় কোন্ বক্তব্য অর্থপূর্ণ; আর প্রত্যায়ন মানে হলো দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, স্বাদ-গন্ধ নেয়া। হ্যাঁ 'অনুভূতিগুলো তো বুঝলাম কিন্তু এরা তত্ত্বে যাবে কী রূপে? এর উত্তর— তত্ত্ব হলো এগুলোর সমন্বয়ে গড়া একটি যৌক্তিক নির্মাণ (লজিক্যাল কনস্ট্রাকশন)। উদাহরণ স্বরূপ— নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব গড়া হয়েছে কেপলার, গ্যালিলিও প্রমুখের চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-তারা পর্যবেক্ষণে দর্শনানুভূতি সমুহের সমন্বয়ে গড়া একটি যৌক্তিক নির্মাণ হিসেবে। মূলত ইনডাকশন থেকে সেটি এসেছে। ইনডাকশন কথাটির মানেই হলো অতীতে বারবার হতে দেখে সব সময় এটি হবে এমন একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত; সব সময় দেখার সুযোগ ছাড়াই কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে দেখে সাধারণ নিয়মে পৌঁছে যাওয়া। অবশ্য ইনডাকশনের সঙ্গে গণিতের আকারে বেশ কিছু যুক্তির কথাও এসেছে মহাকর্ষ তত্ত্ব সৃষ্টিতে। কিন্তু যুক্তির কথা তো কথার হেরফের — নতুন জ্ঞান নয়। জ্ঞান দিয়েছে শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

পর্যবেক্ষণে চোখের বা অন্য ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি থেকে যা বলা হবে সেটি হলো পর্যবেক্ষণ-বক্তব্য। আর সেগুলো দিয়ে যৌক্তিক নির্মাণে তত্ত্ব সৃষ্টির পর তাকে যে ভাবে বলা হবে সেটি হবে তত্ত্ব-বক্তব্য। লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা মনে করেন এই দুই রকম বক্তব্যের চরিত্রে কোন মিল নেই। এর কারণ যৌক্তিক নির্মাণের মধ্য দিয়ে তত্ত্বে যাওয়ার পর পর্যবেক্ষণ-বক্তব্যের চরিত্রটি আর সেখানে বজায় থাকে না। আবার পর্যবেক্ষণের ওপরও ওই তত্ত্ব বা কোন তত্ত্বের কোন প্রভাব থাকে না— তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ উভয়ে পরস্পর স্বাধীন। অর্থাৎ আমাদের উপমায় ইটের ওপর ভবনের এবং ভবনের ওপর ইটের কোন প্রভাব নেই। এই যে তত্ত্ব থেকে পর্যবেক্ষণের স্বাধীন থাকতে পারা— একথা অবশ্য সবাই মানেন না, সেটি আমরা শিগ্‌গির দেখবো।

সব পর্যক্ষেণ-বক্তব্যে কোন না কোন ভাবে থাকে পরিমাপের কথা; আর সব পরিমাপই শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি। যদি এমনি একটি কথা হয় 'উত্তাপ ৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস'— তার মানে সেটি থার্মোমিটার পারদের অগ্রভাগটি ৯০ ডিগ্রি দাগের সঙ্গে মিলে গেছে এমনটি চোখে দেখা, চোখের রেটিনায় তার ইমেজ পড়া, তার থেকে মস্তিষ্কে দেখার অনুভূতি জাগা। এটিই অনুভূতি-তথ্য। এরকম অনুভূতি-তথ্যের ওপর গড়া না হলে কোন বক্তব্য অর্থপূর্ণ হয়না— লজিক্যাল পজিটিভিস্টদের এমন কড়াকড়ি ধারণাকে আধুনিক পদার্থবিদ্যার কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব জোরালো সমর্থন দিয়েছে। যেমন কোয়ান্টাম তত্ত্বের অনিশ্চয়তা নীতি ক্ষুদ্র একটি ইলেকট্রনের অবস্থান ও বেগ একসঙ্গে তত্ত্ব

থেকে নিখুঁত ভাবে জানতে দেয়না (এ বইয়ের প্রথম খন্ডে আলোচিত)। এর একটি শত ভাগ নিশ্চয়তার সঙ্গে জানলে অন্যটি অসীমভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। নিশ্চিত ভাবে এর অবস্থান অথবা বেগ জানা গেছে তত্ত্বের এমন বক্তব্য তাই অর্থপূর্ণ হবেনা। কিন্তু বাস্তবে যখনই যন্ত্রের সাহায্যে ইলেকট্রনকে উদ্ঘাটন করা হয়, যা শেষ পর্যন্ত যন্ত্রের কাঁটা দেখে বা শব্দ শুনেই ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে আসে, তখন কিন্তু আর কোন অনিশ্চয়তা থাকে না— সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও সুনির্দিষ্ট বেগেই তাকে পাই। তখন কিন্তু অর্থপূর্ণ ভাবেই আমরা বাস্তব-তথ্য পাই। এর আগে পর্যন্ত ইলেকট্রন শুধু 'সম্ভাবনার তরঙ্গ' হিসেবে বিবেচিত হয়।

শুধু কথার হেরফের হয়েও যা জরুরিঃ

লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা যুক্তি বিস্তারের সব বাক্যকে বলেছেন কথার হেরফের। একটি বক্তব্যকে যদি সত্য বলে জানি তা হলে এর থেকে যুক্তির মাধ্যমে আরো যতরকমের বক্তব্য বের করতে পারি সবই স্বয়ংক্রিয় ভাবে সত্য হবে। এর জন্য আলাদা করে ওগুলো সম্পর্কে কোন পর্যবেক্ষণ করতে হবেনা, করলেও তা নতুন কিছু জানাবেনা। মূলধারার লজিক এরকমই। একে বলা হয় ডিডাকশন বা বা ডিডাকটিভ লজিক— একটি সাধারণ বক্তব্য থেকে যুক্তিতে একটি বিশেষ বক্তব্যে যাওয়া। এরকম একটি যুক্তি বিস্তার দেখিঃ

সবুজ কমলা টক হয়,
এটি একটি সবুজ কমলা,
কাজেই এটি টক।

এটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য একটি লজিক। কেউ যদি জানেনও যে সব সবুজ কমলা টক হয়না তিনিও বলবেন এই লজিকে কোন ত্রুটি নেই। এর কারণ প্রথম দেয়া বক্তব্য অনুযায়ী সবুজ কমলা মাত্রই টক হলেই শুধু সিদ্ধান্তটি ঠিক হবে। দেয়া বক্তব্যের আসল সত্য-মিথ্যার সঙ্গে লজিকের কোন সম্পর্ক নেই— ব্যাপারটি শুধুই যুক্তির। ধরা যাক আমাদের পরবর্তী যুক্তি-বিস্তারটি এরকমঃ

অনেক সবুজ কমলা টক হয়,
এটি একটি সবুজ কমলা,
কাজেই এটি টক।

এবার কিন্তু লজিকটি ত্রুটিপূর্ণ। এখানে প্রথম দেয়া বক্তব্য অনুযায়ী যেহেতু সবুজ কমলা মাত্রই টক হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই কাজেই এর থেকে নেয়া সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক হয়নি। বাস্তবে কমলাটি সত্যি সত্যি টক কিনা সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আসলে দেয়া বাক্যগুলোর মধ্যেই সিদ্ধান্তটি নিহিত আছে— পুরো লজিকটায় নতুন কিছু জানা যায়নি। এজন্যই একে কথার হেরফের বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের কাছে এবং

দৈনন্দিন জীবনে লজিকের গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন জ্ঞান না দিলেও জ্ঞানকে স্পষ্ট করার ব্যাপারে তার সাহায্য ছাড়া চলেনা— সেটি ওপরের এই সরল যুক্তি বিস্তারে স্পষ্ট না হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে যুক্তির মাধ্যমে যেভাবে নানা ফলাফল পাওয়া যায় তার থেকে ঠিক বোঝা যায়। এর দায়িত্ব হলো বিশ্লেষণ-মূলক (এ্যানালাইটিক)। এর জন্য যুক্তি জাল অনেক বিস্তৃত আর জটিল হতে পারে। লজিকের গুরু এরিস্টোটলের হাতেই এর নিয়মগুলোর অনেকগুলোই সুন্দর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যা মানুষের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক যুক্তিবাদিতার ওপরেই মূলত প্রতিষ্ঠিত। এটি পরে গাণিতিক রূপও পেয়েছে। গণিত নিজেই কিন্তু সর্বাংশে খুবই সুসংবদ্ধ এক রকম লজিক, আর সেই অর্থে গণিতও কথার হেরফের। আমাদের স্কুলের জ্যামিতিতে এক একটি উপপাদ্য প্রমাণের জন্য যুক্তি প্রয়োগ করে সেটি আমরা বুঝেছি। যেমন ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি এটি কোণ মেপে দেখা নতুন জ্ঞান নয়, ত্রিভুজের সংজ্ঞা আর স্বতসিদ্ধগুলো থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে এক এক করে আগের উপপাদ্যগুলো প্রমাণের মাধ্যমে যুক্তিতেই ওটি এসেছে। তেমনি ২+২=৪ এতে সমান চিহ্নের দুই পাশে একই কথা ২+২ কে ৪ বলা হয়েছে মাত্র। গণিতের নিজের মধ্যে কোন বাস্তব জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানে গণিতের ব্যবহার তাকে কোথায় নিয়ে গেছে সেটি দেখেই তো বোঝা যায় বিজ্ঞানে লজিকের স্থান। অবশ্য পরে দেখবো গণিতের মধ্যে বাস্তব জ্ঞান নেই একথা অনেকে মানেননা। গণিত সহ লজিকের আসল কাজ হলো যুক্তিতে বিশ্লেষণ। এখানে আপাতত শুধু ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া এড়াতে লজিকের বিশ্লেষণ-ক্ষমতার কিছু উদাহরণ দেখতে পারি। এরকম ভুল সিদ্ধান্ত নেয়াকে বলে ফ্যালাসি বা ভ্রান্তি। কী পরিস্থিতিতে আমরা ভুল যুক্তিতে ভুল সিদ্ধান্তের খপ্পরে পড়তে পারি তা এগুলো দেখিয়ে দেয়। এগুলোও সেই প্রাচীন কাল থেকে লজিক বিদ্যার প্রতিষ্ঠিত অংশ। সচরাচর এরকম ভ্রান্তি ঘটে বলেই এগুলো এভাবে সামনে এসেছে।

ভুল সিদ্ধান্তের আমাদের প্রথম উদাহরণ—
সব রাশিয়ানরা বিপ্লবী,
সব নৈরাজ্যবাদীরা বিপ্লবী,
অতএব সব রাশিয়ানরা নৈরাজ্যবাদী।

যুক্তিটি ভুল বলেই সিদ্ধান্তটি ভুল। যুক্তির ভ্রান্তিটি হলো দ্বিতীয় দেয়া বক্তব্যের সঙ্গে প্রথম দেয়া বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নেই— দ্বিতীয়টির প্রাসঙ্গিক অংশটি (নৈরাজ্যবাদীরা) প্রথমটিতে আদৌ নেই। যুক্তির মধ্যে দ্বিতীয় বক্তব্যটি ঠিক মাঝের অংশ। এজন্য এরকম ভ্রান্তিকে 'মাঝের বক্তব্যের বন্টনের অভাবজনিত ভ্রান্তি' বলা হয়। এ লক্ষণটি দেখে আমরা যুক্তির মধ্যে এরকম ভ্রান্তিকে এড়াতে পারি।

যৌক্তিক ভ্রান্তির আর একটি উদাহরণ নেয়া যাক—
সব কুকুর স্তন্যপায়ী,
কোন কুকুর বেড়াল নয়,
অতএব কোন বেড়াল স্তন্যপায়ী নয়।

এখানেও যুক্তির ভুলটি লক্ষ্যনীয়। প্রথম দেয়া বক্তব্যে এমন কোন কিছু নেই যা অন্য স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। দ্বিতীয় দেয়া বক্তব্যেও সে রকম কিছু নেই। অথচ সিদ্ধান্তে তেমনটিই আছে। সিদ্ধান্তে কোন কথা থাকলে তা আগের দেয়া বক্তব্যগুলোতে থাকতে হবে, নইলে সিদ্ধান্ত অবৈধ হওয়াটাই লজিকের নিয়ম। এরকম ভ্রান্তিকে বলা হয় 'অবৈধ পরবর্তী বক্তব্যের ভ্রান্তি'।

লজিকের ভ্রান্তির আরো একটি উদাহরণ—
কোন কুমোর একাউন্টেন্ট নন,
কোন কোন কারুশিল্পী কুমোর,
কাজেই অন্য কারুশিল্পীরা একাউন্টেন্ট।

এখানে ভ্রান্তির কারণ হলো না-বাচক দেয়া বক্তব্যকে হ্যাঁ-বাচক সিদ্ধান্তের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। লজিকের নিয়মই হলো দেয়া বক্তব্যের একটিও যদি না- বাচক হয়, তাহলে কোন হ্যাঁ-বাচক সিদ্ধান্ত হতে পারবেনা। তাই এই ভ্রান্তিটির নাম 'না-বাচক বক্তব্য থেকে হ্যাঁ-বাচক সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি'।

এখানে লজিকের কয়েকটি ভ্রান্তির নিয়মের উদাহরণ দিলাম এটি বোঝাতে যে এমনি ধারা লজিকের অনেক নিয়মের মাধ্যমে এক একটি দেয়া বক্তব্য থেকে অন্যান্য নানা রকম বক্তব্যে যাওয়ার সময় ভুল যুক্তি যাতে না ব্যবহৃত হয় তার ব্যবস্থাও লজিকে রয়েছে। যেহেতু যুক্তির নিয়ম ছাড়া বাইরের পর্যবেক্ষণ বা অন্য কোন কিছুর ওপর লজিকের সিদ্ধান্তকে নির্ভর করতে হয়না তাই ভ্রান্তি এড়ানো এই সব যৌক্তিক সিদ্ধান্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবেই একেবারে অনিবার্যভাবে সঠিক। অবশ্য এদের কাজ শুধুই বিশ্লেষণধর্মী, এরা কোন নতুন জ্ঞান দেয়না, লজিক্যাল পজিটিভিস্টদের ভাষায় তাই এরা 'কথার হেরফের'। তত্ত্বতে যেহেতু নতুন জ্ঞান থাকতে হবে তাই তার ভিত্তি হতে হয় বিশ্লেষণ-ধর্মী (এ্যানালাইটিক) বক্তব্যে নয় বরং সংশ্লেষণ-ধর্মী (সিনথেটিক) অর্থাৎ নতুন জ্ঞানে গড়া বক্তব্যে— যা কিনা অবশ্যই আসে পর্যবেক্ষণ বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে। সেভাবে না আসলে তত্ত্ব হবে শুধু কথার হেরফের, নয়তো একেবারেই অর্থহীন।

বিজ্ঞানের পদ্ধতির যে চিত্র লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা দেন তা অতি কড়াকড়ি একটি চিত্র। এখন অধিকাংশ বিশ্লেষকরা মনে করেন যে এত কড়াকড়ি ভাবে

এটি মেনে বিজ্ঞানী কাজ করেননা, করলে বিজ্ঞানেরই অনেক জিনিস বাদ পড়ে যাবে। তবু আমরা পদ্ধতির আলোচনা একে নিয়েই শুরু করলাম তার চাঁছাছোলা মতবাদের জন্য— বিশুদ্ধতার জন্য। তাঁদের কড়া মতবাদের মূল লক্ষ্য হলো বিজ্ঞানের আলোচনা থেকে মেটাফিজিক্সকে বাদ দেয়া। সমালোচকরা বলেন এটি সর্বাংশে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান মেটাফিজিক্সকে প্রশ্রয় না দিলেও বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু মেটাফিজিক্যাল নীতি রয়ে গেছে যা পর্যবেক্ষণের উর্ধ্বে। উদাহরণ স্বরূপ বিজ্ঞান যে তার তত্ত্বে সারল্য খোঁজে, সরল ও সুন্দর তত্ত্বকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করে, তা তো এক রকম মেটাফিজিক্সই— যাকে এক্সপেরিমেন্ট করে প্রমাণ করা যাবেনা। সব চেয়ে বড় কথা হলো এই যে 'প্রত্যায়নের নীতি' লজিক্যাল পজিটিভিস্টদের কাছে একেবারে মৌলিক জিনিস তাও কি এক রকম মেটাফিজিক্স নয়? এটিও তো পর্যবেক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্ট করে তাঁরা পাননি। বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে এরকম কিছু জিনিসকে ধরে নিতে হয়— তার চরিত্র মেটাফিজিক্সের মত হলেও। লজিক্যাল পজিটিভিস্টদের বিরুদ্ধে আর একটি বড় সমালোচনা হলো পর্যবেক্ষণকে তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করার ব্যাপারটি। আমরা দেখবো বাস্তবে পর্যবেক্ষণ এতটা স্বাধীন থাকে না। তাছাড়া পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াটি হলো ইনডাকশন— অর্থাৎ বার বার কিছুবার হতে দেখে তার থেকে সর্ব-প্রযোজ্য সাধারণ সিদ্ধান্ত টানা। দেখবো এটি সহ পর্যবেক্ষণ থেকে তত্ত্বে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াটি নানা বিপত্তিতে পূর্ণ।

পর্যবেক্ষণ-তথ্য থেকে তত্ত্ব সৃষ্টিতে বিপত্তি

পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বের আলাদা সত্ত্বাঃ

চোখ মেলে পর্যবেক্ষণ করলাম, আর যা জানার জেনে গেলাম— ব্যাপারটি কিন্তু এরকম নয়। পর্যবেক্ষণের গোড়াতেই কিছু বস্তুগত বিপত্তি আছে, দার্শনিক বিপত্তির কথা তো আসে আরো পরে। দৃষ্টি বিভ্রমের কথা ধরা যাক— যার মানে চোখের সামনে যা আছে তা না দেখে পরিবেশের, চোখের, কিংবা মস্তিষ্কের বিশেষ পরিস্থিতির কারণে অন্য রকম দেখা। অনেক সময় নিজের ভাবনা বা পারিপার্শ্বিকতার কারণে যা আছে তা না দেখে বা না শুনে যা দেখতে ও শুনতে চাই তাই দেখি ও শুনি— অনেকটা গায়েবী আওয়াজ পাওয়া বা ভূত দেখার মত। তারপর একই জিনিস নানা জনে দেখার পর কী দেখলাম সেই ব্যাপারে ঐক্যমত্যের প্রশ্ন আছে। একাধিক পর্যবেক্ষণকারী যখন লাল রঙের কিছু দেখেন তখন তাঁরা একমত হয়ে একে লালই বলেন— যদিও কারো রং-কানা হবার মত অস্বাভাবিকতা থাকলে সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু সবার লালের অনুভূতি যে এক সেটি নিশ্চিত হবো কী করে? তবে এসব বিপত্তির সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং তা পর্যবেক্ষণে শেষ পর্যন্ত মৌলিক ধরণের কোন বিপত্তি সৃষ্টি

করেনা। যেমন বিপুল সংখ্যক স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণকারীর মতামত অল্প সংখ্যক রং-কানা পর্যবেক্ষণকারীর মতামতকে বর্জন করতে সাহায্য করে। তাছাড়া লাল রঙের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত চেতনার ওপর ভরসা না করে পর্যবেক্ষিত রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ মেপে নেয়া যায়— তা লাল রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘের সীমার ভেতর পড়ে কিনা দেখতে। পর্যবেক্ষণের আসল বিপত্তিগুলো আসে অন্য দিক থেকে। এগুলো দার্শনিক বিপত্তি। সেই বিপত্তিগুলো বিজ্ঞানীরা যে তাঁদের কাজের সময় লক্ষ্য করেন তা নয়; তাঁরা তাঁদের নিয়মমত কাজ করে যান। এতে তাঁদের কাজের ফলাফল যে প্রশ্নবিদ্ধ হয় তাও নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের সত্যকে বুঝতে হলে বিজ্ঞানের পদ্ধতির এই দার্শনিক প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন আছে।

পর্যবেক্ষণ জিনিসটি প্রকৃতিতে যা যেভাবে আছে তার পর্যবেক্ষণ হতে পারে, আবার নিজের আয়োজনে সৃষ্টি করা নিয়ন্ত্রিত এক্সপেরিমেন্টে পর্যবেক্ষণ হতে পারে। এর ফলাফল যে সব বাক্যে বা প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয় তাতে কী থাকে? আগেই দেখেছি শেষ পর্যন্ত তা হলো পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ানুভূতি বোধ বা অভিজ্ঞতার প্রকাশ। যদি তা অণুবীক্ষণের মত যন্ত্রের ভেতর দিয়েও হয় ব্যাপারটি কিন্তু একই। এসব হচ্ছে রং, আকৃতি ইত্যাদির বোধ অথবা ডায়ালের কাঁটা, পারদের স্তম্ভ ইত্যাদি কোথায় গিয়ে ঠেকলো, কিংবা ডিজিটাল মিটারে কত সংখ্যা উঠলো ইত্যাদির বোধ। এর মধ্যে ব্যক্তিগত বোধকে ছাড়িয়ে একটি সর্বজনীন ঐক্যমত্যের পর্যবেক্ষণ-তথ্য বিজ্ঞানী সৃষ্টি করতে পেরেছেন। আরো একটি কাজ বিজ্ঞানী চমৎকার ভাবে করেছেন— ডায়ালের কাঁটাকে যেমন তিনি পর্যবেক্ষিত বলে গ্রহণ করেছেন সেই সঙ্গে ওই কাঁটার এই অবস্থান যার কারণে ঘটেছে তাকেও তিনি পর্যবেক্ষিত বলে ধরে নিতে পেরেছেন। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। ধরা যাক কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করে দেখছি কারেন্ট বাড়ালে কী ভাবে বিদ্যুৎ-বর্তনীর অংশ লোহার পেরেকটির ওপর তামার পাতলা আবরণ পড়াটাও বেড়ে যায়। এটি দেখতে গেলে কারেন্টকে এবং আবরণ পড়ার পরিমাণকে উভয়কে মাপতে হবে। আবরণটি সরাসরি দেখা যায়। কিন্তু কারেন্টটি দেখা যায়না, এজন্য বর্তনী সংযুক্ত মিটারে দেখেই তার বাড়া-কমা বুঝতে হয়। এখানে পর্যবেক্ষণটি একেবারেই ঘোরা পথে পরোক্ষভাবে ঘটছে, আর বিজ্ঞানী তার থেকেই কারেন্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন বলে মেনে নিচ্ছেন।

অন্য উদাহরণে এটি তার চেয়েও ঘোরাপথে ঘটতে পারে। রোগ নির্ণয়ের জন্য হাসপাতালে ব্যবহৃত এমআরআই যন্ত্রে মস্তিষ্ক স্ক্যান করে চিন্তা, বিষণ্নতা ইত্যাদির প্যাটার্ন বোঝা যায়। স্ক্যানে চোখে যা দেখতে পাওয়া যায় তা হলো মস্তিষ্ক থেকে আসা আলো-ছায়ায় গড়া ইমেজ। কিন্তু বিজ্ঞানী জানেন এতে মস্তিষ্ককে কিছু ক্ষণস্থায়ী চৌম্বক পাল্‌স দেয়া হচ্ছে। রক্তের হেমোগ্লোবিনের

এটমে থাকা প্রোটন কণিকাগুলোতে ওই কণিকার চরিত্র-অনুযায়ী এক রকম বিশেষ ঘূর্ণন রয়েছে নিজের ওপর নিজেরই। চার্জযুক্ত কণিকার এই ঘূর্ণন নিজের মধ্যে একটি ছোট চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। এই দুই চৌম্বক ক্ষেত্রের পরস্পর-ক্রিয়ায় ওখানে একটি রেডিও সিগ্‌ন্যাল তৈরি হয়। হেমোগ্লোবিনে অক্সিজেন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে সিগন্যালটি ভিন্ন রকমের হয়। এরকম অক্সিজেন বেশি থাকে যখন মস্তিষ্কের এই অংশের স্নায়ুকোষ 'উত্তেজিত' অবস্থায় থাকে, কম থাকে যখন তা 'নীরব' অবস্থায় থাকে। ওই বেশি বা কম জোরালো সিগন্যাল স্ক্যানে আলো-ছায়া হিসেবে দেখা দেয়। তা হলে এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক কী দেখছেন? তা কি স্নায়ুর কাজের মাত্রা, নাকি রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ, নাকি প্রোটনের ঘূর্ণনের প্রকৃতি, না কি রেডিও সিগন্যালের মাত্রা, নাকি অন্য কিছু? এর ঠিক কোন্‌টি বিজ্ঞানী দেখছেন তা আলাদা করে জানা বিজ্ঞানীর কাছে জরুরি কিছু নয়, কারণ সবকিছুর ফলাফলটি একই— যতক্ষণ এর কিসে কী হচ্ছে তা তাঁর জানা থাকে। তিনি আসলে ক্ষেত্র বিশেষে বিষণ্নতার প্রকৃতি, চিন্তার প্রকৃতি ইত্যাদিই স্ক্যানে দেখতে পাচ্ছেন, সেটিতেই তাঁর আগ্রহ। এটি তাঁর কাছে পর্যবেক্ষিত; সেই সঙ্গে ওপরে যতকিছু বলা হয়েছে তার সবও তাঁর কাছে পর্যবেক্ষিত। কাজেই সাধারণত যে সব জিনিস আমরা পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য মনে করি সেই স্নায়ুর কাজ, রক্তে অক্সিজেন, প্রোটন, বিষণ্ন মস্তিষ্ক ইত্যাদি বিজ্ঞানীর কাছে পর্যবেক্ষিত— তবে অত্যন্ত ঘোরাপথে। এখানে এসবের সঠিক তত্ত্বটি খুবই অপরিহার্য, সেটিই সব কিছু ঠিক করে দিচ্ছে। কিন্তু পর্যবেক্ষণের বক্তব্য আর তত্ত্বের বক্তব্য আলাদা, প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে যাওয়াতে সমস্যার অন্ত নেই।

উভয় বক্তব্য কেন যে আলাদা তা আমরা দেখেছি। পর্যবেক্ষণের বক্তব্য মূলত ইন্দ্রিয়ানুভূতির কথা, আর তত্ত্ব হলো বাইরের কোন কিছু থেকে নিরপেক্ষ ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য— কিছু ধারণার গুচ্ছ, যাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে। তত্ত্বের বক্তব্যকে সাধারণত একটি নিয়মের আকারে প্রকাশ করা হয়— যা সাধারণভাবে ব্যাপক পর্যায়ে প্রযোজ্য একটি নিয়ম। একে অবশ্য বাস্তবতার নিরিখে যাচাইয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বক্তব্যকে যে কোন বক্তব্য হলেই চলেনা, তাকে সব সময় যে কারো প্রশ্নের সম্মুখীন হবার জন্য তৈরি থাকতে হয়, আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হয়। ফলে এ তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা কাজ করবেন তাঁদেরকে সব সময় একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। অন্য দিকে পর্যবেক্ষণকারী যখন বার বার কোন জিনিস দেখে প্রতিবেদন রাখেন তাতে তাঁর আর কোন সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজন থাকে না— যেমনটি রয়েছে, যেমনটি দেখেছি, তা বলে দিয়েছি, ব্যাস।

অন্য অনেকে অবশ্য তত্ত্বকে এতটা নিরপেক্ষ বলে মনে করেননা। তাঁরা বলেন তত্ত্বকে যতই নিজের গন্ডির মধ্যে স্বাধীন ভাবে থাকা জিনিস মনে করা হোক না কেন এর মধ্যে থাকা ধারণাগুলো ওই বিশেষ সময়ের; বিশেষ বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের পটভূমি-জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত। বলা যায় একটি বিশেষ কাঠামো-ধারণার ভেতরে থেকেই তত্ত্বকে গড়ে ওঠতে হয়। পর্যবেক্ষণগুলোও ঘটে ওই কাঠামো-ধারণার ভেতরেই। কাজেই তাঁদের কাছে তত্ত্বের বক্তব্য এবং পর্যবেক্ষণের বক্তব্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকার সুযোগ নেই, এরা পরস্পর দ্বারা প্রভাবিত। তাই যদি হয় তা হলে পর্যবেক্ষণ-তথ্য থেকে তত্ত্ব পাওয়ার ব্যাপারটিকে লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা যত সোজা-সাপটা হিসেবে দেখেন, এটি তার চেয়ে অনেক বেশি সমস্যা সংকুল হতে বাধ্য।

তত্ত্ব থেকে পর্যবেক্ষণ কতটা স্বাধীন:

তত্ত্ব থেকে পর্যবেক্ষণের এই স্বাধীনতার কথা উঠছে, কারণ এই স্বাধীনতা না থাকলে সেই পর্যবেক্ষণকে ওই তত্ত্বের সত্যতা নির্ণয়ে ব্যবহার করা সঙ্গত হয়না। তখন বলতেই হয় যে পর্যবেক্ষণের মধ্যে তত্ত্বটি আগে থেকে ভর করে আছে— তার থেকে যে তথ্য পাচ্ছি সেটি পুরাপুরি বস্তুনিষ্ঠ নয়। সমালোচকরা মনে করেন এমনটি ঘটে থাকে এবং তা নানা দিক থেকে ঘটতে পারে। যেমন সেই তত্ত্বটির মধ্যেই রয়েছে এমন কোন ধারণার ওপর যদি পর্যবেক্ষণটি নির্ভর করে সেক্ষেত্রে এর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। কোন পর্যবেক্ষণ একেবারে শূন্যের মধ্যে ঘটেনা, কিছু পটভূমি-জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেই সেই পর্যবেক্ষণ করা হয়; আর সেই পটভূমি-জ্ঞানের কিছু যদি এই তত্ত্বটি থেকেই আসে— তা হলে সেরকম নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। আধুনিক কেমিস্ট্রির একেবারে শুরুতে বেশ কিছু কাল ধরে দহনের ফলিজেস্টোন তত্ত্বের প্রাধান্য ছিল। এতে মনে করা হতো যে দহনের সময় বস্তু থেকে ফলিজেস্টোন (আক্ষরিক অর্থে 'শিখা') নামক একটি কাল্পনিক জিনিস বের হয়ে যায় বলে বস্তুটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তত্ত্বটিকে অধিকাংশ কেমিস্টরা অত্যন্ত মৌলিকভাবে সত্য মনে করতেন তাঁদের দহনের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। কিন্তু সেই দহনকে তাঁরা দেখতে চেয়েছেন ফলিজেস্টোন তত্ত্বেরই আঙ্গিকে; ফলে যেভাবে দেখতে চেয়েছেন সেভাবেই দেখেছেন। এর থেকে প্রিস্টলী প্রমুখ রসায়নবিদ ফলিজেস্টোন তত্ত্বের সমর্থন পেয়েছেন। অথচ পরে লাভোশিয়ে নতুন অনুমানে যখন দহন হওয়া বস্তুর সঙ্গে অক্সিজেনের যুক্ত হবার ভিত্তিতে দহনকে দেখতে চাইলেন তিনি কিন্তু দহনের পর্যবেক্ষণ থেকে দহন সম্পর্কে অন্য তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছেন। উভয়ে যার যার তত্ত্বের পূর্ব-ধারণা অনুযায়ী একই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন বলে এই পার্থক্য।

আরেকটি উদাহরণ নেয়া যাক। কোপারনিকাস তাঁর সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব দেয়ার পর অনেক দিন পর্যন্ত সব বিজ্ঞানী এটি গ্রহণ করেননি। তাঁরা আগে

প্রায় দু'হাজার বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত টলেমির বিশ্বতত্ত্ব অনুযায়ীই সব কিছু করে চলেছিলেন। টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব অনুযায়ী একজন জ্যোতির্বিদ ধরা যাক সূর্যাস্ত পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি দেখবেন সূর্য পৃথিবীর স্থির পশ্চিম দিগন্ত রেখার নিচে চলে যাচ্ছে, এবং শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোপারনিকাসের তত্ত্ব অনুযায়ী বিজ্ঞানী একই পর্যবেক্ষণে দেখবেন আবর্তনশীল পৃথিবীর পশ্চিম দিগন্ত রেখাটি কীভাবে স্থির সূর্যের ওপর দিয়ে উঠে এসে তাকে ছাড়িয়ে একেবারে পুরো উঠে আসলো। পর্যবেক্ষণের বর্ণনায় এই পার্থক্যটি আসছে যার যার তাত্ত্বিক প্রভাবের কারণে। তত্ত্বের এরকম সব প্রভাবকে আমরা ধারণাগত প্রভাব বলতে পারি। অনেকে মনে করেন এই প্রভাবের ফলে পর্যবেক্ষণ-বক্তব্যটি এমন ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে যে তাতে তত্ত্ব সম্পর্কে একটি বাড়তি সমর্থন যোগায়— যা বৈধ নয়। অথচ ধারণাটি পর্যবেক্ষণের পটভূমিতে এত অবশ্যম্ভাবী ভাবে উপস্থিত থাকে যে তাকে এড়ানোও যায়না।

তবে বিজ্ঞানীরা এবং বিজ্ঞান-বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করেন পর্যবেক্ষণের এই ধারণাগত তত্ত্ব-নির্ভরতাকে অনাবশ্যকভাবে বড় করে দেখা হচ্ছে। যেমন প্রথম উদাহরণে ফলিজেস্টোন তত্ত্ব প্রভাবিত প্রিস্টলী এবং অক্সিডেশন তত্ত্ব প্রভাবিত লাভোশিয়ে উভয়ে যখন নিজ নিজ এক্সপেরিমেন্টে ধাতুর দহন পর্যবেক্ষণ করছেন কার্যকর অর্থে তাঁরা উভয়ে কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট পাত্রে উল্টো ভাবে খাড়া করা জারে কীভাবে পানি উঠে আসছে তাই লক্ষ্য করছেন। ওতে বাতাস কমে যাওয়াতে ওই পানি ওঠে বাতাসের জায়গা নিচ্ছে। এই পর্যবেক্ষণে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দু'জন এই ওঠাকে কী ভাবে ব্যাখ্যা করছেন পার্থক্যটি সেখানে; সেটি তত্ত্বের ব্যাপার, পর্যবেক্ষণের নয়। প্রিস্টলী বাতাস কমে যাওয়াকে ব্যাখ্যা করছেন দহনে এর একটি অংশ বিলীন হওয়াকে— সেটি (অক্সিজেন) ফলিজেস্টোনশূন্য হয়ে দহনে সাহায্য করেছে, বাকি অংশ (নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড) দহনে উদ্গীর্ণ ফলিজেস্টোন গ্রহণ করেছে। লাভোশিয়ে বাতাস কমে যাওয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন এর একটি অংশ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হওয়া (অক্সিডাইজড) হিসেবে।

আসলে তত্ত্ব সাধারণত যে সব জিনিসের কথা বলে সেগুলো পর্যবেক্ষণের জিনিস নয়, বরং পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিস। সেটি সাধারণ দৃশ্য জিনিসের ক্ষেত্রেও সত্য। যেমন সীসাকে উত্তপ্ত করলে আমরা একে গলতে দেখি। এক একটি পর্যবেক্ষণে আমরা সীসাকে একটি উত্তাপে পৌঁছালে গলতে দেখি। কিন্তু এটিই সীসার গলনাঙ্ক (মেল্‌টিং পয়েন্ট) নয়— গলনাঙ্ক জিনিসটি আসলে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য। একটি পর্যবেক্ষণে যে উত্তাপে সীসাকে গলতে দেখি সেটি একটি উপাত্ত মাত্র (ড্যাটা)। সব উপাত্তের মিলিত গড় হিসেব নিয়ে গলনাঙ্কের ধারণাটি খাড়া করা হয় একটি যৌক্তিক নির্মাণ হিসেবে— সেটি তত্ত্বের জিনিস। উপাত্ত নেবার সময় তাতে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য গলনাঙ্কটি পর্যবেক্ষণে থাকে না,

থাকে সীসার অবস্থা পরিবর্তনের ঘটনাটির বর্ণনা। আসলে তত্ত্বে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসের প্রাধান্যও পর্যবেক্ষণকে ধারণাগত ভাবে তত্ত্ব-নির্ভর হতে বাধা দেয়।

কেউ কেউ বলেন ভাষার হেরফেরের মাধ্যমেও তত্ত্ব পর্যবেক্ষণের ওপর ভর করে। ওপরে আমরা টলেমির ও কোপারনিকাসের বিশ্বতত্ত্বের অনুসারী দুজন জ্যোতির্বিদের পর্যবেক্ষণে পার্থক্যটি দেখেছি। সেটির কথা আবার মনে করলে দেখবো টলেমির অনুসারী জ্যোতির্বিদ যখন 'গ্রহ' পর্যবেক্ষণের কথা বলেন তিনি এর মধ্যে সূর্যকেও অন্তর্ভূক্ত করেন, কিন্তু পৃথিবীকে করেন না। কিন্তু কোপারনিকাসের অনুসারী জ্যোতির্বিদ যখন 'গ্রহ' পর্যবেক্ষণ করেন তিনি সূর্যকে তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেননা, কিন্তু পৃথিবীকে করেন। কেউ কেউ দুই তত্ত্বের এই ভাষাগত পার্থক্যের ওপর খুব জোর দিয়ে বলতে চান যে এর প্রভাব পর্যবেক্ষণের ওপরও গিয়ে পড়ে। পরে আমরা দেখবো বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ টমাস কূন এবং তাঁর অনুসারীরা একে এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন যে বিশেষ পরিস্থিতিতে এক তত্ত্বের কথাবার্তা অন্য তত্ত্বের আওতায় একেবারে অসমঞ্জস মনে হতে পারে— এবং সেই অবস্থায় দুই তত্ত্বের আওতায় একই পর্যবেক্ষণও সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য দিতে পারে। যেমন আইনস্টাইনীয় তত্ত্বে 'ভর' কথাটি নিউটনীয় তত্ত্বে 'ভর' কথাটির সঙ্গে অসমঞ্জস। অন্যরা অবশ্য কূনের এ কথা মানেননা। তাঁরা বলেন ভাষার হেরফের পর্যবেক্ষণকে বদলাতে পারে না— কারণ বিজ্ঞানী যে তাত্ত্বিক পটভূমিতে কাজ করেন সেটির কার্য-কারণ সম্পর্কগুলো তাঁর জানা রয়েছে। পর্যবেক্ষণের ঘটনাটির ব্যাখ্যা করতে সেটি তিনি ব্যবহার করেন— ভাষা-নির্ভরতার ধাক্কা পর্যবেক্ষণের ওপর আসেনা, পর্যবেক্ষণের বক্তব্য তত্ত্ব থেকে স্বাধীন থাকে। কাজেই ভাষাগত ভাবেও পর্যবেক্ষণের ওপর তত্ত্ব ভর না করাটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আরো এক ভাবে তত্ত্ব পর্যবেক্ষণের ওপর ভর করতে পারে। যেই তত্ত্বটি আমরা এ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে খাড়া করতে চাচ্ছি পর্যবেক্ষণের যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি যদি সেই তত্ত্বটি ওপরে নির্ভরশীল হয় তা হলেও এই ভর করার ব্যাপারটি এসে যায়। সেটি হবে যন্ত্রগত ভাবে পর্যবেক্ষণের তত্ত্ব-নির্ভর হওয়া। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। উনবিংশ শতাব্দীতে নিখুঁত থার্মোমিটার তৈরির সুবিধার্থে উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পারদের আয়তন কী হারে বাড়ে তার নিয়মটি জানার প্রয়োজন হয়েছিলো। এটি জানার জন্য উত্তাপ একটু একটু করে বাড়িয়ে তার সঙ্গে আয়তন কীভাবে বাড়ে সেটি পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে— যাতে উত্তাপ আর আয়তন উভয়ই মাপতে হয়েছে। এই উত্তাপ মাপার সময় যদি ওই একই রকম পারদ-থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় তা হলে তো উত্তাপে আয়তন বাড়ার একটি নিয়ম (তত্ত্ব) ইতোমধ্যেই এই উত্তাপ মাপার পর্যবেক্ষণের মধ্যেই ধরে নেয়া হয়েছে। সেই পর্যবেক্ষণকেই যদি

আবার এই নিয়ম আবিষ্কারের কাজে লাগানো হয় তবে সেটি একটি চক্রাকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাতে পর্যবেক্ষণের স্বাধীনতা বা কার্যকারিতা কোনটিই থাকে না। সেক্ষেত্রে উত্তাপের সঙ্গে আয়তন পরিবর্তনের এক্সপেরিমেন্টে এমন যন্ত্র ব্যবহার করতে হতো যা উত্তাপে আয়তন পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করেনা।

তবে সব ক্ষেত্রে এই দিকটি খেয়াল করা, বা ভিন্ন তত্ত্বে কার্যকর যন্ত্র ব্যবহার করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার হয়না। ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ নিলে আমরা গ্যালিলিওকে এই রকম একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে দেখি। গ্যালিলিও তাঁর তৈরি দূরবীক্ষণের ভেতর দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন যে চাঁদে পাহাড়-পর্বত, খাদ, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, পানিবিহীন সাগর ইত্যাদি রয়েছে প্রায় পৃথিবীর মতই। কিন্তু সে সময় এরিস্টোটলীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাবে জ্যোতির্বিদরা চাঁদ থেকে শুরু করে আকাশের সব জ্যোতিষ্ককে পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস মনে করতেন— যা কিনা বিশুদ্ধ স্বচ্ছ 'ইথার' নামক কাল্পনিক স্বর্গীয় বস্তুতে গড়া মনে করতেন। কাজেই গ্যালিলিও যখন তাঁর সহকর্মীদেরকে দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়ে চাঁদের মধ্যে ওসব পাহাড়-পর্বত-সাগর দেখালেন- তাঁরা ওগুলো যে সত্যি সত্যি চাঁদের জিনিস তা মেনে নিলেন না। এরিস্টোটলের তত্ত্ব যেখানে একেবারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে সেখানে এটি মেনে নেয়া সম্ভবও নয়। তাঁদের এরিস্টোটলীয় তত্ত্ব তাঁদেরকে পর্যবেক্ষণটি সেভাবে করতে দেয়নি। বরং তাঁরা বল্‌লেন ওই জিনিসগুলো দূরবীক্ষণ যন্ত্রটারই কারসাজি— দূরবীক্ষণের প্রক্রিয়াটিই হলো ওই রকম কিছু দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি করা। এজন্য গ্যালিলিওকে বহু কষ্ট করে পৃথিবীতে চেনা দূরের জিনিস একই দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছিলো যে দূরবীক্ষণ তার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বস্তুকে বড় করে দেখায় বটে কিন্তু বিভ্রান্তিকর ইমেজ সৃষ্টি করে না। এভাবে দূরবীক্ষণ ব্যবহার করেই, তার ভেতর দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেই, গ্যালিলিওকে দূরবীক্ষণের প্রকৃত তত্ত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। কাজেই চক্রাকার হবার ব্যাপারটি এখানেও থেকে গিয়েছে। অবশ্য তখন না হলেও শেষ পর্যন্ত দূরবীক্ষণ ব্যবহার না করেও দূরবীক্ষণের তত্ত্ব সঠিক ভাবে পাওয়া সম্ভব হয়েছিলো। পারদ-থার্মোমিটার ব্যবহার না করে পারদের সম্প্রাসরণ তত্ত্ব, এবং দূরবীক্ষণ ব্যবহার না করে দূরবীক্ষণ তত্ত্ব যেমন করে পাওয়া যায়, সেটি অন্য ক্ষেত্রেও সম্ভব। একথা অন্তত নীতিগত ভাবে বলা যায় যে সব ক্ষেত্রেই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তত্ত্ব এসে পর্যবেক্ষণের ওপর ভর করার ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

বিশেষ করে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, ভিন্ন তত্ত্ব নির্ভর যন্ত্র যদি একই পর্যবেক্ষণ-ফল দেয় তা হলে পর্যবেক্ষণটিকে সম্পূর্ণ ভাবে তত্ত্ব থেকে স্বাধীন না বলে উপায় থাকে না। যেমন ধরা যাক রক্তের কিছু প্লেটলেটকে আলাদা করে

অণুবীক্ষণ স্লাইডের খুব সূক্ষ্ম গ্রাফ পেপারের মত খোপে খোপে তা ছড়িয়ে দিলাম। এখন প্লেটলেটগুলো কোন্ কোন্ খোপের ঠিক কোন জায়গায় আছে সেই চিত্রটি যদি সাধারণ মাইক্রোস্কোপে দেখে যা পেলাম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখেও ঠিক তাই পাই তা হলে মানতেই হবে যে সেটি কাকতালীয় ভাবে হবার সম্ভাবনা খুব কম— প্লেটলেটগুলো ওই সংখ্যায় এই ভাবে ছড়িয়ে আছে বলেই পর্যবেক্ষণে তা দেখা যাচ্ছে। যন্ত্রের তত্ত্ব এই পর্যবেক্ষণকে কোন ভাবেই প্রভাবিত করছেনা— কারণ সাধারণ মাইক্রোস্কোপ ও ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্বের প্রক্রিয়ার কাজ করে।

ধারণাগত ভাবে, ভাষাগত ভাবে, অথবা যন্ত্রগত ভাবে তত্ত্ব এসে পর্যবেক্ষণের ওপর ভর করার আশঙ্কা যে আছে সেটি আমরা দেখলাম, আর তা যদি হয় তা হলে সেই পর্যবেক্ষণটি তার স্বাধীনতা হারায়, এবং তত্ত্বকে সমর্থন করার বা না করার ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা কমে যায়। অবশ্য আমরা এও দেখলাম অন্তত নীতিগত ভাবে সব ক্ষেত্রে এই আশঙ্কাটি দূর করা সম্ভব। বিজ্ঞানের দার্শনিকরা অবশ্য এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিয়ে থাকেন। এর একদিকে লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা বিজ্ঞানে তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণকে সম্পূর্ণ পরস্পর স্বাধীন বলে মনে করেন; অন্যদিকে টমাস কূনের অনুসারীরা মনে করেন পর্যবেক্ষণ মাত্রই তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। এই মতপার্থক্য সহ যাঁরা বিজ্ঞানকে বুঝতে চান পর্যবেক্ষণের এই স্বাধীনতার বিষয়টিকে সবদিক থেকে দেখলে তাঁদের সুবিধা হয়।

সাদামাটা ভাবে তথ্য থেকে তত্ত্ব সৃষ্টিঃ

পর্যবেক্ষণ তথ্য থেকে তত্ত্ব সৃষ্টির মূল উপায়টি হলো ইনডাকশন, অর্থাৎ বার বার কিছু বার হতে দেখে সব সময় তা হবে এই সাধারণ সিদ্ধান্ত নেয়া। অবশ্য ভাল ইনডাকশন হবার জন্য পর্যবেক্ষণকে কতগুলো শর্ত মানতে হয়। যেমন পর্যবেক্ষণের ওপর তাত্ত্বিক ও অন্যান্য পারিবেশিক প্রভাব কমাবার জন্য এই যে বার বার হতে দেখা সেটি যথেষ্ট বড় সংখ্যক বার হতে হবে। এভাবে পর্যবেক্ষণের অনেক বার পুনরাবৃত্তি ঘটাবার সময় তা যত বেশি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে করা যায় ততই ভাল। এসব পর্যবেক্ষণের কোনটির ফলের সঙ্গে যদি এগুলো থেকে গড়ে তোলা তত্ত্বটি সাংঘর্ষিক হয় তা হলে তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য হবেনা। যদিও এরকম শর্তগুলো মেনেই বিজ্ঞান কাজ করে, তবুও এই মানাটি সব সময় সহজ হয়না, কোন কোন সময় সম্ভবও হয়না।

যেমন বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় অনেকবার পর্যবেক্ষণ করা ভাল তা বুঝলাম, কিন্তু ঠিক কতবার হলে যথেষ্ট হবে তার কোন সীমারেখা নেই। ইতোমধ্যে অন্যের করে ফেলা পর্যবেক্ষণগুলো শুধু পুনরাবৃত্তি করে গেলে বিজ্ঞান হিসেবে তা খুব সম্মানজনক হবে না। আবার কোন কোন পর্যবেক্ষণ

তার অসম্ভব ব্যয়বহুলতা অথবা দুরূহতার জন্যও বার বার করা কঠিন। কোন কোনটি তো পুনর্বার করা রীতিমত ঝুঁকিপূর্ণ— যেমন তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে এমন এক্সপেরিমেন্ট। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে কোন্ পারিপার্শ্বিকতাগুলো প্রাসঙ্গিক হবে, সঙ্গত হবে সেটি জানাও একটি সমস্যা। তাছাড়া আমরা যে বলেছি একটি পর্যবেক্ষণও সাংঘর্ষিক ফল দিলে তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য হবেনা, সেই নীতিটিও বা কতটা বাস্তব সম্মত? অনেক পর্যবেক্ষণের মধ্যে কোন একটিতে ভিন্ন ফল ঘটাটি সাধারণত খুব বিরল ঘটনা হয়, এবং তার ফলেই যদি তত্ত্ব বাতিল করতে হয় তা হলে কোন তত্ত্বকেই টেকানো মুশ্‌কিল হবে। তাই ওই শর্তগুলো খুব কাম্য হলেও এগুলো পুরাপুরি মানা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। বিজ্ঞানের স্বার্থেই বিজ্ঞানকে পদ্ধতির ব্যাপারে কখনো কখনো কিছু সমঝোতা করতে হয় বৈ কি। তবে বিজ্ঞানীর নিজের পক্ষে যেমন, তেমনি আমরা যারা বিজ্ঞানকে বুঝতে চাই তাদের পক্ষেও বোঝা চাই এই সমঝোতাগুলো কী ধরণের হতে পারে তা ।

পর্যবেক্ষণ তথ্য থেকে তত্ত্ব তৈরি করতে বিজ্ঞান যুগে যুগে ইনডাকশনকে ব্যবহার করেছে। তাই গোড়া থেকেই বিজ্ঞানে বিশ্বাস আর ইনডাকশনে বিশ্বাস একাকার হয়ে আছে— অর্থাৎ বার বার কয়েক বার হতে দেখেই সব বার হবে এমন বিশ্বাস। কয়েক বার দেখলেও সব বারতো দেখা হয়নি, তা দেখা সম্ভবও নয়— কাজেই সব বারের জন্য সাধারণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে এই বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে বৈকি। এর মানে বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে একেবারে সাধারণ সিদ্ধান্ত নিয়ে তা একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করা। এটি এক রকম ঘটনা-বিবরণমূলক নিয়ম। এরকম এক বা একাধিক নিয়মের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। সেটিও হবে ঘটনা-বিবরণীর মতই একটি তত্ত্ব— কিছুটা সাদামাটা ভাবে পাওয়া তত্ত্ব। তত্ত্ব সৃষ্টিতে ইনডাকশনের এরকম সরাসরি সোজাসাপটা ব্যবহারকে তাই বলা যেতে পারে সাদামাটা ইনডাকশন। অতীতের অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এ ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, এখনো হচ্ছে। তবে এমন তত্ত্বে ঘটনার বিবরণী পেলেও সব সময় ঘটনার পেছনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না, যার জন্য অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ইনডাকশনের ভিন্ন রকম ব্যবহারের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যা একটু পরেই আমরা দেখবো। ওই সরাসরি ইনডাকশন থেকে তত্ত্বে যাওয়াটিকে সাদামাটা বলার আরো একটি কারণ আছে, এতে আবিষ্কারের ব্যাপারটি এবং কোন আবিষ্কারকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারটি একই পর্যবেক্ষণের ইনডাকশনের মাধ্যমেই ঘটে।

যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে একটি আবিষ্কার থাকে। কিন্তু আবিষ্কার শুধু করলেই হয়না বাস্তব প্রমাণে সেই আবিষ্কারকে প্রতিষ্ঠিতও করতে হয়। সাদামাটা ইনডাকশনে এই দুটি একাকার হয়ে থাকে, সেই ইনডাকশনে

আবিষ্কার ঘটে সেই ইনডাকশনই আবার তাকে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করে। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। একটি বেলুনে কিছু গ্যাস রেখে বাইরে থেকে বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করে ওই গ্যাসের আয়তনে (বেলুনের আয়তনে) পরিবর্তন মাপা হলো। দেখা যায় যে চাপ বাড়লে আয়তন সমানুপাতিক ভাবে কমে যায়। বহুবার করে একই ফল পাওয়া যাওয়াতে ইনডাকশন অনুযায়ী এটি সব সময় এই নিয়মই অনুসরণ করবে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। রবার্ট বয়েল নিয়মটি আবিষ্কার করেছিলেন বলে একে বয়েলের নিয়ম বলা হয়। এই নিয়মটি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে এই একই ধরণের পর্যবেক্ষণে প্রত্যেকবার এমনটিই দেখা গেছে বলে। এভাবেই সাদামাটা ইনডাকশনে গড়া তত্ত্বটিতে আবিষ্কারের ব্যাপার আর প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপার একই ইনডাকশনের সৃষ্টি। পরে দেখবো ভিন্ন পদ্ধতিতে সৃষ্ট অন্য অনেক তত্ত্বে এই দুটি ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে।

সাদামাটা ইনডাকশনে তত্ত্ব সৃষ্টির ভেতর দুটি বিশেষ দুর্বলতা আছে, যা অন্য ভাবে তত্ত্ব সৃষ্টিতে নেই। প্রথম দুর্বলতার বিষয়টি আমরা আগেই দেখেছি— পর্যবেক্ষণটি তত্ত্ব-নির্ভর হবার আশঙ্কা। পর্যবেক্ষণের উপাত্ত সংগ্রহের সময় তার পদ্ধতিও পরিস্থিতির ওপর প্রাসঙ্গিক নানা তত্ত্বের পটভূমি-জ্ঞানের হাত থাকে। যেমন বয়েলের নিয়মের পর্যবেক্ষণে চাপ, উত্তাপ ইত্যাদির সংজ্ঞা, এগুলো মাপার যন্ত্র, পদ্ধতি, মাপার একক এসবে পটভূমি-জ্ঞানের ভূমিকা রয়েছে। এই পটভূমি-জ্ঞানের ভেতর দিয়ে যে তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হতে চলছে তারও কিছু আভাস ওই উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় এসে পড়াটি বিচিত্র নয়। অথচ এই উপাত্তের ওপরেই তত্ত্বটি খাড়া হবার কথা। এমন চক্রাকার পরিস্থিতি সাদামাটা ইনডাকশনের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে কারণ তত্ত্বের আবিষ্কারের ব্যাপারটি ও তার প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণের মধ্যে একাকার হয়ে থাকাতে তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে সংযোগ বেশি।

সাদামাটা ইনডাকশনে গড়া তত্ত্বের দ্বিতীয় বিশেষ দুর্বলতাটি হলো এতে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলো থাকতে পারে না। অথচ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে প্রায়শই এমন পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিস খুব গুরুত্ব পায়— এটম, ইলেকট্রন, রেডিও তরঙ্গ, ফোটন, দেহকোষে থাকা জিন ইত্যাদি অসংখ্য অদৃশ্য জিনিস আছে যেগুলো ছাড়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চলেনা। পর্যবেক্ষণে এগুলো দেখার কোন সুযোগ নেই— তাই পর্যবেক্ষণ থেকে সরাসরি গড়া তত্ত্বে, অর্থাৎ সাদামাটা ইনডাকশনের তত্ত্বে, এগুলোর জায়গা হবার কথা নয়। শুধু পর্যবেক্ষণের শব্দাবলী নিয়ে যে তত্ত্ব গড়ে ওঠে তা পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসের শব্দাবলীতে সমৃদ্ধ তাত্ত্বিক বক্তব্য কীভাবে দেবে? এমন অবস্থায় পর্যবেক্ষিত তথ্য থেকে সেগুলো যৌক্তিক ভাবে নির্মাণ করা যাবে সে সম্ভাবনা কম। এজন্যই সাদামাটা ইনডাকশনের ওপর ভরসা করে বিজ্ঞান বেশি দূর যেতে পারে না। বোঝাই যাচ্ছে ওই পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য

জিনিসগুলোকে তত্ত্বের মধ্যে পর্যবেক্ষণ থেকে নয়, বরং অন্য কোন দিক থেকে আসতে হবে। তেমনটিই আসে বিজ্ঞানের অধিক ব্যবহৃত অন্য রকম পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিকে বলা যায় 'অনুমানের ফল যাচাই'।

অনুমানের ফল যাচাই:

আসলে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় সুচিন্তিত অনুমানের (হাইপোথেসিস) মাধ্যমে। পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলো বিজ্ঞানীর এই অনুমান বা কল্পনারই অংশ— কোন পর্যবেক্ষণের অংশ নয়। এটি বিজ্ঞানীর সৃষ্টিশীলতার দ্বারাই সম্ভব হয়। তবে অনুমান খাড়া করলেই সেটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হতে পারে না। বাস্তবে পর্যবেক্ষণ অথবা এক্সপেরিমেন্টে যাচাই হলে তবেই অনুমানটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অবশ্য অনুমানটিকেই যে যাচাই করা হবে এমন কোন কথা নয়। ওই অনুমান থেকে লজিকের যুক্তির (ডিডাকশন) সাহায্যে পাওয়া ফলগুলো বাস্তবে যাচাই হলেই সাধারণত অনুমানটিকে তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সেটি গণিতের যুক্তিতেও হতে পারে। এটিই অনুমানের ফল যাচাই পদ্ধতি (হাইপোথেটিকো ডিডাকটিভ মেথড)। সাদামাটা ইনডাকশনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সবার আগে আসে পর্যবেক্ষণ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সবার আগে আসে অনুমান।

লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো এই পদ্ধতিতে তত্ত্বের আবিষ্কারটি আসলে ঘটে অনুমানের সঙ্গে। বিজ্ঞানীর সৃজনশীলতায় আনুমানিক সেই তত্ত্বেই আবিষ্কারের কাজটি ঘটে যায়। কিন্তু আবিষ্কারটি প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারটি ঘটে পরে বাস্তব পর্যবেক্ষণে যাচাইয়ের মাধ্যমে। ফলে এক্ষেত্রে 'আবিষ্কারের ব্যাপারটি' ও 'প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারটি'— এই দুই সম্পূর্ণ পৃথক থাকে। এখানে পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত নেবার অর্থাৎ ইনডাকশনের প্রশ্ন ওঠে শুধু তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আবিষ্কারের জন্য নয়। সাদামাটা ভাবে পর্যবেক্ষণ থেকে তত্ত্ব সৃষ্টির পদ্ধতির সঙ্গে এ ব্যাপারেই এর তফাত; আর এ কারণেই দেখবো সাদামাটা পদ্ধতিটির বিশেষ দুর্বলতা দুটি এর নেই।

এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে আমরা অনুমানের ফল যাচাই পদ্ধতিটিকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি বেশ কিছু উদাহরণ সহ, কারণ এটিই বিজ্ঞানের প্রধান পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। এখানে সংক্ষেপে আরো কিছু উদাহরণ দিতে পারি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জন ড্যালটন আধুনিক কেমিস্ট্রিতে এটমিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। ড্যালটনের এটমিক তত্ত্ব অনুযায়ী সব মৌলের (ইলিমেন্ট) ক্ষুদ্রতম অংশ হলো এর অবিভাজ্য ও অবিনাশী এটম। প্রত্যেক মৌলের সব এটম একই ভর ও গুণের অধিকারী। যৌগগুলো (কম্পাউন্ড) গঠিত হয় একধিক মৌলের এটমের সহযোগে। ওতে এটমগুলোর পরস্পর সংযুক্ত হওয়াতে ও বিন্যাসে পরিবর্তনটিই রাসায়নিক বিক্রিয়া। এই পুরো তত্ত্ব

ড্যালটনের সৃজনশীল অনুমান, কোন পর্যবেক্ষণের ফল নয়। হয়তো দু'হাজার বছর আগের গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের প্রাচীন এটমিক তত্ত্ব দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এ তত্ত্বের মূলে যে 'এটম' রয়েছে, সেটি একটি পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য ধারণা। ড্যালটনের এটমিক তত্ত্বকে সত্য বলে ধরে নিলে এর থেকে যৌক্তিক ভাবে নির্ণিত কতগুলো ফল অবধারিত হয়ে পড়ে। যেমন একটি ফল হবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব বস্তুর মিলিত ভর বিক্রিয়ার আগে ও পরে একই থাকবে। আর একটি ফল হবে কোন যৌগের মৌলগুলোকে আলাদা করে প্রত্যেকটি ভর যদি মাপা হয়, তা হলে দেখা যাবে যে সব ক্ষেত্রেই ওই যৌগতে তাদের ভরের অনুপাত একই থাকবে— যৌগটির যতখানিই নেয়া হোক, এটির উৎস যেখান থেকেই আসুক। ইতোমধ্যেই এক্সপেরিমেন্টের পর্যবেক্ষণে এই দুটি ফলই চমৎকার ভাবে দেখা গেছে। অনুমানটির ফলগুলো যাচাই হওয়াতে অনুমানটি নিজেই যাচাই হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। এভাবেই যাচাই হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে ড্যালটনের এটমিক তত্ত্ব, এর জন্য অনুমানের সৃষ্টি এটমকে নিজেকে পর্যবেক্ষণে যাচাই হতে হয়নি। পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য হওয়াতে সেটি সম্ভবও ছিলনা।

১৮৬৫ সালের দিকে প্রেগর মেন্ডেল জীবের বংশগতি সম্পর্কে তাঁর নিয়ম (তত্ত্ব) আবিষ্কার করেন। এই তত্ত্ব বলে যে যৌন প্রজনন-কারী সব জীবে বাবা-মা থেকে ফ্যাক্টর নামক এক রকম কণিকা (পরে যাকে জিন বলা হয়েছে) সন্তানের মধ্যে গিয়েই তার কাছে বাবা-মা'র নানা গুণ নিয়ে যায়। প্রত্যেক গুণের জন্য যেই জিন তার একটি বাবার থেকে এবং একটি মা'র থেকে সন্তান পায়— বাবা ও মার কাছে জিনটির দুটি ভিন্ন রূপ থাকতে পারে। এই জিনগুলো কখনো পরস্পর মিশে যায়না, প্রজন্মের পর প্রজন্মে এটি তার বৈশিষ্ট অক্ষত রাখে। ওই দুই রূপের জিনের মধ্যে যেই রূপটির প্রাধান্য থাকে সন্তানের মধ্যে সেই রূপটিই প্রকাশিত হয়। মেন্ডেল এসব নিয়ে মটরশুঁটির ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন। তিনি দেখেছেন যে মটরশুঁটি হয় মসৃণ বীজের হয়, নয় কুঁচকানো বীজের হয়; এর মধ্যে মসৃণ হওয়াটারই প্রাধান্য রয়েছে। তাঁর নিয়ম যদি সত্য হয় তা হলে বিশুদ্ধ কুঁচকানো বীজের ও বিশুদ্ধ মসৃণ বীজের মটরশুঁটির মধ্যে প্রজনন করা হলে একেবারে গাণিতিক-সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবেই চার ভাগের তিনভাগ সন্তানের মসৃণ বীজ এবং চার ভাগের এক ভাগ সন্তানের কুঁচকানো বীজ হওয়ার কথা। মেন্ডেল তাঁর পর্যবেক্ষণে বার বার তাই পেয়েছেন। পরে আরো নানা ক্ষেত্রে, আরো পরের প্রজন্মে, ও জটিলতর ফল থেকে মেন্ডেলের নিয়মটি যাচাই হয়েছে। ওই ফ্যাক্টর বা জিন জিনিসটি পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়। এটি ছিল মেন্ডেলের অনুমান। এই অনুমান থেকে যৌক্তিক ভাবে পাওয়া ফলাফলগুলো পর্যবেক্ষণে যাচাই হয়ে মেন্ডেলের নিয়মটি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলো। এটিও অনুমানের ফল যাচাই এর উদাহরণ।

এসব ক্ষেত্রে আবিষ্কারের ব্যাপারটি অনুমান থেকে এসে এবং প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ থেকে এসে উভয়ে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ার ফলে সরাসরি পর্যবেক্ষণ তথ্য থেকে তত্ত্ব খাড়া করার (সাদামাটা ইনডাকশন) দুর্বলতা দুটি এখানে থাকে না। প্রথম দুর্বলতাটির কথা বলতে গেলে পর্যবেক্ষণের ওপর তার হবু তত্ত্ব প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। তত্ত্ব-ভর করা পর্যবেক্ষণ যে তত্ত্ব সৃষ্টিকে বিপথগামী করবে সেই সুযোগটি এখানে থাকে না— তত্ত্বটি তো ইতোমধ্যেই অনুমানের মাধ্যমে খাড়া হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দুর্বলতাটি আসে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলোর তত্ত্বে স্থান না পাওয়াতে। পর্যবেক্ষণ থেকে সরাসরি তত্ত্ব সৃষ্টি হলে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য কোন জিনিস তত্ত্বে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তত্ত্ব হচ্ছে অনুমানের সৃষ্টি— সেই অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ-যোগ্য, পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য, সব রকমের জিনিস তত্ত্বে থাকতে পারে। ওপরে দুই উদাহরণে এটম ও জিন উভয়ে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য হয়েও তত্ত্বে স্থান পেয়েছে কারণ এগুলো অনুমান করতে বাধাটি কোথায়? কাজেই 'আবিষ্কারের ব্যাপারে' পর্যবেক্ষণ-অযোগ্যতা কোন বাধা নয়। পরে যাচাইয়ের 'প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারেও' পর্যবেক্ষণ-অযোগ্যতা কোন বাধা নয়, কারণ সেখানে অনুমানটিকে কিন্তু যাচাই করা হচ্ছে না, যাচাই করা হচ্ছে সেই অনুমানের একটি যৌক্তিক ফলকে যার মধ্যে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিস দেখার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। সে কারণেই ড্যালটনের এটমিক তত্ত্ব যাচাইয়ে এটমকে দেখতে হয়নি, মেন্ডেলের জিনের মাধ্যমে বংশগতির নিয়ম যাচাইয়ে জিনকে দেখতে হয়নি।

উল্লিখিত এই দুটি দুর্বলতা না থাকলেও অনুমানের ফল যাচাই পদ্ধতিটির গোড়াতেই একটি গুরুতর প্রশ্ন থেকে যায়। কোন অনুমান থেকে যৌক্তিক ভাবে পাওয়া কোন ফল বা ভবিষ্যদ্বাণী যদি যাচাইয়ে সঠিক হতে দেখি তা হলে সেই অনুমানটি সত্য বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু নিশ্চিত ভাবে এমন মনে হওয়াটি কতখানি বৈধ? আমরাতো অনুমানটি যাচাই করিনি, অনেক ক্ষেত্রে তা যাচাই করা সম্ভবও নয়। অনুমানের একটি ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হওয়া কি 'অনুমানটিই সত্য' এ কথা বলার অধিকার আমাদেরকে দেয়? এমনও দেখা যায় যে দুটি ভিন্ন অনুমান যৌক্তিকভাবে একই ভবিষ্যদ্বাণী করছে। তখন সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি সঠিক বলে যাচাই হলেই কি উভয় অনুমানই এক সঙ্গে সত্য বলে ধরে নিতে হবে? সেটি তো সম্ভব নয়।

এরকম একটি উদাহরণ নেয়া যাক। টলেমির পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্ব এবং কোপারনিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্ব উভয়েই পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি অনুমান। কিন্তু উভয় অনুমান থেকে অঙ্ক কষে চাঁদ-সূর্য গ্রহ ইত্যাদির বিভিন্ন সময়ের অবস্থান, চন্দ্র গ্রহণ-সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি অনেক কিছুর ভবিষ্যদ্বাণী খুব নিখুঁতভাবে করতে পেরেছে, এবং তা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছে।

কিন্তু তাই বলে উভয় বিশ্ব-তত্ত্বই তো সত্য হতে পারে না। বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবীও থাকবে, সূর্যও থাকবে, এ তো হতে পারে না। আরো অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন এমন যাচাই করা অনুমানের কোনটি সঙ্গে কোন উট্‌কো ও অপ্রয়োজনীয় বাড়তি অংশ জুড়ে দেয়া হয়। তখন মূল অনুমানের একটি ফল যাচাইয়ের কারণে মূল অনুমানটির সঙ্গে সঙ্গে ওই অপ্রয়োজনীয় বাড়তি অংশটুকুও সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। যেমন টলেমির বিশ্ব-তত্ত্বের সঙ্গে এক সময় এমনো একটি বাড়তি অংশ যুক্ত হয়ে গিয়েছিলো যে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে ও বাকি সব জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে কারণ পৃথিবীতে মানুষ রয়েছে। চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ ইত্যাদির নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে টলেমির বিশ্ব-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উট্‌কো ওই বাড়তি অনুমানটিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো যে বিশ্ব-তত্ত্বে মানুষের পৃথিবীতে থাকাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বোঝাই যাচ্ছে যে এটি অনুমানের ফল যাচাই পদ্ধতিটির একটি বড় দুর্বলতা।

তত্ত্বকে যাচাই করতে বিজ্ঞানীদের পদ্ধতিকে যদি আমরা সঠিক ভাবে তুলে ধরতে পারি তা হলে এই দুর্বলতাটি থাকে না। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমানের একটি ফল যখন সঠিক বলে যাচাই হয় তখন এর ফলে অনুমানিক তত্ত্বটি আসলে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়না, বরং আরো একটি বাড়তি সমর্থন লাভ করে মাত্র। প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে এরকম নানা ফল যাচাইয়ের মাধ্যমে যথেষ্ট ভাবে সমর্থিত হতে হয়। এতে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত বা অপ্রতিষ্ঠিত বলে কোন কথা নেই, প্রশ্ন হলো কতখানি সমর্থিত হতে পেরেছে বা পারেনি সেটি। বিজ্ঞানে চূড়ান্ত ভাবে সত্য বা চূড়ান্তভাবে মিথ্যা তত্ত্ব নেই, আছে সত্য হবার সম্ভাবনা কত বেশি সেটি। যেটির পেছনে যাচাইয়ের সমর্থন যত বেশি সেটি সত্য হবার সম্ভাবনা তত বেশি। একই ঘটনার দুটি পৃথক অনুমানের কোন কোন ফল একই ভাবে যাচাই হয়ে যেতে পারে বটে, তখন দেখতে হবে এদের মধ্যে কোন্‌টির বেশি সংখ্যক নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণী যাচাই হয়েছে, অর্থাৎ কোন্‌টি বেশি ক্ষেত্রে সমর্থিত হয়েছে— সেটিকেই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। কোপারনিকাস ও পরবর্তী কালে তাঁর তত্ত্বের অনুসারীরা দেখাতে পেরেছিলেন যে এই তত্ত্ব টলেমির তত্ত্ব থেকে অনেক বেশি ক্ষেত্রে সমর্থিত হয়েছে, এ জন্যই শেষ পর্যন্ত এটিই গৃহীত হয়েছে। সূর্যের উদয়াস্তের কাছাকাছি সময়ে শুক্র গ্রহের (এবং বুধের) উদয়াস্ত; মঙ্গলের দিক পরিবর্তনের সময় মঙ্গল গ্রহকে সব থেকে বড় দেখা; চাঁদের কলার মত শুক্র গ্রহেরও সরু থেকে বড় হবার কলা দেখা যাওয়া। ইত্যাদি বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী কোপারনিকাসের তত্ত্ব থেকে সরাসরি করা যায় কিন্তু টলেমির তত্ত্ব থেকে করা যায় না। এগুলো পর্যবেক্ষণে যাচাই হওয়ায় কোপারনিকাসের তত্ত্ব অনেক বেশি ক্ষেত্রে সমর্থিত হয়েছে, তত্ত্বটি দেয়ার দু'একশ' বছরের মধ্যেই। পরে এ ভাবে

আরো অনেক ক্ষেত্রে সমর্থিত হওয়াতে তত্ত্বটি কিছু পরিবর্তন সহ প্রতিষ্ঠিত এবং টলেমির তত্ত্ব বর্জিত।

সমর্থিত হবার পুরো বিষয়টি তুলনামূলক এবং সম্ভাবনা সর্বস্ব। শুধু বলা যায় যে 'ক' ফলটি যাচাইয়ের ফলে 'ক' অনুমানটি যতখানি প্রতিষ্ঠিত হয়, 'খ' ফলটি যাচাই হওয়ার মাধ্যমে 'খ' অনুমানটি তার চেয়ে কম প্রতিষ্ঠিত হয়। আরো সূক্ষ্মভাবে বললে বলতে হবে 'ক' ফল যাচাইয়ের ফলে 'ক' অনুমানটি 'ম' মাত্রায় সমর্থিত হয়, ইত্যাদি। এই মাত্রা কখনো শতকরা একশ' ভাগ নয়, শতকরা শূন্য ভাগও নয়।

তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারটির মধ্যে বাস্তব যাচাইয়ের বস্তুনিষ্ঠতা যেমন আছে তেমনি একরকম ব্যক্তিনিষ্ঠ আস্থার ব্যাপারও আছে, যা ওই সমর্থিত হবার সঙ্গে জড়িয়ে। এখানে বিশেষ ধরণের একটি সম্ভাবনা কাজ করছে— যা বায়েসিয়ান নামের বিশেষ সংখ্যাতত্ত্বের অংশ। এতে ওই আস্থাটির সম্ভাবনা বাড়ে যদি ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন পরিস্থিতি জানা থাকে। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাক যে কোন রুগীর ক্ষেত্রে ক্যানসার উদ্ঘাটন হওয়াটাই সেই ঘটনা। যদি বেশি বয়স হওয়ার পরিস্থিতিটি ক্যানসার সৃষ্টির অনুকূল হয়, তা হলে কারো বয়স আগে থেকে জানা থাকলে তার ক্ষেত্রে ক্যানসার উদ্ঘাটন হবার সম্ভাবনা আরো একটু বেশি আস্থার সঙ্গে নির্ণয় করা যায়। বয়স জানা না থাকলে তা এতোটা আস্থার সঙ্গে নির্ণয় করা যায়না। এই বায়েসিয়ান আস্থা অনুমানের ফল যাচাইতেও কাজ করে। অনুমানের একটি ফল যাচাই হয়েছে এই জ্ঞানটি সম্ভাব্য ক্যানসার রুগীর বয়স জানার মতই অনুমানের প্রতি একটি বাড়তি আস্থার সৃষ্টি করে। যাচাই করা না গেলে এই আস্থা কমে যায়। যতবার যত ভাবে এ রকম যাচাই হয়েছে জানা যাবে, অনুমানটির প্রতি আস্থা ততই বাড়ে; তত্ত্বটি ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফল যাচাই হওয়ার সঙ্গে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার সম্পর্কটি এই বায়েসিয়ান সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবেই সব চেয়ে ভাল বোঝা যায়।

কিন্তু এসব হলো তত্ত্ব যাচাইয়ের প্রশ্ন। যেই অনুমানটির মধ্যে তত্ত্বটি রয়ে গেছে, তার আবিষ্কারটি রয়ে গেছে, সেটি আসলো কোথা থেকে? আমরা বলেছি এটি আসে বিজ্ঞানীর সৃজনশীল অনুমান থেকে, অর্থাৎ তাঁর মস্তিষ্ক থেকে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে চিন্তা করে যাঁরা পর্যবেক্ষণের ওপর তত্ত্বের কোন ছাপ পড়তে দিতে নারাজ, তাঁরা আনুমানিক তত্ত্বকে এভাবে বিজ্ঞানীর বিশুদ্ধ চিন্তার সৃষ্টি হিসেবে দেখতে চান এবং আসলেও অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ বিজ্ঞানীর মাথায় তত্ত্বের মূল অংশগুলো খেলে যাওয়াতেই তিনি অনুমানটির সাক্ষাত পান। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি এমন হঠাৎ সৃষ্টিশীলতা বিরল ঘটনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীকে আনুমনিক তত্ত্ব খাড়া করতে হয়েছে পর্যবেক্ষিত কোন ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে; কাজেই এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অনুমানটির সম্পর্ক নেই একথা কেমন করে বলি? অন্তত এটুকু বলতে হবে যে

কোন কোন পর্যবেক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্টে পাওয়া ফলাফল বিজ্ঞানীকে এই অনুমানের ব্যাপার চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মাইকেলসন ও মর্লি নামের দু'জন পদার্থবিদ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাপে একটি এক্সপেরিমেন্টে করে অদ্ভুত একটি ফল পেরেছিলেন যে আলোর বেগ তার উৎসের বেগের ওপর নির্ভর করেনা— যে কোন গতিশীল উৎস থেকে যাত্রা শুরু করেও তার বেগ একই থাকে। এটি চিরায়ত প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিদ্যার কাছে একেবারেই অদ্ভুত হওয়াতেই আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের অনুমানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ওই অনুমানে একেবারে নতুন ভাবে চিন্তা করার মধ্যে তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার স্ফুরন চমৎকার ভাবে দেখা গিয়েছে বটে, কিন্তু মাইকেলসন-মর্লি এক্সপেরিমেন্টের প্রভাব সেই অনুমানে ছিলনা একথা বলা যায় না। এমনটি বিজ্ঞানের আরো অসংখ্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও সত্য। তবে যে পর্যবেক্ষণ অনুমানকে উদ্বুদ্ধ করেছে সেই পর্যবেক্ষণকে ও তার পারিপার্শ্বিক ধারণাগুলোকে আনুমানিক তত্ত্বের পেছনে সমর্থন যোগানোর কাজে বেশি কার্যকর হবেনা তা বলাই বাহুল্য।

অনুমানের ফল যাচাই পদ্ধতিতে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। এখানে পর্যবেক্ষণে ইনডাকশনটি শুধু অনুমানের ফল যাচাই করে তার পেছনে সমর্থন জানাতে ব্যবহৃত হচ্ছে, আবিষ্কারটি করার মধ্যে নয়। অন্য দিকে অনুমানের ওই ফল বা ভবিষ্যদ্বাণী নির্ণয় করার কাজে ডিডাকশনের ব্যবহারও প্রচুর হচ্ছে— ডিডাকটিভ লজিকের যুক্তিতে সেই নির্ণয়নটি করা হচ্ছে বলে। পদার্থবিদ্যার ও অন্যান্য কিছু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ডিডাকটিভ লজিক গণিতের যুক্তির রূপ ধারণ করে। আধুনিক পদার্থবিদ্যায় কোন কোন ভাল অনুমান থেকে গণিতের যুক্তি যে সব ফল বা ভবিষ্যদ্বাণী এনে দেয় তা নিজেই, যাচাইয়ের আগেই, অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি করে তার সৌকর্যের কারণে। কারণ তাতে প্রকৃতির এমন সব সুন্দর নিয়ম ফুটে ওঠে এবং তার নানা অংশের মধ্যে এমন সুসঙ্গতি থাকে যে শুধু ওই গাণিতিক যুক্তির সৌকর্যের মাধ্যমেই সেটিকে খুবই সত্য বলে মনে হয়। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের অনুমানগুলো থেকে শুধুই গাণিতিক যুক্তি স্থান-কালের ও মহাবিশ্বের যে অদ্ভুত সুন্দর ও সুসম ছবি এনে দেয় তাতে এটি বাস্তবে পর্যবেক্ষণে যাচাই হবার আগেই বিজ্ঞানীদের দারুণ আস্থা লাভ করেছে। আরো পরিচিত উদাহরণ নিলে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক গণিতবিদ ইউক্লিড জ্যামিতির উপপাদ্যগুলোকে শুধু ডিডাকশনের যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করে করে সমতলের ত্রিভুজ, বৃত্ত ও অন্যান্য ক্ষেত্রের স্থান এবং পিরামিড, গোলক ইত্যাদি ত্রিমাত্রিক স্থান সম্পর্কে জ্ঞানের আস্থা সৃষ্টি করেছিলেন যা বাস্তব যাচাইয়ের আগেই সবার আস্থা অর্জন করে। কাজেই বলতেই হয় যে গণিতের ডিডাকশন বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে ইনডাকশনের সঙ্গে সঙ্গে বড় ভূমিকা পালন করছে— লজিক্যাল

পজিটিভিস্টরা ডিডাকটিভ যুক্তিকে যতই 'কথার হেরফের' বলে আখ্যায়িত করুক না কেন। অনুমানের ফল যাচাই পদ্ধতিতে ডিডাকশন বা যৌক্তিক নির্ণয়ের এই ভূমিকাটি খুব স্পষ্ট।

বারবার দেখেছি, কিন্তু সব বারতো দেখিনি— এটিই সমস্যা

যুক্তিতে এর সমাধান অসম্ভবঃ

শেষ পর্যন্ত অনুমান যতই সুন্দর হোক, এর থেকে ডিডাকশনে পাওয়া ফল গাণিতিক ভাবে যতই সৌকর্যময় হোক, বিজ্ঞানের তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সেই ফলকে পর্যবেক্ষণের ইনডাকশনে যাচাই হতে হবে। আমাদের উদাহরণ দুটিতে আইনস্টাইনের তত্ত্বের জন্যও একথা খেটেছে, ইউক্লিডের তত্ত্বের জন্যও খেটেছে। আর অনুমানে ফল যাচাই না হয়ে তত্ত্বটি যদি সরাসরি ইনডাকশন থেকে আসে তা হলে সেখানে তো তার সর্বাংশেই ইনডাকশন। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে বিজ্ঞানের যে কোন পদ্ধতিতে ইনডাকশনের প্রয়োজন রয়েছে। অথচ এই ইনডাকশনের মধ্যে রয়ে গেছে একটি অত্যন্ত মৌলিক সমস্যা, যার কোন রকম সমাধান অন্তত দার্শনিকরা খুঁজে পাচ্ছেন না। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নন; তাঁদেরকে ইনডাকশনের ব্যবহার সর্বক্ষণ করতেই হয়, দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষকেও করতে হয়। বিজ্ঞানে বিশ্বাস আর ইনডাকশনে বিশ্বাস বলতে গেলে একই ব্যাপার। কোন কিছু বার বার পুনরাবৃত্তি হতে দেখলে তা সব সময় হবে এমন বিশ্বাস মানুষের মজ্জাগত, এবং সেটি করে সাধারণত কেউ ঠকেনা, বিজ্ঞানীরাও না। কিন্তু তবুও এতে সমস্যা আছে।

'ইনডাকশন সমস্যা' নামে পরিচিত এই মৌলিক সমস্যাটি বুঝতে ইনডাকশনের অর্থটি সামনে রাখতে হবে— বার বার কিছু বার ঘটতে দেখার ফলে সব সময় ঘটা সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। দেখেছি সীমিত সংখ্যকবার; বারবার হতে দেখেছি এটি ঠিক, কিন্তু সব বার তো দেখিনি, দেখা সম্ভবও ছিলনা। তাছাড়া ভবিষ্যতে যেগুলো ঘটবে তা দেখার সুযোগ তো এখনো হয়নি। তা হলে ওইসব সহ সবগুলোতেই ঘটেছে এবং ঘটবে এমন সাধারণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছি কী ভাবে? ইনডাকশন যে বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য পদ্ধতি সে তো আমরা দেখেছিই। বিজ্ঞান অতীতে যা সত্য দেখেছে, তা ভবিষ্যতেও সত্য মনে করে। এই নীতিটিকে বলা হয় 'প্রকৃতির নিরবিচ্ছিন্ন আচরণ' (ইউনিফর্মিটি অফ নেচার)। কিন্তু ওই বিশ্বাস, ওই নীতির ভিত্তিটি কী? অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম এর প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখান যে এই বিশ্বাসটি যুক্তিসঙ্গত নয়। সে সময় থেকে একে যৌক্তিক প্রমাণ করতে গিয়ে সবাই ব্যর্থ হয়েছেন।

লজিক বা যুক্তিবিদ্যা কীভাবে একটি সিদ্ধান্তকে যৌক্তিক মনে করে তা আমরা দেখেছি— সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাটি এতে দেয়া বক্তব্যগুলোতেই নিহিত থাকে। সেগুলো সত্য বলে ধরে নিলে সিদ্ধান্তকে অনিবার্যভাবে সত্য হতে হবে। এতে মূল দেয়া বক্তব্যটি হয় একটি স্বীকৃত বক্তব্য। এই স্বীকৃত বক্তব্য থেকে যুক্তির সাহায্যে থেকে সিদ্ধান্ত টানা হয় এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে। এ জন্যই এই যুক্তি ডিডাকশনের যুক্তিবিস্তার— ডিডাকটিভ লজিক। সিদ্ধান্তের সত্যতা এখানে অবশ্যম্ভাবী একটি পরিচিত উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝা যাক:

মানুষ মরণশীল,
এরিস্টোটল মানুষ,
সুতরাং এরিস্টোটল মরণশীল।

এখানে দেয়া বক্তব্য থেকে সিদ্ধান্তটি যেহেতু অনিবার্য, কাজেই ব্যাপারটি যৌক্তিক বলতেই হবে। ইনডাকশন যৌক্তিক না হবার কারণ হলো তাতে এই অনিবার্যতা নেই। ইনডাকশনের বক্তব্য বিস্তারের উদাহরণ হতে পারে এরকম:

১ম যে রাজহাঁসটি দেখেছি সেটি সাদা,
২য় যে রাজহাঁসটি দেখেছি সেটি সাদা,
৩য় যে রাজহাঁসটি দেখেছি সেটি সাদা,
৪র্থ যে রাজহাঁসটি দেখেছি সেটি সাদা,
. . . . . .
'স' সংখ্যক যে রাজহাঁসটি দেখেছি সেটি সাদা,
সুতরাং রাজহাঁস সাদা।

বাস্তব জীবনে আমরা এভাবে নেয়া সিদ্ধান্তটিকে সঠিক মনে করি। কিন্তু ডিডাকটিভ যুক্তিতে সেটি সঠিক হয়না। কারণ 'স' সংখ্যাটি যত বড়ই হোক না কেন তার বাইরেও রাজহাঁস আছে, যার কোনটি সাদা ছাড়া অন্য রঙের হবেনা এমন গ্যারান্টি আমি দিতে পারবোনা, কারণ সেগুলো আমি দেখিনি। কাজেই এই সিদ্ধান্তের পেছনে লজিকের সেই অনিবার্যতা নেই। এভাবে দেখানো যায় ইনডাকশনের এই পদ্ধতিতে নেয়া কোন সিদ্ধান্তের পেছনেই এই অনিবার্যতা নেই, ইনডাকশন যৌক্তিক নয়। এটিই ইনডাকশন সমস্যা।

ডেভিড হিউম থেকে শুরু করে অনেকেই অনেক ভাবে সমস্যাটি উপস্থাপন করেছেন। খুব মনে রাখার মত একটি রূপক গল্পে একে ধারণ করেছেন গত শতাব্দীর সেরা দার্শনিকদের একজন বার্ট্রান্ড রাসেল, যিনি একজন অত্যন্ত বড় মাপের গণিতবিদ, লেখক ও সামাজিক আন্দোলনকারীও ছিলেন। গল্পটি ছোট

একটি খামারে পালিত একটি মুরগির। জন্মের পর থেকে মুরগিটি দেখেছে প্রতিদিন সকাল ঠিক আটটায় খামারের মালিক তার জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন। প্রত্যেকদিন ঠিক এসময় যে তাঁর আসা খাবার প্রত্যাশা করেছে, এবং কোনদিন নিরাশ হয়নি। কাজেই এই দিনও সে তাঁকে ওভাবে আশা করেছে। তিনি ঠিকই এসেছেন, কিন্তু খাবার নিয়ে নয়, গলা কাটার ছুরি নিয়ে। প্রাণ দিয়ে মুরগিকে বুঝতে হয়েছিলো যে ইনডাকশনে নেয়া সিদ্ধান্ত যৌক্তিক নয়।

অবশ্য বিজ্ঞানে যৌক্তিক বাক্যই একমাত্র অর্থপূর্ণ বাক্য নয়, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার (পর্যবেক্ষণ) বাক্যগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একথা লজিক্যাল পজিটিভিস্টরাই খুব জোর দিয়ে বলছেন, এবং তার আগেই হিউম সহ অন্য অনেক দার্শনিকই মেনে নিয়েছেন। কাজেই যুক্তিতে না হলেও অভিজ্ঞতায় ইনডাকশনকে দার্শনিকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যেতে পারে এমনটি আমরা ভাবতে পারি। দেখা যাক সেটি সম্ভব কিনা। অতীতে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যা বার বার অতীতে হতে দেখেছি তা পরেও হয়েছে। ভোরে সূর্যকে পূর্ব দিকে উঠতে দেখেছি, তা পরেও সেভাবেই উঠেছে। অবাবস্যার পর নতুন চাঁদ উঠতে বহুবার দেখেছি, পরেও ঠিক তাই হয়েছে। পর পর বসন্তে কোকিলের গান শুনেছি, পরবর্তী কালেও সে গান বসন্তেই শুনতে পেয়েছি। এমনি ভাবে বার বার অভিজ্ঞতায় আমরা ইনডাকশনকে সঠিক হতে দেখেছি, জীবনের এবং বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে। কাজেই সাধারণ ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে ইনডাকশন সঠিক ফল দেয়। এতে ইনডাকশন সমস্যা কি দূর হলো? মোটেই না, কারণ এই যে সিদ্ধান্তটি নিলাম সেটিওতো ইনডাকশনের মাধ্যমেই নিলাম— বার বার ইনডাকশন কাজ করেছে বলে সামনেও সব সময় কাজ করবে এটি ধরে নিচ্ছি। অর্থাৎ ইনডাকশন দিয়েই এখানে ইনডাকশনকে গ্রহণীয় প্রমাণ করছি— সেটি চক্রাকার ব্যাপার, তাই বৈধ নয়।

কাজেই না যুক্তিতে, না অভিজ্ঞতায় কোন ভাবেই ইনডাকশনকে গ্রহণযোগ্য করা যাচ্ছেনা। জ্ঞান-বিচারে রত দার্শনিকদের কাছে ইনডাকশন সমস্যা রয়েই গেলো। অথচ বিজ্ঞানের কাছে এবং দৈনন্দিন জীবনের কাছে ইনডাকশন এতো জরুরি একটি পদ্ধতি যে ওই গ্রহণযোগ্যতার অভাবটি সবার জন্যই কিছুটা অস্বস্থির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো হিউম ব্যাপারটি সামনে আনার পর থেকেই। সেই থেকেই চেষ্টা চল্‌ছে কোন না কোন উপায়ে এর বৈধতাটি খুঁজে নিতে, অর্থাৎ ইনডাকশন সমস্যার অবসান ঘটাতে। এর লক্ষ্য হলো বাস্তব জগতে স্পষ্টত অত্যাবশ্যকীয় ইনডাকশনকে দার্শনিক জ্ঞান-বিচারের জগতেও গ্রহণযোগ্য করা। বৈধতা দেবার সেই চেষ্টাগুলোর সাফল্য-ব্যর্থতা দেখলে বিজ্ঞানের পদ্ধতির ভিত্তি বুঝতে কিছুটা সুবিধা হবে।

সমস্যাটি দূর করার নানা চেষ্টা:

বার বার পুনরাবৃত্তি হওয়া থেকে সর্বকালের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না, কারণ তাতে পর্যবেক্ষণ না করেই সব ক্ষেত্রে ওটি সত্য হবে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু বার বার পুনরাবৃত্তির কারণে আবার ঘটবার সম্ভাবনাটি বেশি হবে এ কথাটি তো সম্ভাবনার নিয়মে বলাই যায়। যে ঘটনা অতীতে নিয়মিত পুনরাবৃত্তি হয়নি, এলোমেলো ভাবে কখনো ঘটেছে কখনো ঘটেনি সেটির তুলনায় যেটি ব্যতিক্রমহীন ভাবে বার বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন ঘটনা আবার ঘটার সম্ভাবনা বেশি নয় কি? তাই বার বার প্রত্যেকবার রাজহাঁসকে সাদা দেখার পর সব রাজহাঁস সাদা এই সিদ্ধান্ত না নিয়ে যদি সিদ্ধান্তটি হয় রাজহাঁস অন্য রঙের হবার চেয়ে সাদা হবার সম্ভাবনা বেশি— তা হলে যুক্তিগ্রাহ্য না হবার দোষটি আর থাকে না। কাজেই ইনডাকশন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা যাঁরা করছেন তাঁদের কেউ কেউ বল্‌লেন বিজ্ঞানের ইন্‌ডাকশনে সিদ্ধান্তগুলো সবই আসলে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নয়, বরং সম্ভাবনার সিদ্ধান্ত। কাজেই সেখানে কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু ইনডাকশনের প্রতি দার্শনিক সংশয়টি এত সহজে কাটাবার নয়। সমালোচকরা ঠিকই মেনে নিলেন যে সম্ভাবনার হিসেবে নিলে এতে যুক্তির সংকট লাঘব হয় আর বিজ্ঞানের কাজ সম্ভাবনার হিসেবেই চলে; আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজও তাতেই চলে। রাজহাঁস সাদা হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি— এই সিদ্ধান্তই তার জন্য যথেষ্ট। লক্ষ রাজহাঁসের মধ্যে কখনো অন্য রঙের একটি যদি বেরিয়েও পড়ে তাতে এই সিদ্ধান্তের কোন ব্যত্যয় ঘটেনা। কিন্তু প্রশ্নটি থেকে যায় এই যে সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে ওই জিনিসটি কী? সম্ভাবনার (প্রবাবিলিটি) যে সংজ্ঞা তাতে যে ঘটনা বার বার বেশি বার ঘটে তার সম্ভাবনা বেশি সূচিত করে বিকল্প সব ঘটনার ভগ্নাংশের হিসেবে। আর এভাবে যা ঘটার সম্ভাবনা যত বেশি পাওয়া যায়— ভবিষ্যতে সেটি তত বেশি ঘটবে আশা করা হয়। অর্থাৎ এখানেও অতীতের পুনরাবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তে নেয়া হচ্ছে— যা কিনা ইনডাকশন। সম্ভাবনাও তাই ইনডাকশনের ভিত্তিতেই রচিত। আর সম্ভাবনা যে আসলেই কাজ করে সেটিও অতীতে বার বার কাজ করেছে বলেই। তাই ইনডাকশন যদি যৌক্তিক না হয়, এদের কোনটিই যৌক্তিক নয়।

একেবারে অংকের মত করেই দেখানো যায় যে সিদ্ধান্তটি সম্ভাবনামূলক হলেও ইনডাকশন সমস্যাটি থেকেই যায়। গণিতে বহু বিকল্প ঘটনার মধ্যে বিশেষ ঘটনাগুলোর সম্ভাবনা হিসেব করা হয় মোট বিকল্পের সংখ্যা কত এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো তার কত ভাগ সেই হিসেবে। তাই একটি মুদ্রা টস্ করলে তার পড়ার মোট বিকল্প দুটি— 'হেড' অথবা 'টেইল'। 'হেড' পড়াটি এর মধ্যে

একটি বিকল্প। কাজেই হেড পড়ার সম্ভাবনা হলো এই এক্‌কে মোট বিকল্প সংখ্যা দুই দিয়ে ভাগ করে $\frac{১}{২}$। একই ভাবে লুডুর ডাইসে মোট ছয়টি তল থাকায় এবং ১ থেকে ৬ মোট ছয়টি বিকল্প থাকায় এর মধ্যে একটি, ধরা যাক ছক্কা, পড়ার সম্ভাবনা হিসেব করলে পাব $\frac{১}{৬}$। এখন ইনডাকশনের একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত সঠিক হবার সম্ভাবনা কতটুকু। এটি যে সব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নেয়া হচ্ছে, যেগুলোতে এটি বার বার দেখা গেছে, তাদের সংখ্যা সীমিত। যেমন রাজহাঁস আমি শতবার, হাজারবার বা তারো বেশি দেখতে পারি, কিন্তু সেটি সীমিত একটি সংখ্যা। কিন্তু দুনিয়ায় পর্যবেক্ষণ করার মত রাজহাঁসের যে সংখ্যা রয়েছে তার সংখ্যা এর তুলনায় এত বড় যে তাকে প্রায় অসীম ধরে নেয়া যায়। কাজেই সব রাজহাঁস সাদা এমন সাধারণ সিদ্ধান্তে সম্ভাবনা হিসেবে করতে রাজহাঁস যত আছে সেই সংখ্যা দিয়ে যত রাজহাঁস দেখেছি (এবং সাদা পেয়েছি) সেই সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে। সসীম সংখ্যাকে অসীম সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে কোন ক্ষেত্রে ফল হয় শূন্য। কাজেই রাজহাঁস সাদা এই সাধারণ সিদ্ধান্ত সঠিক হবার সম্ভাবনা শূন্য। একই যুক্তিতে ইনডাকশনে নেয়া যে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তের সম্ভাবনাই শূন্য।

ইনডাকশনকে দার্শনিক ভাবে বৈধ করার জন্য আরো একটি বড় কাজ করা হয়েছে। এজন্য লজিকের একটি ব্যতিক্রমী রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। ডিডাকটিভ লজিকে সাধারণ বক্তব্যটি সত্য হলে এর অন্তর্গত যে কোন বিশেষ বক্তব্যও সত্যি হয়— যেমন 'মানুষ মরণশীল' কথাটি সত্য হলে 'এরিস্টোটল মরণশীল' এটি সত্য হয়। ব্যতিক্রমী লজিকটিতে ব্যাপারটি উল্‌টো করে ধরা হলো— নানা বিশেষ ক্ষেত্রে কোন বক্তব্য সত্য হলে, তার ফলে একটি সাধারণ বক্তব্য সত্য হবে। যেমন প্রথম রাজহাঁস সাদা পাওয়া গেছে, দ্বিতীয় রাজহাঁস সাদা পাওয়া গেছে— এভাবে বেশ কিছু রাজহাঁস সাদা পাওয়া গেছে— অতএব সব রাজহাঁস সাদা। বুঝতেই পারছি এটি ইনডাকশন ছাড়া আর কিছু নয়— একে বলাও হলো ইন্‌ডাকটিভ লজিক। অর্থাৎ কিনা ইনডাকশনকে বিশ্বাস যখন করাই হচ্ছে— তার জন্য একটি যুক্তি সৃষ্টি করে নেয়া হলো। মুশকিল হলো ডিডাকটিভ লজিকের যে অনিবার্যতা আছে, এক্ষেত্রে তা নেই; অনেকটা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একে যৌক্তিকতা দেয়া হচ্ছে মাত্র। অবশ্য লজিকের অন্তর্ভূক্ত হওয়াতে লজিকের নিয়মগুলো এরও মানতে হয়। কিন্তু সেগুলো মানতে গিয়ে এমন ফলাফল মাঝে মাঝে পেতে হয় যা সাধারণ জ্ঞানেই একেবারে উদ্ভট মনে হবে। যুক্তির নিয়ম মানতে গিয়ে উদ্ভট ফল পাওয়াকে বলা হয় প্যারাডক্স।

এক্ষেত্রে এরকম একটি প্যারাডক্স সাধারণত 'কালো কাক প্যারাডক্স' হিসেবে পরিচিত। এখানে লজিকের একটি নিয়ম খাটাতে গিয়ে বিপত্তিটি ঘটে— তা হলো একই সঙ্গে কোন হ্যাঁ বাচক বক্তব্য এবং তার না বাচক বক্তব্য সত্য হতে পারে না। তাই 'মানুষ মরণশীল' একথা ঠিক হলে, 'মানুষ মরণশীল নয়' একথা সত্য হতে পারে না, কাজেই বলা যাবে 'যা মরণশীল নয় তা মানুষ নয়'। কালো কাক প্যারাডক্সে ইনডাকটিভ লজিকের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।

১। 'সব কাক কালো'।

এর থেকে যুক্তির নিয়মে আমরা পাই

২। 'কালো নয় এমন জিনিস কাক নয়'।

যতবার আমরা একটি নতুন কালো কাক দেখবো ততই ১ নম্বর সিদ্ধান্তটি আরো একটু বেশি সমর্থিত হবে, এবং এই সিদ্ধান্তের ওপর আমাদের আস্থা আরো একটু বাড়বে। একই ভাবে যত বার আমরা কালো নয় এমন একটি জিনিস আমরা দেখবো এবং এও দেখবো যে এটি কোন কাক নয়, ততই ২ নম্বর সিদ্ধান্তটির ওপর আমাদের আস্থা আরো বাড়বে। কিন্তু যেহেতু ২ নম্বর ও ১ নম্বর সিদ্ধান্ত আসলে একই সিদ্ধান্ত, যুক্তির নিয়মে একটি থেকে অন্যটি পাওয়া গেছে, তাই ২ নম্বরের ওপর আস্থা বাড়া মানে ১ নম্বর সিদ্ধান্তের ওপরও আস্থা বাড়া। এখন আমি যদি সাদা একটি টেনিস জুতা দেখি তা হলে আরো একবার এমন একটি কালো নয় জিনিস দেখলাম যা কাকও নয়, ফলে তাতে ২ নম্বর সিদ্ধান্তের ওপর আস্থা আর একটু বাড়লো, সঙ্গে সঙ্গে ১ নম্বর সিদ্ধান্তের ওপরও আস্থা বাড়লো। অর্থাৎ এভাবে যতবার একটি সাদা টেনিস জুতা দেখবো ততবার 'সব কাক কালো' একথাটি আরো ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। স্পষ্টত এটি একটি উদ্ভট কথা— সাদা টেনিস জুতা দেখা না দেখার সঙ্গে কাকের কালো হওয়া না হওয়ার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এই প্যারাডক্স দেখিয়ে দিচ্ছে যে লজিকের আদলে দাঁড় করালেই ইনডাকশনকে যুক্তিযুক্ত করা যায় না।

এর চেয়েও আরো বড় উদ্ভটতা সৃষ্টি করতে পারে এই পরের প্যারাডক্সটি। একে বলা যেতে পারে 'পান্না প্যারাডক্স'। পান্না (এমেরাল্ড) সবুজ রঙের একটি রত্ন-পাথর। এখানে প্রথম সিদ্ধান্তটি নেয়া হলো:

১। 'সব পান্না সবুজ'।

সেই সঙ্গে আর একটি বিকল্প সিদ্ধান্ত নেয়া হলো:

২। '২০০০ সালের ১ জানুয়ারী তারিখের আগে সব পান্না হলুদ ছিল, এরপর থেকে সব পান্না সবুজ'।

এখন বাস্তব পর্যবেক্ষণে আমরা যখনই একটি নতুন পান্নাকে সবুজ দেখবো তখনই ১ নম্বর সিদ্ধান্তটি আরো একটু সমর্থিত হবে, এবং এ

সিদ্ধান্তের ওপর আমাদের আস্থা বাড়বে। তবে সমস্যা হলো এই একই পর্যবেক্ষণকে ২ নম্বর সিদ্ধান্তের জন্যও সমর্থন বলে বিবেচনা করা যায় কারণ ওটি সত্য হতে হলেও পর্যবেক্ষণে পান্নাকে সবুজ পেতে হবে। এক একটি পর্যবেক্ষণে সমর্থিত হওয়াটি ১ নম্বর ও ২ নম্বর সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারবেনা। অথচ ২ নম্বর সিদ্ধান্তটি একেবারেই উদ্ভট, কারণ কোন একটি বিশেষ ক্ষণে দুনিয়ার সব পান্না হঠাৎ হলুদ থেকে সবুজ হয়ে যেতে পারে না। আর উদ্ভট জিনিস এমন ভাবে সমর্থিত হওয়াটাও রীতিমত উদ্ভট। তবে উদ্ভটতার এখানেই শেষ নয়। ২০০০ সালে ১ জানুয়ারীর বদলে আজকের আগের যে কোন তারিখ দিয়ে ২ নম্বর সিদ্ধান্তের মত প্রায় অসীম সংখ্যক সিদ্ধান্ত আমরা তৈরি করতে পারি, যার প্রত্যেকটি আজ এক একটি সবুজ পান্নার পর্যবেক্ষণে সমর্থিত হতে পারবে। এর অর্থ হলো একই পর্যবেক্ষণে অসীম সংখ্যাক পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্ত সমর্থিত হতে পারে, যার ১ নম্বরটি ছাড়া বাকি সবই বৈজ্ঞানিকভাবেও উদ্ভট। এটি যৌক্তিক উদ্ভটতার চূড়ান্ত। কাজেই এই পথে ইনডাকশনকে যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তবে ইনডাকটিভ লজিকের প্রবক্তাদের কেউ কেউ অবশ্য এরকম প্যারাডক্স দেখে দমে যান না। যেমন তাঁরা বলেন 'কালো কাক প্যারাডক্সকে সব পরিস্থিতে প্যারাডক্স হিসেবে দেখা যাবেনা। মনে করি এমন একটি জগত কল্পনা করা হলো যেখানে ৩০টি কালো জিনিস আছে এবং মাত্র একটি সাদা জিনিস আছে। সেখানে যদি একটি সাদা জিনিস দেখতে পাই যা কাক নয়, হোক না সেটি টেনিস জুতা, তা হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো যে 'সব কাক কালো' এই সিদ্ধান্তটি এক্ষেত্রে সমর্থিত হয়েছে। এই সমর্থনকে তখন মোটেই উদ্ভট মনে হবে না। এভাবে যেখানেই কাক নয় এমন জিনিসের থেকে কাকের সংখ্যা অনেক বেশি হবে সেখানেই ব্যাপারটিকে প্যারাডক্স মনে হবে না। তাঁদের যুক্তি হলো আমাদের পরিচিত জগতের বিশেষ পরিস্থিতির কারণেই এটি প্যারাডক্স সৃষ্টি হয়েছে— এটি মৌলিক কিছু নয়।

ইনডাকশনকে দার্শনিক বৈধতা দিতে কেউ কেউ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরেন। তাঁদের কথা হলো লজিকের যুক্তিতেই ইনডাকশনকে কেন বৈধ হতে হবে? ইনডাকশন বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করে এটিই তো যথেষ্ট। বিজ্ঞানীরাও মোটের ওপর এই মতেরই অনুসারী— যাকে বলা যায় বাস্তব কার্যকারিতাতেই বৈধতা (প্র্যাগমেটিক জাস্টিফিকেশন)। তাঁরা বলেন আমরা যদি ভবিষ্যতে কোন ঘটনা ঘটবে কি ঘটবেনা তার ওপর বাজি ধরতে চাই তা হলে যে ঘটনা অতীতে বার বার ঘটছে সেটির ওপর ধরবো, নাকি যেটি সে রকম বার বার ঘটেনি তার ওপর ধরবো? অবশ্যই প্রথমটির ওপরেই ধরবো। সবাই যে এটির পেছনে বাজি ধরবে সেটিই ইনডাকশনকে গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট কারণ, আর কিছুর প্রয়োজন নেই। অবশ্য এটি বাস্তব কার্যকারিতার প্রশ্ন; মূল যে ইনডাকশন

সমস্যা সেটি আসলে জ্ঞান-বিচারের প্রশ্ন (এপিস্টেমিক কোয়েচ্‌শন)। যা অতীতে বার বার ঘটেছে তার পেছনে বাজি ধরতে আমরা প্রলুব্ধ হবো বটে কিন্তু জ্ঞান-বিচার করে বলতে পারবোনা কেন প্রলুব্ধ হচ্ছি। ইনডাকশন সমস্যাটিতো ওখানেই। কার্যকারিতার প্রশ্ন এনে জ্ঞান-বিচারের প্রশ্ন তো দূর করা যায়না। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের কাজে, সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন কাজে ঠিকই ইনডাকশনের ব্যবহার করছেন, করতে থাকবেন— কিন্তু তাতেও জ্ঞান-বিচারের বিষয়টি থেকেই যায়।

অনেকে ইনডাকশনকে একেবারে স্বতসিদ্ধ হিসেবে মেনে নিতে চান— বিজ্ঞান ও গণিতে এমন স্বতসিদ্ধ রয়েছে যা কোন প্রমাণ, কোন যাচাই ছাড়াই এ সবের আগেই (অ্যা প্রাইওরি) প্রকাশিত— নিজে নিজেই স্পষ্ট প্রমাণিত! কিন্তু সমস্যা হলো এ রকম স্বতসিদ্ধ জিনিসের কখনো কোন ব্যতিক্রম হয়না। কিন্তু ইনডাকশনের ব্যতিক্রম হয়— তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক কি বার্ট্রান্ড রাসেলের গল্পের সেই মুরগির ক্ষেত্রেই হোক। কাজেই একে স্বতসিদ্ধ বলেও পার পাওয়া যাবে না। হয়তো দার্শনিকের জ্ঞান-বিচারের আশীর্বাদ না নিয়েই বিজ্ঞানীকে এই ক্ষেত্রে তাঁর কাজ করে যেতে হবে। তিনি কার্যকারিতার মাধ্যমেই একে সব সময় সঙ্গত নীতি হিসেবে ভেবেছেন, এবং ভবিষ্যতেও ভাববেন। সেটি করাতে বিজ্ঞানের কাজে মৌলিক কোন হেরফের ঘটেনা। কিন্তু ইনডাকশনের সমালোচনাগুলো বিজ্ঞানের জন্যও মূল্যবান, এটি বিজ্ঞানকে নিজের পদ্ধতির আরো ভাল বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। তবে আধুনিক একজন দার্শনিকের উক্তিটিই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত গুরুত্ব পেতে পারে— "ইনডাকশন বিজ্ঞানের গৌরব, কিন্তু দর্শনের কেলেঙ্কারি"।

বিজ্ঞানের কাজ তত্ত্বের প্রত্যায়ন নয়, তত্ত্বের মিথ্যাকরণ

মিথ্যাকরণ-যোগ্যতাই তত্ত্বের গুণ:

গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের পর থেকে বিজ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রে একটি বড় অবদান রেখেছেন কার্ল পপার। তিনি ইনডাকশন সমস্যার এক অনন্য সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন যা বিজ্ঞানের পদ্ধতির আলোচনাকে অনেক দূর নিয়ে গেছে। তিনি স্রেফ দেখালেন যে বিজ্ঞান ইনডাকশন ব্যবহারই করেনা, কাজেই অন্তত বিজ্ঞানের জন্য ইনডাকশন সমস্যা বলে কিছু নেই। তাছাড়া এমনটি ভাবার পেছনে তাঁর আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল। বিজ্ঞান নয় এমন আরো বেশ কিছু বিদ্যা যে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশ নিয়ে নিজেদেরকে বিজ্ঞান বলে দাবী করে সেই মেকি বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য করার জন্যও তিনি যুৎসই নির্ধারক খোঁজার চেষ্টা করছিলেন।

একটু আগে আমরা সাদামাটা ইনডাকশনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ তথ্য থেকে তত্ত্ব সৃষ্টির বদলে বিজ্ঞানে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনুমানের ফল যাচাই

পদ্ধতির কথা বলছিলাম। এরও ভাল বিশ্লেষণ করেছেন পপার— ওই একই রকম কথায়। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানের তত্ত্ব সৃষ্টি হয় বিজ্ঞানীর চিন্তায় অনুমানের মাধ্যমে। বিজ্ঞানী সেই অনুমানটির যৌক্তিক ফলকে বাস্তবে যাচাই করেন বটে কিন্তু তা একে বাস্তবতার পরীক্ষায় পাশ করাবার জন্য নয়, একে ফেল করাবার চেষ্টায়। অনুমানটি সত্য কিনা সেটি প্রত্যায়িত (ভেরিফিকেশন) করা তাঁর লক্ষ্য নয়, বরং সেটির মিথ্যাকরণটাই (ফল্‌সিফিকেশন) তাঁর কাজ। নিজেদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে নানা অনুমান আসতে পারে, সেগুলোকে একে একে মিথ্যাকরণের মাধ্যমে ছাঁটাই করাটাই বিজ্ঞানীর কাজ। এই ছাঁটাই পর্বের মধ্যে যেগুলো টিকে যেতে পারে সেগুলোই তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর অনুমানটির ফল বা ভবিষ্যদ্বাণীটি পর্যবেক্ষণে না পাওয়া গেলে সে অনুমান মিথ্যা হয়ে যায়। একবার তেমনটি ঘটলে মিথ্যাকরণের জন্য সেটিই যথেষ্ট, অনুমানটি তাতেই ছাঁটাই হয়ে যায়, ওই একবারেই। অন্য দিকে অনুমান সত্য একথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বার বার পর্যবেক্ষণে তাকে প্রত্যায়িত করতে হয়, তারপরও এটি সমর্থিত হয় মাত্র, কখনোই চূড়ান্ত ভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়না। তাই সেক্ষেত্রে বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে কিনা দেখার দরকার হয়, এবং তার ভিত্তিতে সাধারণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়— সেটি ইনডাকশন। কিন্তু মিথ্যাকরণের জন্য এগুলোর কোন কিছুর দরকার নেই, একবার ভবিষ্যদ্বাণী না ফল্‌লেই এই অনুমান আর চলেনা। পপারের মতে বিজ্ঞান মিথ্যাকরণই করে, কাজেই ইনডাকশনের স্থান বিজ্ঞানে নেই।

মিথ্যাকরণ ঘটার জন্য অনুমানের ভবিষ্যদ্বাণীকে যে একেবারে নিখাদ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার তাও পপার মনে করেন না, কারণ তাঁর মতে অনুমানের তত্ত্বটি ঠিকই পর্যবেক্ষণের ওপর ভর করে থাকে। মিথ্যাকরণটি তা হলে হচ্ছে কী ভাবে? পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অনুমানের ভবিষ্যদ্বাণী মেলানো ছাড়াও এ কাজে বিজ্ঞানী আরো কিছু করেন। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অনুমানের তাত্ত্বিক কাঠামোর অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য আছে কিনা এটিও তাঁরা দেখেন। তাছাড়া অনুমানের মধ্যে যৌক্তিক অংশ ও বাস্তব অংশ আলাদা করা যাচ্ছে কিনা, এবং সেই বাস্তব অংশ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলছে কিনা তাও গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে অনুমানের ওই ফল অন্যান্য তত্ত্বের ফল থেকে আলাদা নতুন কিছু দিচ্ছে কিনা তা দেখা অর্থাৎ এটি নতুন কোন সমস্যা সমাধান করছে কিনা। এখানেও কাজটি ইনডাকশন নয়, বরং ডিডাকশন— আগের তত্ত্বগুলো থেকে যৌক্তিক ভাবে কত বিভিন্ন রকম ফল নির্ণয় করা যেতো, এখানে তার চেয়ে নতুন ধরণের কিছু ফল নির্ণয় করা যাচ্ছে কিনা তা দেখা। বিশেষ করে গণিতের প্রয়োগ অনুমানের মধ্যে নানা ফল দেবার এই উর্বরতা আছে কিনা দেখাতে পারে। বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে

মেলাটাই অবশ্য সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এই সবগুলো পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই মিথ্যাকরণ এড়ানো যায়— পপার অবশ্য মনে করেন বিজ্ঞানীর মূল চেষ্টাটি হলো অনুমানকে এভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন করে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

মিথ্যাকরণ থেকে রেহাই পেয়ে যে অনুমানগুলো টিকে যায় দেখা হয় সেগুলোর মধ্যে বেশি সমর্থিত হয়েছে কোন্‌টি, সেটিকেই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করা হয়; তবে চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব হিসেবে নয়, আপাতত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব হিসেবে। এই প্রক্রিয়ায় সেই তত্ত্বই গৃহীত হবার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশি যেটির মিথ্যাকরণ হবার সুযোগ ছিল সব চেয়ে বেশি। সেই তত্ত্বে এতো সুনির্দিষ্ট করে এতো বেশি রকমের ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়েছে যে এর যে কোনটিতে পদে পদে তার মিথ্যাকরণ হবার ঝুঁকি ছিল। এরকম অধিক ঝুঁকি সত্ত্বেও যেই অনুমান মিথ্যাকরণের পরীক্ষায় পাশ করে এসেছে সেটিই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে সব চেয়ে ভাল। আর যেই অনুমানের সে রকম মিথ্যাকরণ হবার ঝুঁকি কম কারণ সেটি খুব সুনির্দিষ্ট করে তেমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেনা তাকে তেমন 'অগ্নি পরীক্ষায়' নামতে হয়না, সে রকম অনুমান মোটেই ভাল বৈজ্ঞানিক অনুমান নয়। এটি সহজে পরীক্ষা পাশ করতে পারলেও তত্ত্ব হিসেবে তার মূল্য কম হবে এর থেকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ আরেকটি তত্ত্ব পাশ করে এলে সেটি ওই কম ঝুঁকিপূর্ণটিকে সরিয়ে দেবে। কোন তত্ত্বে যদি মিথ্যাকরণ হবার কোন ঝুঁকিই না থাকে তবে সেটি কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই হতে পারে না। কেউ যদি এমন একটি তত্ত্ব দেন যে 'বৃষ্টি না হলে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে' সেটি মিথ্যা হবেনা বটে কিন্তু মিথ্যাকরণযোগ্য না হওয়ায় সেটি একটি বৈজ্ঞানিক অনুমান হবেনা। অন্য দিকে 'বজ্রের আওয়াজ পেলে বিজলি দেখা যাবে' এরকম কথার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের সুযোগ আছে বলে এটি একটি বৈজ্ঞানিক অনুমান হতে পারে। মেকি বিজ্ঞানের অনেক বক্তব্যকে কখনো মিথ্যাকরণ করা যায়না, পরীক্ষার কোন সুযোগ এদের মধ্যে থাকে না বলে পরীক্ষা না দিয়েই সেগুলো পাশ করে। তাই এদের কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই।

কাজেই বিজ্ঞানে আনুমানিক তত্ত্ব হবারও শর্ত হলো তার 'মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা', অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন হবার সুযোগ তার মধ্যে আছে কিনা তা। মিথ্যাকরণ-যোগ্য হতে হলে তত্ত্বের মধ্যে এমন উপাদান থাকতে হবে যার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক আছে এবং যা এমন সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করবে বা ফল দেবে যা বাস্তবে যাচাই করে তা সত্য নাকি মিথ্যা যে কোন একটি উত্তর পাওয়া যাবে— ধাঁধাঁর মত ধোঁয়াটে উত্তর নয়। কোন তত্ত্ব যদি শুধু কথার হেরফের হয় অর্থাৎ ডিডাকটিভ যুক্তিসর্বস্ব হয়, নিজের দেয়া সংজ্ঞানির্ভর হয়, কিংবা মেটাফিজিক্স জাতীয় বায়বীয় গোছের হয় তা হলে সেটি এই অর্থে

মিথ্যাকরণযোগ্য হবার কথা নয়। আর সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরও মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা সমান নয়— যেগুলোর যাচাইয়ের পরীক্ষায় ফেল করার ঝুঁকি বেশি সেগুলোর মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা বেশি; টিকে গেলে সেগুলোই হয় ভাল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে মিথ্যাকরণ-যোগ্যতার একটি মাত্রা আরোপ করা যেতে পারে।

ধরা যাক মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনটি বিভিন্ন আনুমানিক তত্ত্ব দেয়া হলো। 'ক' তত্ত্বে এরিস্টোটলকে অনুসরণ করে বলা হলো যে ভারি জিনিস পৃথিবীর ওপর পড়ে যায় কারণ এটি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। 'খ' তত্ত্বে নিউটনকে অনুসরণ করে বলা হলো যে মহাবিশ্বে যে কোন ভর অন্য ভরকে আকর্ষণ করে। 'গ' তত্ত্বে আইনস্টাইনকে অনুসরণ করে বলা হলো যে সব ভর তার চারিদিকের স্থান-কালে এমন সব ভাঁজের সৃষ্টি করে যে ওর মধ্যে থাকা যে কোন কিছু ভাঁজের সৃষ্ট টানাপোড়েনে ওই ভরের দিকে চলে যায়। তিনটি তত্ত্বেই এমন কিছু আছে যা তাদেরকে মিথ্যাকরণের ঝুঁকিতে ফেলে, যদিও আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে তিনটি তত্ত্বই অন্তত তখনকার মত মিথ্যাকরণ এড়াতে সক্ষম হয়েছে। তিনটি তত্ত্বই মিথ্যাকরণযোগ্য কিন্তু তিনটিই সমান ভাবে মিথ্যাকরণযোগ্য কি? তাদের মিথ্যাকরণ-যোগ্যতার মাত্রা কি একই?

একটু ভাবলেই দেখা যাবে 'ক' তত্ত্বটির মিথ্যাকরণ-যোগ্যতার মাত্রা সব চেয়ে কম। এর কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ সব ভারি বস্তুর ওপর আছে কিনা সেটি যাচাইয়ে হ্যাঁ বা না হওয়ার ওপর এই তত্ত্বের ঝুঁকি সীমাবদ্ধ। ওপরে আমরা মিথ্যাকরণের অন্যান্য যে সব পরীক্ষার কথা বলেছি সে সবও এই তত্ত্বের ক্ষেত্রে খুব কঠিন কিছু হয়না। জটিলতা কম বলে তার অনুমানের তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে তার অমিলের সুযোগ কম। তাত্ত্বিক কাঠামোতে শুধু পৃথিবীই বিবেচ্য, কারণ এরিস্টোটলের ধারণায় বাকি সব জোতিষ্ক স্বর্গীয় ইথারে তৈরি— পৃথিবীর সঙ্গে তুলনীয় নয়। অনুমানের মধ্যে প্রাচীন এরিস্টোটলীয় ধারণার যৌক্তিক ভাগই বেশি— বাস্তবের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ভাবে মেলাবার জিনিস বেশি নেই। আর এর থেকে খুব বেশি জিনিসের ভবিষ্যদ্বাণী করারও সুযোগ নেই। সবদিক থেকেই এ তত্ত্বের পরীক্ষা সহজ, এর ঝুঁকি কম— তাই এর মিথ্যাকরণ-যোগ্যতাও সব চেয়ে কম। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে একে খুব উচ্চে মূল্যায়ন করা যায় না।

'খ' তত্ত্বে মিথ্যাকরণের ঝুঁকি 'ক' তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশি— ফলে মিথ্যাকরণ-যোগ্যতার মাত্রাও এর অনেক বেশি। এখানে মহাবিশ্বের সব ভরের কথা বলা হচ্ছে; তার কোথাও যদি মাধ্যাকর্ষণের ব্যত্যয় ঘটে তা হলে এটি পরীক্ষায় পাশ করবেনা। এমনকি 'ক' তত্ত্বটি যদি মিথ্যাকরণ হয়, তাহলেই 'খ' তত্ত্ব স্বয়ংক্রিয় ভাবেই বাতিল হয়ে যাবে। 'খ' তত্ত্বের চ্যালেঞ্জ গ্রহণটি তাই

অনেক বড়। অভিজ্ঞতায়ও দেখেছি নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব ওপরের সব রকম পরীক্ষায় 'ক' তত্ত্বের থেকে বেশি ঝুঁকি নিয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে নিউটনের সুনির্দিষ্ট সব গাণিতিক নিয়মের ভেতরে থেকে তাকে কাজ করতে হয়েছে— এই তত্ত্ব কাঠামোর সঙ্গে অমিলের ঝুঁকি ছিল অনেক বেশি। এর থেকে যে হাজারো ভবিষ্যদ্বাণী করা গেছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার সঙ্গে বাস্তবকে মিলতে হয়েছে। এই তত্ত্বে যৌক্তিক ভাগের থেকে বাস্তবতার ভাগ অনেক বেশি— কারণ এ তত্ত্বে বাস্তব পর্যবেক্ষণযোগ্য উপাদানই বেশি রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এর দ্বারা একটি সম্পূর্ণ নতুন গ্রহ নেপচুনের পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা গিয়েছিলো। পর্যবেক্ষণে সেই গ্রহটি পাওয়ার চ্যালেঞ্জটিও কম বড় ছিলনা। বুধ গ্রহের কক্ষপথের ব্যতিক্রমী ভাবে ক্রমাগত সরতে থাকাটি এই তত্ত্বকে এমন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীণ করেছিলো যে তার সমাধান এ তত্ত্বে আদৌ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর সবই 'খ' তত্ত্বের (নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের) অধিক ঝুঁকি এবং অধিক মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা প্রমাণ করে; আর এ জন্যই এটি এত সফল একটি তত্ত্ব।

কিন্তু 'গ' তত্ত্বটি অর্থাৎ আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব এদিক থেকে 'খ' তত্ত্বকেও ছাড়িয়ে গেছে— সে জন্য এটিই এখন সব চেয়ে প্রতিষ্ঠিত মহাকর্ষ তত্ত্ব। মহাকর্ষের মধ্যে আকর্ষণের বিষয় ছাড়িয়ে এর ভবিষ্যদ্বাণী বিস্তৃত হয়েছে স্থান-কালের প্রকৃতি, মহাবিশ্বের আকৃতি, ব্ল্যাকহোলের উপস্থিতি, মহাকর্ষ তরঙ্গের উপস্থিতি— ইত্যাদির মত আরো অসংখ্য ক্ষেত্রে। এই সবগুলোর ক্ষেত্রে একে পরীক্ষায় পাশ করতে হয়েছে। এটিই তাই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব— কিন্তু মনে রাখতে হবে বাকি দুটি তত্ত্বও তাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে মিথ্যাকরণকে এড়াতে পেরেছে। সেজন্য নিউটনের মহাকর্ষতো সাধারণ তারা বা গ্রহের পর্যায়েও দিব্যি এখনো ব্যবহার করা যাচ্ছে, যদিও এর চেয়ে বেশি ভর বা পুঞ্জীভূত ভরের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের তত্ত্ব অত্যাবশ্যকীয়। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে আমরা আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বের বৈশিষ্টগুলোকে বিস্তারিত দেখেছি।

বিজ্ঞানী মিথ্যাকরণকেই বেছে নেন কেন ঃ

সাধারণভাবে আমরা মনে করতে পারি বিজ্ঞানী তাঁর আনুমানিক তত্ত্বের পেছনে পর্যবেক্ষণের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টাই করবেন। এজন্য আনুমানিক তত্ত্ব থেকে করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে তিনি যতবার বাস্তবে সত্য হতে দেখবেন, অন্যরাও নানা এক্সপেরিমেন্টে বারবার করে যতবার এ ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে দেখবেন, তত্ত্বটি ততই প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে প্রথম বার এক্সপেরিমেন্টে এই যাচাই হওয়া না হওয়া সম্পর্কে যত উত্তেজনা থাকে, দ্বিতীয়বার এতটা থাকে না। এর কারণ প্রথমবার যাচাই হওয়া বা না হওয়ার মাধ্যমে এর সাফল্যের সম্পর্কে কৌতুহল বেশ কিছুটা কমে যায়। প্রথমবার

এক্সপেরিমেন্টের ফলে বিজ্ঞানে যতটা যোগ হয়েছে, এর পরের পুনরাবৃত্তির মধ্যে এই যোগ হওয়াটা ক্রমাগত কমে যায়। ওগুলোর দ্বারা তত্ত্বটি সমর্থিত হবার পরিমাণও সেভাবেই কমে যায়। আজ যদি আমি দোলকের এক্সপেরিমেন্ট করে তাতে নিউটনের তত্ত্ব যে কাজ করছে তা দেখতে পাই তাহলে তাতে আমি আনন্দ পাব বটে কিন্তু নিউটনের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সেটি কোন অবদান রাখবেনা, যেটি প্রথমদিকের এক্সপেরিমেন্ট রেখেছিলো। কাজেই কার্ল পপার দেখাবার চেষ্টা করলেন যে তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বারবার তার প্রত্যায়ন করার প্রয়োজন নেই; বরং উচ্চ মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা থাকা এবং তা সত্ত্বেও মিথ্যাকরণ না হওয়াকেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার শর্ত হয়ে থাকে। প্রথমদিকের এক্সপেরিমেন্টের এমন গুরুত্ব থাকার কারণ হলো তখনকার প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোর নিরিখে নিউটনের তত্ত্ব সেদিন একটি অদ্ভুত নতুন ধারণা ছিল। পরে আর সেটি তেমন ছিলনা।

পপারের মতে এই নতুনত্বই বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নতুনত্ব আসে একের পর এক বিভিন্ন অনুমানকে মিথ্যাকরণ করার চেষ্টার মাধ্যমে। এতে যেগুলো পাশ করে টিকে যায় দেখতে হয় তার মধ্যে সব চেয়ে বেশি মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা কোন্‌টির। সেটিই গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আরো ঝুঁকিপূর্ণ আরো দুর্দান্ত কোন তত্ত্ব এসে মিথ্যাকরণের পরীক্ষায় পাশ করে। ওভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হবার মানে হলো তখনকার জানা এ প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সত্য প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকা। অথচ সেগুলোই যখন বাস্তবে যাচাই হয় এবং টিকে যায় তখন আমরা আরো অগ্রসর তত্ত্ব পেয়ে যাই। ওপরের উদাহরণে ওভাবেই নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের পর আরো অগ্রসর আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব আমরা পেয়েছি।

পপার যেমনটি মনে করেন এবং আরো অনেকে যেমনটি মনে করেন, পর্যবেক্ষণ যদি আনুমানিক তত্ত্বের দ্বারা ইতোমধ্যেই প্রভাবিত হয় তা হলে সেই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করে তত্ত্বের প্রতি সমর্থন জানানো খুব একটি সঙ্গত কাজ হয়না; ওই পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে তত্ত্বটি চূড়ান্তভাবে খাড়া করা তো নয়ই। কিন্তু ব্যাপারটি যদি মিথ্যাকরণের হয় তা হলে সমস্যাটি এতটা প্রকট হয়না। কারণ মিথ্যাকরণে তো কোন অনুমানকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হচ্ছেনা, এমনকি সম্ভাব্য সত্য হিসেবেও নয়; শুধু দেখা হচ্ছে বাস্তব যাচাইয়ের পরীক্ষায় এটি কোন ভাবে পাশ করতে পারে কিনা। যদি পাশ করে তা হলে একে উত্তীর্ণ অন্য অনুমানগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ওগুলোর সঙ্গে তুলনা করে যদি সব চেয়ে বেশি মিথ্যাকরণ-যোগ্যতার কারণে এটিকেই গ্রহণ করা যায় আপাতত এটিই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব হবে। তত্ত্ব ভর করা পর্যবেক্ষণের কোন দোষে এই প্রক্রিয়া ভুল পথে যাওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। যদি ওই পর্যবেক্ষণ তত্ত্বের

প্রত্যায়নের মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করার ব্যাপার হতো তা হলে ভুলটি আরো বেশি হতো। পপারের মতে ক্রমাগত অনুমান আর ছাঁটাই— এটিই বিজ্ঞানের কাজ, অনুমানের প্রত্যায়ন করা নয়।

এই পুরো চিত্র থেকে অবিজ্ঞান অথবা মেকি বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে চিনতে পারা সহজ। এগুলো যে তত্ত্ব খাড়া করে সাধারণত সেগুলোর মিথ্যাকরণ একেবারেই সম্ভব হয়না— যে কোন পরীক্ষায় এদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলবেই। এ তত্ত্বগুলো এমন ভাবে সব কথা বলে যাতে মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা একেবারেই থাকে না। পপার বিশেষ করে সে সময়ের মনোরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু তত্ত্বের কথা বলেছেন। যেমন একটি এমনি একটি তত্ত্বে এক ধরণের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের সব আচরণকে তার অন্তর্নিহিত হীনমন্যতার ওপর আরোপ করা হয়েছে। এখন কোন জনমানবহীন জায়গায় কেউ যদি একটি বাচ্চাকে পুকুরে পড়ে যেতে দেখেন, এবং তিনি তাকে বাঁচাবার জন্য পুকুরে ঝাঁপ দেন তা হলে এই তত্ত্ব যাচাই হয়ে যায়। কারণ তত্ত্বটির একটি ভবিষ্যদ্বাণী হলো নিজের হীনমন্যতায় সব সময় এরকম মানুষ নিজেকে নিজে কাপুরুষ মনে করেন। এটি কাটিয়ে ওঠার জন্য তিনি ঝুঁকি নিয়েও নিজের সাহস নিজের কাছে প্রমাণ করতে চাইবেন। ঝাঁপ দেবার পর্যবেক্ষণে সেটিই প্রমাণিত হয়। একই তত্ত্ব থেকে আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী হতে পারে যেটি আগেরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। হীনমন্যতায় মানুষটি নিজেকে কাপুরুষ মনে করেন বলে ইচ্ছা থাকলেও তিনি ঝুঁকি নিয়ে কিছু করতে চাননা। তাই মানুষটি যদি বাচ্চাকে পানিতে পড়তে দেখে পুকুরে ঝাঁপ নাও দেন তা হলে এই শেষের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে দেখেও তত্ত্বটি প্রমাণিত হয়ে যাবে। কাজেই ঝাঁপ দেয়া বা না দেয়া উভয় পরিস্থিতিতেই তত্ত্বটি সব সময় পরীক্ষায় পাশ করবে, কোন পর্যবেক্ষণেই এর মিথ্যাকরণ হবেনা। তার মানে এই তত্ত্বের কোন মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা নেই। এভাবেই পপার দেখিয়েছেন বিজ্ঞান বলে দাবী করলেও মনোরোগ চিকিৎসার ওই তত্ত্বগুলো বিজ্ঞান নয়। মিথ্যাকরণের নীতির মধ্যেই পপার খুঁজে পেয়েছিলেন মেকি বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের থেকে আলাদা করার উপায়।

মিথ্যাকরণের নীতির সীমাবদ্ধতা:

পপারের মিথ্যাকরণের ধারণাটি বিজ্ঞানের দর্শনে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো এবং বিজ্ঞানকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর সমালোচকরা দেখিয়ে দিয়েছেন এই ধারণাটি সমস্যামুক্ত নয়। আরো বড় কথা পপার যদিও দাবী করেছেন যে বিজ্ঞানীদের কাজ অনুমানকে মিথ্যাকরণ করা, কোন কোন বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ দেখিয়েছেন যে ইতিহাস এমন কথা বলেনা। যুগে যুগে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা তাঁদের তত্ত্বকে মিথ্যাকরণ করেননি, বরং নানা ব্যর্থতার মুখেও সে তত্ত্বকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন।

পপার বলেছেন আনুমানিক তত্ত্বের একটি মাত্র ফলও যদি বাস্তব পর্যবেক্ষণে পাওয়া না যায় তা হলেই ওই তত্ত্বটির মিথ্যাকরণ ঘটে যায়। কিন্তু ওই একটি পর্যবেক্ষণে ভুলচুকও তো ঘটতে পারে; বিশেষ করে যে তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে পর্যবেক্ষণটি ঘটে তার দোষেই সেটি পরীক্ষায় পাশ নাও করতে পারে এবং সেভাবে তত্ত্বটির মিথ্যাকরণ ঘটে যেতে পারে ভুলক্রমেই। এরকম কারণে ভাল তত্ত্বও বাতিল হয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হবার কথা। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। কোপারনিকাস সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের বৈপ্লবিক তত্ত্বটি যখন দিয়েছিলেন তখন সবাই কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং এর ভিত্তিতে টলেমির তত্ত্ব ভালই কাজ করছিলো। ওই পরিস্থিতিতে কোপারনিকাসের এই নতুন তত্ত্বকে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। খুব সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের জন্য খ্যাত জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে একে এমনি একটি পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। কোপারনিকাসের তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবী যদি সত্যি সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করে তা হলে আজকে এবং ছয় মাস পর পৃথিবী সূর্যের একেবারে দুই বিপরীত পাশে দুই বিশাল ব্যবধানে দুই জায়গায় থাকার কথা। দূরের স্থির তারাকে এই দুই জায়গা থেকে দেখলে ওই তারার কৌণিক অবস্থানে ছোট একটি কোণের পার্থক্য দেখার কথা। পরস্পর থেকে কিছু দূরে থাকা দুটি জায়গা থেকে দেখলে সব সময় দূরের জিনিসে এই কোণের পার্থক্য দেখা যায়— যাকে প্যারালাক্স কোণ বলে, এবং এই কোণ থেকে জিনিসটির দূরত্ব বের করা যায়। দেখার জায়গাদুটির মধ্যে ব্যবধান বেশি হলে কোণটি বড় হয়। সেই হিসেবে বিরাট ব্যবধানের এই দুই জায়গায় থাকা পৃথিবী থেকে তারার একটি প্যারালাক্স কোণ টাইকো ব্রাহে আশা করেছিলেন। কিন্তু সে রকম কোন কোণ তিনি দেখতে পাননি। এ পরীক্ষায় ফেল হবার ফলে তিনি নিজে কোপারনিকাসের নতুন তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেছেন। আসলে কিন্তু তারার দূরত্ব তিনি যতটা মনে করেছিলেন তার চেয়ে বহু গুণ বেশি হওয়াতেই দেখা যাওয়ার মত প্যারালাক্স কোণ তিনি খুঁজে পাননি। পপারের নীতি অনুযায়ী সেদিনই কোপারনিকাসের তত্ত্বের মিথ্যাকরণ হয়ে যাওার কথা। ভাগ্যিস সেটি হয়নি। এ পরীক্ষায় ফেল করলেও এ তত্ত্ব অন্যান্য পরীক্ষায় পাশ করেছিলো; এবং বিভিন্ন কিছু তারার প্যারালাক্স কোণও পরে উন্নত প্রযুক্তিতে মাপা সম্ভব হয়েছিলো।

আর একটি উদাহরণ নেয়া যাক। ইউরেনাস গ্রহটির গতিপথ পর্যবেক্ষণ করে মনে হচ্ছিলো যে এটি নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব মেনে চলছেনা। এজন্য বিজ্ঞানীরা কি সঙ্গে সঙ্গে নিউটনের তত্ত্বের মিথ্যাকরণ ঘোষণা করেছিলেন? তা

কিন্তু নয়। বরং উনবিংশ শতাব্দীর দু'জন বিজ্ঞানী এড্যাম্‌স ও ল্যাভারীয়েরের ওই ব্যতিক্রমী গতিপথের ব্যাখ্যায় অনুমান করেছিলেন যে একটি অজানা, অনাবিষ্কৃত গ্রহের আকর্ষণে ইউরেনাস তার কক্ষপথ থেকে কিছু বিচ্যুত হচ্ছে। এই অনুমান থেকে হিসেব করে তাঁরা অজানা গ্রহটির সম্ভাব্য ভর, অবস্থান ইত্যাদির ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আরেকজন বিজ্ঞানী গ্যালে মানমন্দিরের শক্তিশালী দূরবীক্ষণে ঠিক ওই জায়গার সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করে সত্যি সত্যি একটি নতুন গ্রহ নেপচুন আবিষ্কার করেন। পপার নিজে এই ঘটনাটিকে উল্লেখ করেছেন তাঁর মিথ্যাকরণের নীতির একটি প্রমাণ হিসেবে— নিউটনের তত্ত্ব মিথ্যাকরণের পরীক্ষায় আরো এক ভাবে পাশ করার উদাহরণ হিসেবে তিনি একে দেখিয়েছেন।

কিন্তু গ্যালে যদি তখনকার মত নেপচুনকে উদ্ঘাটন করতে না পারতেন তখন কী হতো? তার ফলে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব কি মিথ্যে প্রমাণিত হতো? অবশ্যই নয়, বরং গ্যালে কেন নেপচুনকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন তার নানা রকম কারণের কথা বলা যেতো— যার প্রত্যেকটিই খুবই সম্ভব। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ফলে দূরবীক্ষণের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হতে পারে, কিংবা অসংখ্য অদৃশ্য গ্রহাণুপুঞ্জে বেষ্টিত থাকার কারণে নেপচুন আবছা হয়ে যাওয়ার ফলে সেটি দৃষ্টিতে না আসতে পারে— এমনিতরো আরো নানা কারণ কল্পনা করে নেয়া কঠিন হতো না। কাজেই তার কোন ভবিষ্যদ্বাণী পর্যবেক্ষণে সমর্থিত না হলেই একটি তত্ত্বের মিথ্যাকরণ ঘটবে পপারের এই কথা সবক্ষেত্রে মানা যায় না। মিথ্যাকরণকে এড়াবার জন্য তত্ত্বের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী তাঁর অনুমানের সঙ্গে আরো কিছু সহযোগী তত্ত্ব যোগ করে দিতে পারেন— যেমন নেপচুন না দেখা গেলে খুব সম্ভব যা করা হতো।

অন্য দিকে পপার তাঁর মিথ্যাকরণের নীতিকে যেভাবে বিজ্ঞান আর মেকি বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করার নির্ধারক হিসেবে ব্যবহার করেছেন সেটিও সব সময় কাজ করেনা। যেমন জ্যোতিষ (এস্ট্রোলজি) নামে পরিচিত বিদ্যা যে বিজ্ঞান নয় যেই ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। "ভাগ্য ভাল হলে এই ক্রিকেট ম্যাচে আমাদের দল জিতবে কারণ এ খেলায় ভাগ্যের একটি হাত থাকবেই"— জ্যোতিষবিদরা প্রায়ই এ ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন, যাকে কোন ভাবেই মিথ্যাকরণ করা সম্ভব নয়। এমন উক্তির মিথ্যাকরণ-যোগ্যতার অভাবের কারণে খুব সহজেই পপারের নীতি অনুযায়ী জ্যোতিষবিদ্যাকে মেকি বিজ্ঞান বলা যায়। কিন্তু জ্যোতিষবিদ্যা সহ আরো বহু মেকি বিজ্ঞানের সব ভবিষ্যদ্বাণীর কোনটির মিথ্যায়ন যোগ্যতা থাকে না সেকথা বলা যাবেনা। যেমন তাঁর রাশিফল ঘেঁটে জ্যোতিষবিদ যখন বলেন "আপনার এই দিনটি খুব শুভ, নিশ্চিত ধনপ্রাপ্তি ঘটবে" তখন কিন্তু একে মিথ্যাকরণ যোগ্য নয় বলা যাবেনা।

দিনের শেষে ঠিকই স্থির করা যাবে ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্য ছিল না মিথ্যা ছিল। তা হলে একে মেকি বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করবো কী ভাবে? এই ব্যাপারে পপারের অনুসারীরা বলেন বিজ্ঞান হতে হলে মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা থাকলেই শুধু হবেনা, ওটিকে মিথ্যাকরণ করা যায়নি সেটিও দেখাতে হবে। জ্যোতিষের ওই পরের কথাটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রে বাস্তবে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়াই স্বাভাবিক। আর যেহেতু জ্যোতিষবিদ্যা যে সব কথার মিথ্যকরণ-যোগ্যতা আছে, সেগুলোও এভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাই এই বিদ্যা একটি মেকি বিজ্ঞান। কাজেই শুধু মিথ্যাকরণ-যোগ্যতার অভাবকেই নকল বিজ্ঞানের নির্ধারক হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এটিও পপারের নীতির একটি দুর্বলতা। পপার যে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে অনুমানকে প্রত্যায়ন করার বদলে মিথ্যাকরণ করার কথা বলেছেন, অনেকে মনে করেন তিনি নিজেও সেই নীতি মানেননি। মিথ্যাকরণে টিকে যাওয়া তত্ত্বগুলোর মধ্যে অধিক সমর্থিতগুলোকে গ্রহণ করার কথার মধ্যেই কি প্রত্যায়ন করার ব্যাপারটি লুকিয়ে নেই?

স্বাভাবিক বিজ্ঞান আর বৈপ্লবিক বিজ্ঞানের পার্থক্য

পার্থক্যটি বৈজ্ঞানিক আবহের মধ্যে:

যদিও পপারের মতে বিজ্ঞানীদের কাজ তত্ত্বের মিথ্যাকরণ, বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করে এ কথাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য নয় বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন টমাস কূন। গতশতাব্দীর ষাটের দশকে এই বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন এতে এক একটি স্বাভাবিক সময়ের পর আসে একটি বিপ্লব। এক একটি দীর্ঘ সময় বিজ্ঞান একটি সুনির্দিষ্ট আবহের (প্যারাডাইম) মধ্যে থাকে এবং ওই আবহের যে প্রধান তত্ত্বসমূহ সেগুলোকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখে সেগুলোর আওতাতেই কাজ করে। কূন এই পর্যায়কে বলেছেন 'স্বাভাবিক বিজ্ঞান'— কারণ অধিকাংশ সময় এটিই বিজ্ঞানের রূপ।

ওই যে আবহটি স্বাভাবিক বিজ্ঞানের সময় একই এবং অপরিবর্তিত থাকে ওই সময়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ধারণার সমন্বয়েই সেটি তৈরি হয়— প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপ এরিস্টোটলের তত্ত্বগুলো টলেমি প্রমুখদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে প্রায় দু'হাজার বছর বিশ্বতত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যাকে একই আবহে রেখেছিলো। এ সময়ের বিজ্ঞানে সেই আবহের মূল ধারণাগুলো বদ্ধমূল ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল— পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে, ভারি জিনিস কেন্দ্রের দিকে যায়, চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-তারা সব স্বর্গীয় ইথারে তৈরি— মোটেই পৃথিবীর মত নয়, পৃথিবীর সবকিছু চার মৌলে গড়া; ইত্যাদি ছিল সেই আবহের অন্তর্গত। এই দীর্ঘ সময়ে এক্ষেত্রে যত বিজ্ঞান চর্চা হয়েছে তা এই সবকে মেনে নিয়েই

হয়েছে। তেমনি পরবর্তী কালে নিউটনের তত্ত্বে গতি তত্ত্ব ও মহাকর্ষ তত্ত্বের আওতায় তিন শ' বছর আধুনিক নিউটনীয় বিজ্ঞানও ভিন্ন আরেকটি নিরবিচ্ছিন্ন আবহে লালিত হয়েছে। তেমনি ভিন্ন একই আবহে থেকেছে এক এক সময় ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব, কিংবা কেমিস্ট্রির ফলিজেস্টোন তত্ত্ব, আজকের জীববিজ্ঞানে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব ইত্যাদি।

এ ভাবে 'স্বাভাবিক বিজ্ঞানে' তার প্রতিষ্ঠিত আবহের মধ্যে কাজ করার গুরুত্ব হলো ওসময় বিজ্ঞানীরা এমন কিছু করেননা যাতে তখনকার প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কোন অবস্থাতেই তাঁরা ওগুলোকে মিথ্যাকরণের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করেননা— পপার যাই বলুন না কেন। তাঁরা বরং প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোকে আরো নানা সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করেন, ও সব তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দেন, এবং ওগুলোকে আরো কার্যকর করে তোলেন। যখনই ওসব তত্ত্বের ব্যত্যয়ী কোন ফলাফল পাওয়া গেছে তাঁরা তখন এর দ্বারা কোন আঘাত আসা থেকে মূল তত্ত্বকে নানা ভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। ওই তত্ত্বের সঙ্গে সহায়তাকারী আরো কিছু অনুমান যোগ করে তাঁরা সাধারণত এটি করে থাকেন— যাতে মূল তত্ত্ব অক্ষত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ নিউটনের পর তাঁর ওই একই আবহের সময় বহু অসাধারণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী নিউটনীয় তত্ত্ব নিয়ে চমৎকার সব কাজ করেছেন, প্রকৃতির নানা রহস্য এই তত্ত্ব দিয়েই উদ্ঘাটন করেছেন, এমনকি নতুন গাণিতিক আঙ্গিকে এনে একে আরো উর্বর তত্ত্বে পরিণত করেছেন। ওখানে মূল তত্ত্বের কোন সীমাবদ্ধতা দেখা দিলে নতুন অনুমান যোগ করে তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ইউরেনাস গ্রহের গতিবিধির ক্ষেত্রে এ তত্ত্বের ব্যত্যয় ঘটার ব্যাখ্যা দিতে কীভাবে একেবারে অজানা এক নতুন গ্রহের অস্থিত্ব অনুমান করতে হয়েছিলো তা আমরা দেখেছি এবং ভাগ্যিস অনুমানটি সত্য বলে প্রমাণিতও হয়েছিলো। স্বাভাবিক বিজ্ঞানের পুরোটা সময় এমনটিই হতে থাকে।

কূনের ভাষায় স্বাভাবিক বিজ্ঞানে কাজগুলোর সবগুলোকে ভাবা যেতে পারে এক রকম ধাঁধা সমাধানের কাজ হিসেবে। ধাঁধাঁগুলোর উৎপত্তি ওই বৈজ্ঞানিক আবহের মধ্যেই। এ ধাঁধার সমাধান করতে গিয়ে যদি এমন কিছু উদ্ঘাটিত হয় যা আবহের মূল তত্ত্বের দুর্বলতা হিসেবে দেখা দিতে পারে, তখন বিজ্ঞানী ওই সংশয়টি ধাঁধাটির ওপরেই আরোপ করেন, মূল তত্ত্বের ওপর নয়। এভাবে তিনি সংশয়টিকে তুচ্ছ করে দেখার চেষ্টা করেন, এবং তা সম্ভব না হলে ওই ধাঁধাঁর সঙ্গে এমন কিছু সাহায্যকারী অনুমান লগিয়ে নেন যাতে সংশয়টি আর না ঘটে। সেই এরিস্টোটলের তত্ত্বের যে আবহ তাকেই আবার উদাহরণ হিসেবে নেয়া যাক। ওই তত্ত্ব এবং ওই ধারণাগুলোর ভিত্তি করে ওই পুরো যুগে জ্যোতির্বিদ্যার বহু ধাঁধাঁর সমাধান হয়েছে— জ্যোতিষ্ক সমূহের

অবস্থান ও গতিবিধি নিয়ে কিন্তু কখনো কখনো ওই ধাঁধাঁ সমাধানে সমস্যা দেখা দিয়েছে— যেমন টলেমি নানা মৌসুমে সূর্যের গতিবেগ পবির্তন, মঙ্গল গ্রহের অনিয়মিত গতি, ইত্যাদির সমাধান কিছুতেই নিখাদ এরিস্টোটলীয় তত্ত্বের মাধ্যমে দিতে পারছিলেননা— কারণ সেই তত্ত্বে সূর্য বা গ্রহ মাত্রই সমান বেগে নিখুঁত বৃত্তাকার পথে ঘোরার কথা। কিন্তু টলেমি তো তাই বলে এই আবহের মধ্যে কাজ করে তার মূল তত্ত্ব এরিস্টোটলীয় ধ্যান-ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেননা! তাই তিনি দোষ চাপিয়েছেন তাঁর ধাঁধার ওপর— ধাঁধাঁটির উপস্থাপনে ভুল আছে, পৃথিবী সূর্যের কক্ষের ঠিক কেন্দ্রে নেই, কেন্দ্র থেকে একটু সরে আছে। অন্য দিকে মঙ্গল তো বৃত্তাকারে নিয়মমত সমবেগে ঘুরছে ঠিকই তবে পৃথিবীর চারদিকের কক্ষের ওপর নেই, কক্ষের ওপর আছে ছোট অন্য বৃত্তের (এপিসাইকেল) কেন্দ্রটি, যে বৃত্ত ধরে পাক খেতে খেতে মঙ্গল পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। এইগুলো হলো টলেমির সাহায্যকারী বাড়তি অনুমান। এগুলোর ফলে পৃথিবী থেকে মনে হবে সূর্যের ও মঙ্গলের ওই ব্যত্যয়ী উল্টাপাল্টা গতিবিধিগুলো আছে, কিন্তু সেটি নেহাৎ দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হওয়া মাত্র; আসলে তা নেই কারণ বাড়তি অনুমানেও বৃত্ত আর সমবেগ ঠিক আছে— কাজেই এরিস্টোটলের তত্ত্ব রক্ষা পেয়ে গেলো। বিজ্ঞানের ইতিহাসে বার বার এভাবে তত্ত্বকে বাঁচাতে দেখা গেছে— ওটিই স্বাভাবিক বিজ্ঞানের চরিত্র। কূন এভাবে স্বাভাবিক বিজ্ঞানে পপারের মিথ্যাকরণের নীতি মানতে নারাজ।

কিন্তু কূনের মতে এক একটি বৈজ্ঞানিক আবহের মধ্যে এই যে স্বাভাবিক বিজ্ঞান তার তত্ত্বগুলো যদি প্রশ্নবিদ্ধ হতে হতে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যে একে প্রতিষ্ঠিত রাখা খুব দুরূহ হয়ে পড়তে পারে। তা ছাড়া বড় ধরণের কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ফলে এই তত্ত্বে ও এই আবহের একটি গুরুতর সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। সে সময় ওই তত্ত্ব বা ওই আবহের সঙ্গে মোটেই মেলেনা এমন কোন নতুন তত্ত্ব যদি সেই সমস্যা বা সেই সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে, তখন এতদিন ধরে চলে আসা বৈজ্ঞানিক আবহের অবশেষে পরিবর্তন ঘটে। আর বিজ্ঞানের রাজ্যে সেটি একটি 'বিপ্লব', একটি আবহ-পরিবর্তন (প্যারাডাইম শিফ্‌ট)। কূনের মতে সাধারণত দীর্ঘ সময় ধরে 'স্বাভাবিক বিজ্ঞান', আর কচিৎ কখনো কখনো 'বৈপ্লবিক বিজ্ঞান'— এভাবেই চলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। সাধারণ বিজ্ঞানে মূল তত্ত্বের মিথ্যাকরণের প্রশ্ন ওঠেনা, কিন্তু বৈপ্লবিক বিজ্ঞানে সেটি ঘটে।

এরকম বিপ্লবের সাক্ষাত আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বার বার পেয়েছি। হাজার বছরের এরিস্টোটল-টলেমির পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বের আবহে সাধারণ বিজ্ঞানের পর এসেছিল কোপারনিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের বিপ্লব— শুরু

হয়েছিলো একটি নতুন আবহ। কোপারনিকাসের বহু আগে থেকেই পূর্ববর্তী আবহ নিয়ে বহু সংশয় জমা হয়েছিলো, কোপারনিকাসের সাহসী নতুন তত্ত্ব অবশেষে বিপ্লবটি ঘটিয়েছে। ওভাবে নিউটনীয় তত্ত্বে কিছু কিছু সমস্যা সমাধানের বাইরে থেকে যাচ্ছিলো— যেমন বুধ গ্রহের কক্ষপথের নিয়মিত স্থান পরিবর্তন। কিন্তু মাইকেলসন-মর্লির এক্সপেরিমেন্টে সৃষ্ট সংকট এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব গত শতাব্দীর শুরুতে পদার্থবিদ্যায় বিপ্লব নিয়ে এসেছে। পরে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছিল একই ভাবে সৃষ্ট এক্ষেত্রে আর একটি বিপ্লব। এটিও নিউটনীয় ধ্যান-ধারণার আবহকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। অন্যান্য সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এভাবে বিপ্লব এসেছে— যেমন কেমিস্ট্রিতে ফলিজেস্টোন তত্ত্বের বদলে আধুনিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার তত্ত্ব, জীববিজ্ঞানে প্রজাতির পৃথক সৃষ্টি তত্ত্বের বদলে বির্বতন তত্ত্ব ইত্যাদি।

বিজ্ঞানে বিপ্লব যখন ঘটে তখন বৈজ্ঞানিক আবহ সম্পূর্ণ বদলে যায়। কূনের মতে নতুন যে আবহটি আসে তার সঙ্গে আগের আবহটির কোন সামঞ্জস্য থাকে না। এই দুটি আবহ পরস্পর সামঞ্জস্যহীন (ইনকমেনস্যুরেবল) হয়ে পড়ে— একটির ভাষা যেন অন্যটিতে অবোধ্য হয়ে পড়ে। আসে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারা যাতে আগে অনেক কথাবার্তা ভিন্ন রকম অর্থ দেয়। কূনের এই সামঞ্জস্যহীনতার ব্যাপারটি সত্য হলে বিজ্ঞানকে গোড়া থেকে ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করার যে কথা বলা হয় সেটি শুধু এক একটি আবহের মধ্যেই সত্য হবে; নতুন আবহের মধ্যে পুরানো আবহের পুঞ্জীভূত ধারণা সেভাবে আসেনা। সামঞ্জস্যহীনতাকে আরো একভাবে দেখা যায়— যেটি এসেছে গণিতে এমন ধারণা থেকে। একটি আবহের বিজ্ঞানে যে সব পরিমাপ করা হয়, এবং অন্য আবহের বিজ্ঞানে যে সব পরিমাপ করা হয় তাদের উভয়কে মাপা যাওয়ার মত কোন সাধারণ মাপকাঠি আর থাকে না। অর্থাৎ কিনা আগের পরের উভয় আবহকে বিচার করারও কোন সাধারণ মানদণ্ড সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার ভর, শক্তি, স্থান, কাল ইত্যাদি বহু জিনিসের অর্থ আইস্টাইনীয় পদার্থবিদ্যায় একেবারেই বদলে গেছে— একই শব্দ, একই ঘটনা আর একই বিষয় এরা বোঝায়না। নিউটনীয় আবহে ভর ছিল বস্তুর অপরিবর্তনীয় একটি গুণ, এতে বোঝাতো বস্তুর পরিমাণ; কিন্তু আইনস্টাইনীয় আবহে এটি শক্তিতে পরিণত হতে পারে, শক্তি থেকে সৃষ্টি হতে পারে, গতির ফলে বাড়তে পারে। প্রথম আবহে স্থান ও কাল ছিল একটি পরম ভাবে উপস্থিত কাঠামো, দুটি পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কিন্তু পরের আবহে এগুলো গতির সঙ্গে আপেক্ষিক, উভয়ে একই প্রকার জিনিস। দুই আবহের সামঞ্জস্যহীনতাটি এরকমের।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু সাধারণ স্বীকৃত ধারণাকে কূন এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন করলেন। এর মধ্যে একটি হলো বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতা—

তিনি বল্‌লেন স্বাভাবিক বিজ্ঞানে এটি ধারাবহিক হলেও বিপ্লবের মধ্যে সেই ধারাবাহিকতা আর বজায় থাকে না। বিজ্ঞানে পরের তত্ত্বগুলো আগের তত্ত্বের চেয়ে উন্নত, সত্যের আরো কাছাকাছি এই ধারণাকেও তিনি বাতিল করলেন— কারণ যেহেতু আগেরটির ও পরেরটির তুলনা করার কোন সাধারণ মানদণ্ড নেই, পরেরটি আগেরটির তুলনায় উন্নত একথা কেমন করে বল্‌বো? এই বিষয়ে পরে অন্য অধ্যায়ে আমাদেরকে আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।

বিজ্ঞানকে স্বাভাবিক ও বৈপ্লবিক দুরকমে ভাগের সুবিধা কী:

বিজ্ঞানীরা যে কেন স্বাভাবিক বিজ্ঞানের সময় তাঁদের আবহের মূল তত্ত্বগুলোকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করেন, কূন তার কিছু কারণ দেখিয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে যখন বৈজ্ঞানিক আবহ স্থির থাকে তখন বিজ্ঞানীরা নিশ্চিন্তে সে আবহের তত্ত্বগুলো ব্যবহার করে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করতে পারেন— স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের আশঙ্কায় তাঁদেরকে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়না। একই সঙ্গে সেই তত্ত্বগুলোর প্রকাশ ও কার্যকারিতাকে তাঁরা ক্রমাগত সমৃদ্ধ করতে পারেন। এজন্যই তাঁরা এই তত্ত্বগুলোকে বার বার পরীক্ষা করা এবং সেগুলোকে মিথ্যাকরণের সম্মুখীন করার কাজ মোটেই করেননা, বরং সে রকম হবার সংশয় দেখা দিলে সহায়ক অনুমান ইত্যাদির মাধ্যমে সেই সংশয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন।

কূনের অনুসারীদের কাছে বিজ্ঞান এভাবে এক বিপ্লব থেকে অন্য বিপ্লব পর্যন্ত একটানা স্বাভাবিক সময়ে বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব ও উন্নয়ন সম্ভব হয়। কিন্তু সব বিজ্ঞানীরা যদি এতেই সন্তুষ্ট থাকতেন তা হলে বিজ্ঞানে বড় বড় উল্লম্ফনের পরিবর্তনগুলো সম্ভব হতো না। আর সব সময় এভাবে একটানা থাকা সম্ভবও হয়না, ওই স্থির আবহের মধ্যে বড় সংকটের উদ্ভবের ফলে। অত্যন্ত সৃজনশীল কিছু বিজ্ঞানী তখন বিপ্লবের সূচনা করেন। তার আগেও অবশ্য অনেকে বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করেন।

পপার বিজ্ঞান ও মেকি বিজ্ঞানের পার্থক্য করার জন্য যে নির্ধারকের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন সেটি বেশ সমস্যাসংকুল হচ্ছিলো। মিথ্যাকরণ-যোগ্যতার অভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেকি বিজ্ঞানকে ধরে ফেলা যায়, তবে সব ক্ষেত্রে নয়। কারণ এদের অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা রয়েছে— যেমন জ্যোতিষের কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী ফল্‌লো কি না ফল্‌লো তা বাস্তবে নির্ণয় করা যায়। সেক্ষেত্রে মেকি বিজ্ঞান নির্ণয়ের নির্ধারক হবে সত্যি সত্যি বাস্তব পরীক্ষার নিরিখে এর মিথ্যাকরণ হওয়া। কিন্তু কূন দেখিয়েছেন যে পপারের এই মিথ্যাকরণের নীতি দিয়ে একবার পরীক্ষায় ফেল করলেই যদি কোন বিদ্যাকে আমরা মেকি বিজ্ঞান বলতে চাই তা হলে ঠগ্ বাছতে গ্রামে উজাড় হয়ে যাবার মত ঘটনা ঘটতে পারে। আগেই দেখেছি খুবই প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানেও এরকম

কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী কোন পরীক্ষায় ফেল করতে পারে— বিজ্ঞানীর দোষে, সঠিক পদ্ধতির অভাবে, যন্ত্রের ভুলে, কিংবা যন্ত্রের সংবেদনশীলতার অভাবে— ইত্যাদি বহুতর কারণে এটি ঘটতে পারে। আমরা নেপচুন আবিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনা প্রসঙ্গেও দেখেছি যে কী কী পরিস্থিতিতে যেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গ্রহটি পাওয়া নাও যেতে পারতো। এও দেখেছি যে সে কারণে নিউটনের তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হবার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। এরকম দু'একটি পরীক্ষায় ফেল করলেই একটি ভাল তত্ত্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা মোটেই বিজ্ঞানীর রীতি নয়— যদিও পপার তাই বলার চেষ্টা করেছেন। কূনের ইতিহাস বিশ্লেষণ অনুযায়ী স্বাভাবিক সময়ে বিজ্ঞানী তো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোকে পরীক্ষা করার চেষ্টাই করেননা। তা হলে পপারের নির্ধারক অনুযায়ী মিথ্যাকরণ হওয়া দেখে মেকি বিজ্ঞানকেও বা কীভাবে বাতিল করবো?

স্বাভাবিক বিজ্ঞানের কাজের যে বর্ণনা কূন দিয়েছেন তাতেই অবশ্য বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যায়। কূনের ভাষ্য অনুযায়ী বিজ্ঞানের অগ্রগতির নিয়মটি লক্ষ্য করি। বিজ্ঞানীরা যখন কোন পর্যবেক্ষণে তাঁর তত্ত্বটি সমর্থনে ব্যর্থ হন তখন পর্যবেক্ষণের মধ্যে উন্নয়ন আনার সুযোগ তাঁদের থাকে। সেই উন্নয়ন হতে পারে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিতে , যন্ত্রে, বিঘ্নকারী জিনিসগুলো অপসারণে— ইত্যাদি নানা ভাবে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের এই প্রচেষ্টা সফল হয়, কিছু পরে হলেও এই উন্নত পরিস্থিতির কারণে পর্যবেক্ষণের পরীক্ষায় তাঁদের তত্ত্বটি সফল হতে পারে। কোন কোন সময় এর জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বটি দিয়েছিলেন ১৯১৬ সালে। এর অল্পদিন পরেই এর কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব পরীক্ষায় দারুণভাবে সফল হয়েছে। কিন্তু একটি বড় ভবিষ্যদ্বাণী— মহাকর্ষ তরঙ্গের উপস্থিতি— বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পর্যবেক্ষণ করা যায়নি। বোঝা যাচ্ছিল যে পৃথিবীতে এসে পৌঁছার সময় এটি এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে একে উদ্ঘাটন করতে হলে অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্র প্রয়োজন। এজন্য যুৎসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বহু বছর লেগে গেছে। ক্রমাগত উন্নয়ন করে করে অবশেষে এরকম যন্ত্র পাওয়া গেলো ২০১৬ সালে, আর সে বছরই তত্ত্বটি আবিষ্কারের ঠিক একশ' বছর পর তার এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বাস্তবে ফলে গেলো। বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের এমন উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু মেকি বিজ্ঞানে, যেমন জ্যোতিষবিদ্যায়, ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হবার পর পর্যবেক্ষণের পদ্ধতির উন্নয়ন করে তাকে যে সফল করা যাবে সেই উপায় নেই। মেকি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যেভাবে আসে তার মধ্যে কোন প্রবাহ নেই, কোন উন্নয়ন নেই। কিন্তু আসল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা সব সময় থাকে— স্বাভাবিক বিজ্ঞানের সময়। বিজ্ঞানের সঙ্গে মেকি বিজ্ঞানের পার্থক্য করার জন্য এটি দেখা খুব জরুরী। কাজেই কূনের এই ধারণা ছাড়া পপারের মেকি বিজ্ঞান আলাদা করার নির্ধারক খুব কার্যকর হতো না।

কূনের বৈপ্লবিক বিজ্ঞানের ধারণাও বিজ্ঞানকে দেখার ব্যাপারে একটি নতুন নীতির সন্ধান দিয়েছে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব বদলায় এটি কোন নতুন কথা নয়। কার্ল পপারের ভাষ্যেও মিথ্যাকরণের পরীক্ষায় ফেল হলে আগের আনুমানিক তত্ত্বটি ছাঁটাই হয়ে যায়— নতুন অনুমানে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটির জন্য আগের সেট ব্যাখ্যার বদলে নতুন আর এক সেট ব্যাখ্যা আসে। কিন্তু তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্বের ধারণায় কূন সম্পূর্ণ নতুন ধারণা দিলেন। বিপ্লবে শুধু তত্ত্ব বদলায়না, আরো অনেক কিছু বদলায়— বলতে গেলে ওই বিজ্ঞানের একেবারে খোলনলচে পাল্টে যায়। আবহ পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতিকে বোঝার পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটিই বদলে যায়। স্বাভাবিক বিজ্ঞান ও বৈপ্লবিক বিজ্ঞানের তফাত করে কূন যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা বৈপ্লবিক তত্ত্বগুলোর প্রভাবকে বোঝার ক্ষেত্রে চমৎকার একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

যেমন আবহ, তেমন বিজ্ঞান; তাহলে বিজ্ঞান কি আপেক্ষিক:

বৈপ্লবিক তত্ত্ব সম্পর্কে কূন যা বলেছেন তা অবশ্য বিজ্ঞান-ইতিহাসের সব বৈপ্লবিক ঘটনার প্রতি সুবিচার করেনি। তিনি এরকম তত্ত্বের ফলে আবহ পরিবর্তনের কথা বলেছেন— কিন্তু তাতে স্পষ্ট হয়নি বৈজ্ঞানিক চিন্তায় কতখানি পরিবর্তন ঘটলে তাকে তাঁর অর্থে আবহ-পরিবর্তন বলা যাবে। ফলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক বড় বড় যুগান্তকারী আবিষ্কারকে এই অর্থে বৈপ্লবিক বলা যাবে কি যাবেনা তার কোন নিয়ম-নীতি এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। যেমন গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বংশগতির বাহক হিসেবে ডি এন এ'র কাজ ও গঠন আবিষ্কারের পর থেকে একে নিয়ে গড়ে ওঠা অণু-জীববিজ্ঞান (মলেক্যুলার বায়োলজি) বিজ্ঞানের পুরো অগ্রাধিকারটাকেই পাল্টে দিয়েছে। প্রধানত এর কারণেই একুবিংশ শতাব্দীকে জীববিজ্ঞানের শতাব্দী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু 'বিপ্লব' হবার কূনীয় নীতি প্রয়োগ করে এটিকে কি বৈপ্লবিক তত্ত্ব বলা যাবে? জীববিজ্ঞানের আবহ সম্পূর্ণ বদলে গেছে, একে মাপার মাপকাঠিও বদলে গেছে এমন কথা তো এক্ষেত্রে বলা যাবেনা। জীববিজ্ঞানের যে কাঠামো-তত্ত্ব সেই ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে এটি স্থানচ্যুত তো করেইনি, বরং তাকে আরো অনেক বেশি শক্তিশালী করেছে। কাজেই অণু-জীববিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বগুলো জীববিজ্ঞানের আবহ পরিবর্তন না করেও বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করতে পারছে— যা জীবনের রহস্যের স্বরূপ নিয়ে মানুষের চিন্তার ভঙ্গিটি ঠিকই পাল্টে দিয়েছে। অনেকে একে বলতে চাইলেন বৈপ্লবিক ভাবে নতুন বিজ্ঞান চর্চা।

এরকম বৈপ্লবিক ভাবে নতুন বিজ্ঞান চর্চার অপেক্ষাকৃত পুরানো একটি উদাহরণ দেয়া যাক। গ্যাসের অণুর গতীয় তত্ত্ব (কাইনেটিক থিওরি) আবিষ্কারের পর অসংখ্য অণুর এলোপাতাড়ি গতির মধ্যে একটি শৃঙ্খলা খুঁজে

পাওয়ার চেষ্টায় তাতে সংখ্যাতাত্ত্বিক গণিতের প্রয়োগ করা হয়— এবং তা সংখ্যাতাত্ত্বিক বলবিদ্যা (স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স) নামের একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ বিজ্ঞানে পরিণত হয়। এখানে প্রত্যেকটি অণুর গতিবিধি খাঁটি নিউটনীয় বলবিদ্যাকেই অনুসরণ করে, নিউটনীয় বৈজ্ঞানিক আবহের কোন পরিবর্তন তাতে ঘটেনি। কিন্তু এটি পদার্থবিদ্যায় একটি সম্পূর্ণ নতুন দিক উন্মোচন করেছে যাকে বৈপ্লবিক বল্‌লে মোটেই অত্যুক্তি হয় না। কারণ এখানে প্রত্যেকটি অণুর গতি আলাদা করে দেখা হচ্ছেনা, তার সামগ্রিক গড়টি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এধরণের বৈপ্লবিক ভাবে নতুন বিজ্ঞান চর্চার বিশ্লেষণে কূনের নীতি খুব একটা সহায়ক হয়না।

লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা যে তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণকে পরস্পর স্বাধীন মনে করেছেন তার তীব্র সমালোচনা করতে গিয়েই কূন আসলে বিজ্ঞান-ইতিহাস পর্যালোচনা করেছিলেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে একই আবহে কাজ করার ফলে স্বাভাবিক বিজ্ঞানে এদের স্বাধীন হবার কোন সুযোগ নেই— লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা ভুল বলেছেন। তিনি পপারের মিথ্যাকরণ নীতিকেও ভুল প্রমাণের উদ্যোগ নিয়েছেন স্বাভাবিক সময়ে বিজ্ঞানীরা মিথ্যাকরণ করেননা এটি দেখিয়ে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব ক্রমাগত বাস্তব সত্যের কাছাকাছি যায় তাঁর কথিত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে এই বিশ্বাসের মূলেও তিনি আঘাত হানতে পেরেছিলেন— কারণ দুই ভিন্ন আবহে বিজ্ঞানের ভাল-মন্দ নিয়ে কোন তুলনা অর্থহীন বলেই তিনি মনে করেছেন। এভাবে দেখা যায় যে কূন সমসাময়িক অন্য দার্শনিকদের অনেক তত্ত্বকে অসার প্রমাণেই বেশি কাজ করেছেন, নিজের নীতিকে সেভাবে খুব স্পষ্টভাবে সর্বত্র-প্রযোজ্য করে তুলতে পারেননি। বরং তাঁর ওভাবে অন্যদের কথা অসার প্রমাণ করাটি সাময়িক ভাবে হলেও এ সংক্রান্ত চিন্তায় কিছুটা শূন্যতা সৃষ্টির উপক্রম করেছে।

একই সঙ্গে কূন নিজে বিষয়টাকে গায়ে না মাখলেও তাঁর বক্তব্যগুলো তাঁর কিছু কিছু অনুসারীদেরকে বিজ্ঞানের ওপর এক রকম আপেক্ষিকতা আরোপের সুযোগ করে দিয়েছেন। এ ধরণের আরোপ বিজ্ঞানের পদ্ধতির বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে বেশ কিছু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি এক সময় করেছে। কূনের নীতির মধ্যেই এ সুযোগটি রয়েছে। যেহেতু সেই নীতি অনুযায়ী স্বাভাবিক বিজ্ঞানের সময় বিজ্ঞানীরা নিজেদের মূল তত্ত্বকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন— সে তত্ত্বের ছিদ্রানুসন্ধান করেন না, কাজেই বস্তুনিষ্ঠতার দাবী করলেও মনে হতেই পারে তাঁরা বস্তুনিষ্ঠ নন, সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁদের কোন আগ্রহ নেই। তাঁদের তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত মনগড়া তত্ত্ব। যেটি তাঁরা সুবিধাজনক মনে করেন সেই তত্ত্বকেই আঁকড়ে ধরে থাকেন, সে তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে দেখা না গেলেও। কূনের স্বাভাবিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা কারো কারো হাতে এই

অদ্ভুত উদ্ভট রূপ নিয়েছে। আপেক্ষিকতাটি বিশেষ ভাবে এসেছে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের আগে ও পরে দুই আবহের বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ার কারণে। অন্যরা এর অর্থ করেছেন বিজ্ঞানের কোন বস্তুনিষ্ঠ ধারাবাহিক রূপ নেই— সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের তত্ত্বে গড়া যখন যে আবহ বিরাজ করে বিজ্ঞানকে তখন সেভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়। এক আবহের ব্যাখ্যাগুলোর সঙ্গে অন্য আবহের ব্যাখ্যার কোন রকম মিল নেই। এমনটিই যদি হতো তাহলে বিজ্ঞান কি আদৌ এত সফল হতে পারতো?

কূন নিজে অবশ্য তাঁর স্বাভাবিক বিজ্ঞান ও বৈপ্লবিক বিজ্ঞানের পার্থক্যের এরকম আপেক্ষিক ব্যাখ্যা দেবার বিরোধিতা করেছেন— কেন এই ব্যাখ্যা মোটেই যথাযথ নয় সে সম্পর্কে যুক্তি দিয়েছেন। তারপরও এরকম অপব্যাখ্যার সুযোগ থাকাটিকে অনেকে কূনের বিজ্ঞান-ইতিহাস বিশ্লেষণের দুর্বলতা মনে করেন।

অনেকে মনে করেন তাঁর ধরে নেয়া নীতির উদাহরণ হিসেবে কূন বিজ্ঞান-ইতিহাস থেকে যে সব তত্ত্বকে স্বাভাবিক বিজ্ঞান হিসেবে বাছাই করেছেন, সেই স্বাভাবিক সময়েও বিজ্ঞান এতটা ছাপোষা বা নিস্তরঙ্গ নয়। আর যে সব আবিষ্কারকে তিনি বিপ্লব হিসেবে বেছে নিয়েছেন বিজ্ঞানের সব বিপ্লব সেগুলোর মত এতটা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনকারী নয়। সেগুলোতেও বৈপ্লবিক অনেক নতুন ধারণা এলেও তা আগের সবকিছুকে অবান্তর করে ফেলেছে এমন নয়। প্রায় ক্ষেত্রেই আগের তত্ত্ব পরের তত্ত্বের একটি আসন্ন রূপ হিসেবে দিব্যি কার্যকর থাকে। কূনের ভিন্নমত সত্ত্বেও এখানে বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতাটি যথেষ্ট উপস্থিত।

জটিল প্রকৃতির মডেলিং

বৈজ্ঞানিক মডেল কীভাবে কাজ করে?

মডেল বৈচিত্র:

অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির ভেতর থেকেও নিজেদের বোঝার মত সরল নিয়ম বের করাটি বিজ্ঞানীর সামনে চ্যালেঞ্জ। এর জন্য তাঁকে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব সৃষ্টি করতে হয়। প্রকৃতির যে ঘটনা নিয়ে বিজ্ঞানের কাজ সেই ঘটনা যতই জটিল হোক না কেন শুরুতেই তার একটি সরলীকৃত রূপ হাতের কাছে পেলে কাজগুলো সহজ হয়। ওই রূপটিই হলো বৈজ্ঞানিক মডেল। বিজ্ঞানী যে কত রকমে মডেল গড়েন কত রকমে সে মডেল ব্যবহার করেন তা দেখলে অবাক হতে হয়। সব মডেলই যেহেতু প্রকৃত ঘটনার সরলতর রূপ, তাই তাতে শুধু প্রাসঙ্গিক অংশগুলোকেই আনা হয়, অপ্রাসঙ্গিক জটিলতাগুলোকে বাদ দিয়ে। এদিক থেকে সব মডেলেই একরকম অ্যাবস্ট্রাকশন বা বিমূর্ততা থাকে। সাধারণ আটপৌরে অর্থে আমরা যেমন বড় জিনিসের ছোট করে নেয়া মডেলের কথা বলি (যেমন খেলনা গাড়ি) এটি শুধু তা নয়। চেহারায়, চরিত্রে, এবং আরো নানা দিক থেকে মূল জিনিস আর তার মডেলে আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকতে পারে। শুধু মিল থাকতে হয় একটি জায়গায়— উভয়ের মধ্যে থাকা বিজ্ঞানে, অন্তত বিজ্ঞানী উভয়ের মধ্যে যেই ন্যূনতম বিজ্ঞানটুকু প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন সেইটুকুতে। আসলে মডেল খাড়া করার সময়েই বিজ্ঞানী এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন। তারপর এই মডেলের ওপর কাজ করে আরো বিজ্ঞান আবিষ্কার করেন যা আমাদের জ্ঞানকে প্রকৃতির সেই মূল জিনিসের আরো কাছে নিয়ে যায়।

ঘটনাচক্রে কখনো মূল জিনিসের সঙ্গে মডেলটি একটু বেশি মিলে যায়— এমনকি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেও মডেলের মধ্যে মূল জিনিসের স্বাদ পাই। যেমন বহুদিন ধরেই আমরা পুরো পৃথিবীটিকে ধরা-ছোঁয়ার জিনিস বলে বিবেচনা করতে পারি জাহাজে বা বিমানে ঘুরে যেটি সম্ভব হয়েছে। এখন মহাশূন্য থেকে দেখার সুযোগে একসঙ্গে পুরো আসল পৃথিবীটিকে দেখতে পাচ্ছি। এর একটি বৈজ্ঞানিক মডেল হিসেবে যেই গ্লোবকে বিবেচনা করা যায় তাও ধরা-ছোঁয়া এবং দেখার জিনিস। এমন কি আসল এবং মডেল উভয়ের চেহারাটাও এক রকম— গোলকাকার, উত্তর ও দক্ষিণে একটু চাপা। এসব কিন্তু

ব্যতিক্রম— আধুনিক বিজ্ঞানে এরকম চেহারায়, অবয়বে মিলে যাওয়া মডেলের উদাহরণ বেশি নেই। বিজ্ঞানীরা এমন মডেলই বেশি তৈরি করেন যার মূল জিনিসটি অদৃশ্য হলেও মডেলটি দৃশ্যমান, আবার মূল জিনিসটি দৃশ্যমান হলেও মডেলটি অদৃশ্য। বিজ্ঞানের যে মূল কাজ সেই জটিল প্রকৃতির মধ্যে সরলতর নিয়ম আবিষ্কার করে তাকে বোধগম্য করে তুলতে কোন ভাবে সহায়ক হলেই তা একটি বৈজ্ঞানিক মডেল।

এরকম অমিলের মডেলের দু'একটির উদাহরণ টান্‌লে ব্যাপারটি ভাল বোঝা যাবে। কেমিস্ট্রির জগতে নানা অণুর ওপর গবেষণা চলে তার প্রত্যেকটির মডেল নিয়ে। যেমন কেমিস্ট্রির আণবিক তত্ত্ব থেকে এবং পানির বিশ্লেষণ থেকে বোঝা গেছে যে পানির অণুতে আছে দুটি হাইড্রোজেন এটমের সঙ্গে একটি অক্সিজেন এটম। এসব জিনিস অদৃশ্য হলেও বিজ্ঞানী তার দৃশ্য মডেল তৈরিতে পিছপা হননি। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের এটমের তুলনামূলক সাইজের কথা মনে রেখে উভয়ের জন্য দুই সাইজের বল সাজিয়ে ওকেবারে ধরাছোঁয়ার মডেল। তারপর একে ভিত্তি করে আরো গবেষণায় এটমগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব, কেমিক্যাল বন্ধন, তাদের মধ্যে সঠিক কোণ— ইত্যাদিও এই বল দিয়ে গড়া মডেলে আনা হয়েছে। এ মডেলটি হুবহু পানির অণুর মূর্তি কিনা তা বড় কথা নয়, তার বিজ্ঞানের ভাল প্রতিনিধিত্ব করে এটিই বড় কথা। একেবারে আধুনিক কালে এসে এমনি ধরণের একটি আরো অনেক জটিল মডেল তৈরি কীভাবে জীববিজ্ঞানে যুগান্তকারী আবিষ্কারে সহায়তা করেছে তা দেখা যাক্।

১৯৫৩ সালে ডিএনএ'র গঠন আবিষ্কারের এই বিশাল ঘটনাটি যাঁরা ঘটিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান দু'জন ছিলেন জেম্‌স ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক। তাঁরা দু'জন কাজ করছিলেন বৃটেনে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ল্যাবে। সেখানে ডিএনএ'র গঠন আবিষ্কারের অন্যান্য কাজের মাধ্যমে এ সম্পর্কে তাঁরা যা অনুমান করতে পেরেছিলেন তার ভিত্তিতে ডিএনএ অণুর একটি বেশ বড়সড় মডেল তৈরি করেছিলেন— বিভিন্ন রাসায়নিক অংশের আকৃতি অনুযায়ী কাটা টিনের পাত, তার ইত্যাদি জুড়ে জুড়ে প্রায় নিজেদের সমান লম্বা, খাড়া একটি মডেল। এই মডেলে নানা অংশের মধ্যে দূরত্ব, কোণ, পেঁচ খাওয়া ইত্যাদিতে নানা পরিবর্তন এনে এনে, এবং ডিএনএর প্রকৃত কেমিস্ট্রির গুণাগুণের সঙ্গে— যেমন আণবিক বন্ধন, এটমের সজ্জা, সেগুলোর মাঝখানের স্থানের পরিমাপ ইত্যাদির সঙ্গে— মডেলের একই জিনিসের তুলনা করে করে প্রকৃত গঠনটি তাঁরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। মডেলে যেই গঠনে কেমিস্ট্রি জ্ঞানের সবকিছু খাপে খাপে মিলে গেছে আসল অদৃশ্য ক্ষুদ্র অণুতেও সেই গঠনই সঠিক হবে এটি তাঁরা ধরে নিতে পেরেছিলেন। আসল জিনিসের প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞানের সঙ্গে এই মিলটুকুতেই মডেলের কার্যকারিতা।

গ্লোব আর ডিএনএ মডেল এই উভয়টি খুবই ভিন্ন জিনিসের মডেল হলেও এই দুইয়ের মধ্যে একটি মিল আছে— উভয়ে ধরা-ছোঁয়া-দেখার মত মডেল। তবে গ্লোব যেখানে অনেক বড় জিনিসের খুবই ছোট মডেল, ডিএনএ মডেল সেখানে অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য জিনিসের অনেক বড় মডেল।

আজকাল বিপুল সংখ্যক বৈজ্ঞানিক মডেল কিন্তু ধরাছোঁয়ার মত মডেল নয়, এবং তা ছোট বড় হওয়ার ব্যাপারও নয়— কারণ সেগুলো গাণিতিক মডেল, যার কোন বাস্তব অবয়বই নেই। বরং এতে মূল জিনিসটির প্রাসঙ্গিক বৈজ্ঞানিক অংশটিকে গণিতে রূপ দেয়া হয়। ওই মডেলে গণিতের রাশি, সমীকরণ ইত্যাদি ছাড়া অন্য কিছুই থাকে না, মূল জিনিসটি যতই বড় বা ছোট, দৃশ্য বা অদৃশ্য বাস্তব জিনিস হোক না কেন।

এভাবে বাস্তব প্রকৃতির জিনিসকে গাণিতিক মডেলে রূপান্তর মোটেই নতুন জিনিস নয়, লিপিবদ্ধ বিজ্ঞানের শুরু থেকেই এটি আমরা দেখেছি। উদাহরণ স্বরূপ ব্যাবিলনীয় এবং মিশরীয় জ্যোতির্বিদরা যখন চাঁদ-সূর্য-গ্রহের চলাচলকে এবং তার ফলে সৃষ্ট দিনরাত, সপ্তাহ, মাস, বছর ইত্যাদিকে ক্যালেন্ডারে রূপ দিয়েছিলেন তখন তাঁরা বাস্তব প্রকৃতির একটি গাণিতিক মডেলই সৃষ্টি করেছিলেন। ওতে ওই চলাচলকে কোণের মাপে আর দিনগুলোকে সংখ্যায় রূপ দেয়া হয়েছিলো। আসলে বিজ্ঞানের যেখানেই সম্ভব প্রাকৃতিক ঘটনার গাণিতিক মডেলের মাধ্যমেই তার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়। মূল ঘটনার সব চেয়ে প্রাসঙ্গিক বৈজ্ঞানিক চরিত্রটিকে গণিতের ভাষায়, গণিতের যুক্তিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয় এতে। এর ফলে মূল ঘটনার গুরুত্বহীন জটিলতাকে বাদ দিয়ে গণিতের যথাসম্ভব সুন্দর ও সরল সমীকরণে ওই প্রাসঙ্গিক অংশটুকুকে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। এতে এর ওই বৈজ্ঞানিক চরিত্রটি বোঝা তো সহজ হয়ই, তাছাড়া এর থেকে কী কী ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব তা গণিতের বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসে।

যেমন আমরা যদি তালে তালে চলা নানা কিছুর কাঁপুনির মত গতির দিকে লক্ষ্য করি, বাস্তব ক্ষেত্রে বিস্তারিত ভাবে দেখলে সে গতি খুব সরল নাও হতে পারে। কিন্তু এর মূল গতিকে আমরা গণিতের সরল ছন্দিত গতি (সিম্পল হারমোনিক মোশন) হিসেবে গ্রহণ করতে পারি— যেটি হবে একটি গাণিতিক মডেল, হুবহু আসল গতির মত নয়। গণিতে এনে এই সরলীকরণটুকু করতে পারলে ওই আসল গতিকে বিশ্লেষণ করার এবং তার নানা ফলশ্রুতি জানার রাস্তা আমাদের সামনে খুলে যায়। গণিতে এই সরল ছন্দিত গতিকে দেখানো যায় এমন কিছু সমীকরণে যেখানে এই কম্পনকে শেষ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে সময়ের সঙ্গে ত্রিকোণমিতির অতি পরিচিত সাইন ফাংশানটির মান বাড়াকমার মত করে। তখন ত্রিকোণমিতির নানা নিয়ম প্রয়োগ করে এর সম্পর্কে আরো জানতে পারি। প্রকৃতিতে অনেক জিনিসের কম্পন গতিকে এই সুন্দর গাণিতিক

মডেলটি দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করানো যায়, যদি আমরা সেই গতির শুধু গুরুত্বপূর্ণ প্রধান অংশকে গ্রহণ করতে রাজি থাকি। যেমন একটি স্প্রিংকে টেনে বা চেপে ছেড়ে দিলে সেটি যেভাবে কাঁপতে থাকে, একটি পেন্ডুলাম যেভাবে দুলতে থাকে বিস্তারিততে গিয়ে এদের তালে তালে গতি ভিন্ন রকমের হলেও উভয়েরই মূল গতিকে এই সমীকরণে ধরা যায়। এসব চোখে দেখা জিনিস; কিন্তু সেখানেই থামার প্রয়োজন নেই। এমনি ভাবে আমরা অণুর মধ্যে এটমের কম্পন গতিকেও একই মডেলে নিয়ে আসতে পারি, কারণ তার আচরণকে আমাদের তত্ত্বে যেভাবে অনুমান করি তাতে সেই সুযোগ আমাদের আছে। এই সব বিষয়ে আসল গতি হুবহু এক না হলেও, তা এর থেকে অনেক বেশি জটিল হলেও বিশেষ বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে তার বৈজ্ঞনিক বিশ্লেষণে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই মডেলটি যথেষ্ট। যেমন পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে শর্তটি হলো দোলনের কোণটি যেন খুব বেশি বড় না হয়। এরকম গাণিতিক মডেলে আমরা প্রকৃতির আসল ঘটনাকে (এ ক্ষেত্রে কম্পন গতি) গণিতে পরিণত করছি।

একবার গণিতে পরিণত করতে পারলে এমনকি একবার ধারাবাহিক ভাবে করণীয় একটি প্রোগ্রামে বা সফ্‌টওয়্যারে পরিণত করতে পারলে এযুগে সেটি কম্পিউটারের হাতে ছেড়ে দিতে অসুবিধা কোথায়? এভাবে এসেছে কম্পিউটার মডেলিং। সেটি এখন বিজ্ঞান চর্চার অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। কাজেই মডেলের কথা যদি বলি বিজ্ঞানে তার ব্যাপ্তি ধরাছোঁয়ার গ্লোব বা রাসায়নিক অণুর মডেল থেকে শুরু করে একেবারেই গাণিতিক বা কম্পিউটার প্রোগ্রামরূপী মডেল পর্যন্ত বিস্তৃত। এগুলো সবগুলোর পেছনে উদ্দেশ্য কিন্তু একই।

কোন একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে বিজ্ঞানী যে অনুমান নিয়ে শুরু করেন সাধারণত মডেলটি তারই অংশ হিসেবে খাড়া করা হয়। এর পর অনুমানকে তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিজ্ঞানী যে কাজগুলো করে থাকেন সেগুলো তিনি এই মডেলের ওপরেই করতে পারেন। অনুমানটি মডেলের মাধ্যমে ছিমছাম সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে বলে কাজগুলো করতে সুবিধা হয়। অনুমানের থেকে একটি কাজ হলো যুক্তি বা গণিতের সাহায্যে এর থেকে নানা ফল বের করা অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী করা। মডেলেরও একটি কাজ ভবিষ্যদ্বাণী করা। এই ফল বা ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবতার সঙ্গে মিলে গেলে আনুমানিক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে মডেলটিও সমর্থিত হয়। যে সব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সবই যে একটি মাত্র অনুমান ও একটি মাত্র মডেল থেকে এক লাফে যাচাই হয়ে গেছে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে যাচাইয়ের ব্যর্থতার ফলে অনুমানকে বার বার পরিবর্তন করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে মডেলটিরও বিবর্তন ঘটেছে।

মোটামুটি একই ধারায় থেকেও দীর্ঘদিন ধরে একটি বৈজ্ঞানিক মডেল কী ভাবে বিবর্তিত হতে পারে তার একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ হলো প্রাচীন গ্রীকদের বিশ্ব-ছবি; অর্থাৎ কিনা বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে তাঁদের মডেল। প্লেটো ও তাঁর

শিষ্য বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ইউডোক্সাসের কাজের মাধ্যমে গ্রীকদের পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বের মূল মডেলটি খাড়া হয়ে গিয়েছেলো। এই গাণিতিক মডেলটি ছিল মূলত জ্যামিতিক— গ্রীকদের সময় সব চেয়ে উন্নত গাণিতিক মডেলগুলো জ্যামিতিতেই প্রকাশ পেতো। এ মডেলে বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবীর গোলকটিকে রেখে তার বাইরে একের পর এক স্বচ্ছ কাল্পনিক বস্তু ইথারে গড়া গোলক কল্পনা করা হয়েছিলো। এক একটি গোলকের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল পর পর চাঁদ, সূর্য, গ্রহগুলো। ওসবের পর্যবেক্ষিত গতিবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই গোলকের প্রত্যেকটির বিভিন্ন গতি স্থির করার হয়েছিলো। ওই সামঞ্জস্যটি সূক্ষ্মভাবে পাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কের জন্য একাধিক ওরকম স্বচ্ছ গোলকের কল্পনা করতে হয়েছে— প্রত্যেকটির গতি পুরো ঘূর্ণনে সব সময় একই দিকে একই বেগে, যা প্লেটোর আইডিয়ালিজম দর্শনে অপরিহার্য। পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য ক্রমে উন্নত হওয়ায় এর সঙ্গে মেলাতে গিয়ে এই গোলকগুলোর সংখ্যা ক্রমে আরো বেড়েছে। শেষ পর্যন্ত এই মডেল প্রথম দেয়ার প্রায় ৫০০ বছর পর টলেমির হাতে গিয়ে এটি একটি চূড়ান্ত রূপ পায় জ্যামিতিক ভাবে আরো বেশি জটিল মডেলে। সেটি প্রয়োজন হয়েছে প্লেটোর আইডিয়াল ধারণা ঠিক রেখেই পর্যবেক্ষণে দেখা নানা রকম ব্যতিক্রমগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য। মডেলটি জটিল ছিল বটে, কিন্তু সব রকম পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এই মডেলের ফলাফলগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে মিলে যাচ্ছিলো। এ কারণেই আরো দেড় হাজার বছর এটি এক নাগাড়ে প্রতিষ্ঠিত ও ব্যবহৃত ছিল। জ্যোতিষ্কসমূহের কিছু গতিবিধি এত ধীরে পরিবর্তিত হয় যে অল্প কিছু বছরের মধ্যে টের পাওয়ার মত কোন পরিবর্তন ঘটেনা— এগুলো বোঝা যায় শত বর্ষের ব্যবধানে। এরকম অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনকেও টলেমির মডেল দিয়ে হিসেব করে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু এমন নিখুঁত মডেলও শেষ পর্যন্ত টেকেনি। ১৫৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী বইয়ে কোপারনিকাস এই মডেল সম্পূর্ণ বদলে ফেলে সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের মডেলের প্রস্তাব করেছিলেন। এই নতুন মডেলটি প্রকৃতির অনুকরণ আরো ভাল ভাবে দিতে পেরেছে বলে আগের এতদিনকার সফল মডেলটি বদলে ফেল্‌তে বিজ্ঞানীদের বাধেনি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি সব সময় হয়ে এসেছে।

যে কোন মডেলের থেকে পাওয়া সব ফলাফল যখন জানা তথ্যগুলোর সঙ্গে মিলে যায় তখন মডেলটির ওপর আস্থা বাড়তে থাকে। সবাই তখন মডেলটিকে অজানা তথ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করার উপযুক্ত মনে করে। টলেমির গাণিতিক মডেলে যেভাবে এটি হতে দেখেছি তেমনি আজকের সব গাণিতিক মডেলও অজানা তথ্য জানতে ব্যবহৃত হয়। সে মডেল একটি নিয়ম বা ফরমুলার আকারে যেমন আসতে পারে, তেমনি আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়ার মত কাজে ব্যবহৃত বহু গাণিতিক সমীকরণে গড়া একটি কম্পিউটার মডেল

হিসেবেও আসতে পারে। ধরাছোঁয়া যায় এমন মডেলও খাড়া হয় আনুমানিক তত্ত্ব থেকেই। ডিএনএ'র গঠন আবিষ্কারে ব্যবহৃত মডেলটির উদাহরণ যদি আবার নিই দেখবো তার আইডিয়াটি এসেছিলো ওয়াটসন যখন আর একজন বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস রোজালিন্ডের তোলা ডিএনএ'র এক্সরে ডিফ্র্যাকশন ছবি দেখতে পেয়েছেন সেটির ভিত্তিতে।

ওই এক্সরে ডিফ্র্যাকশন ছবি এমন ধারণা দিয়েছিলো যে ডিএনএ দীর্ঘ সর্পিল (হেলিক্স) আকৃতির অণু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওয়াটসন ও ক্রিক অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে ধরে নিয়েছেন যে এর দুটি দীর্ঘ শেকল-সদৃশ অংশ সর্পিল আকৃতিতে পরস্পরের চারিদিকে পেঁচিয়ে রয়েছে। অন্য কেউ কেউ তিনটি পেঁচানো শিকলের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু ওয়াটসন ও ক্রিক তা মনে করেননি। এর থেকে কীভাবে তাঁরা ডিএনএ'র চাক্ষুষ মডেল গড়ে তুলেছিলেন তা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি।

ওপরের উদাহরণগুলো থেকে মনে হতে পারে মডেল শুধু খুবই সুনির্দিষ্ট ভৌত অর্থাৎ যান্ত্রিক ঘটনার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই ফলপ্রসু যেমন স্প্রিং, চাঁদ-সূর্য, অণুর গঠন ইত্যাদি। ব্যাপারটি মোটেই সেরকম নয়। মোটেই এরকম যন্ত্রিক কিছু নয় এমন অসংখ্য বিভিন্ন বিষয়ের, যা, বৈজ্ঞানিক মডেল গড়া হয়— বিশেষ করে গাণিতিক মডেল। যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক নানা বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানে এরকম মডেলের বিকল্প নেই। ধরা যাক সমস্যাটি হলো একটি হ্রদে নিয়মিত কী পরিমাণ মাছ ধরলে ওখানে মাছের সংখ্যা সব চেয়ে টেকসই হবে সেটি নির্ণয় করা। এর জন্য একটি গাণিতিক মডেল তৈরি করা যায়। এতে মাছের বংশ বৃদ্ধির হার, হ্রদের পানিতে জীবের প্রাথমিক খাদ্য তৈরি হবার হার (যা ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আকারে জন্মে), হ্রদের বিভিন্ন জলজ প্রাণীর পরস্পর-নির্ভর খাদ্য চেইন ইত্যাদি নানা জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়ে, এবং এগুলো আবার যে সব উপাদানের ওপর নির্ভর করে সেগুলোর সঙ্গেও সম্পর্ক দেখিয়ে নানা গাণিতিক সমীকরণগুলো প্রয়োজন হবে। জীববিজ্ঞান, বায়োকেমিস্ট্রি ইত্যাদি নানা বিজ্ঞানের ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত সর্বশেষ নানা তত্ত্বের থেকেই এই সমীকরণগুলো আসবে। এসব সমীকরণ যদি এক্ষেত্রে সঠিক হয় এবং মডেলে সেগুলোকে সঠিক ভাবে সন্নিবেশিত করা হয় তা হলে মডেলটির ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সঠিক হবে বলে আশা করা যায়। টেকসই হবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী হলো মাছ ধরার এক একটি হার পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে মাছের বংশবৃদ্ধিকে কী ভাবে প্রভাবিত করবে তা। মডেলটি সঠিক কিনা বোঝা যাবে একটি বিশেষ হারে সত্যি সত্যি মাছ ধরার আগে ও এর নির্দিষ্ট সময় পর হ্রদে মাছের সংখ্যা নির্ণয় করে। হ্রদের বিভিন্ন অংশ থেকে ইতস্তত নমুনা সংগ্রহের জন্য জাল ফেলে তাতে উঠে আসা মাছের সংখ্যা গুণে সংখ্যাতাত্ত্বিক নিয়মে পুরো হ্রদের মাছের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। এই সংখ্যা যদি মডেলের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মিলে যায় তা হলে এর

সঠিকতার ওপর আস্থা সৃষ্টি হবে। এভাবে প্রমাণিত মডেলে সামনের সম্ভাব্য বিভিন্ন পরিস্থিতির ইনপুটগুলো ঢুকিয়ে তার থেকে এখন হিসেব করে বের করা সম্ভব কী হারে মাছ ধরলে হ্রদে মাছের সংখ্যায় একটি স্থিতি থাকবে, তাতে কোন ধস নামবেনা। এখন এই মডেলের ওপর ভিত্তি করেই হ্রদটিতে মাছ শিকারের টেকসই পরিকল্পনা নেয়া সম্ভব হবে।

এইদিক থেকে মডেলকে বলা যায় বাস্তবের একটি বিকল্প। টেকসই মাছ ধরার ওই মডেলটি যদি না থাকতো তা হলে আমাদেরকে বহু বছর ধরে নানা হারে মাছ ধরে ধরে ঠেকে ঠেকে শিখতে হতো ঠিক কোন্ হারে মাছ ধরলে মাছের বসতি টেকসই থাকবে— সেটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও দুরূহ ব্যাপার হতো। বিজ্ঞানের এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যার সমাধান কোন বাস্তব এক্সপেরিমেন্টে সম্ভব নয়, যদি কিছু করতে হয় তবে তা মডেলের ওপরেই করতে হবে। ধরা যাক একটি তারার অভ্যন্তরে কী ঘটে— সেই তারার যখন বয়স কম তখন, এবং শেষ পর্যন্ত যখন সকল শক্তি ফুরিয়ে মৃত তারায় পরিণত হয় তখন— এসব জানাই আমাদের সমস্যা। সত্যি জ্যোতির্বিদ এবং বিশ্ব-তত্ত্ববিদদের সামনে এসব উদ্ঘাটনের চ্যালেঞ্জ ছিল, অথচ তারার জন্ম-বিকাশ-মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে সত্যি সত্যি এক্সপেরিমেন্ট করার বা সরাসরি এসব পর্যবেক্ষণের সুযোগ নেই। এখন তারার গঠন, উত্তাপ সৃষ্টি, ইত্যাদি সম্পর্কে যে সব প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব রয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্য গাণিতিক ও কম্পিউটার মডেল গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। সেই মডেলের প্রক্রিয়ার বিকাশ থেকে আসল তারায় ঘটা প্রক্রিয়াগুলোর উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে। এমনি ভাবে মডেলের সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা উদ্ঘাটন করতে পারছেন অনেক দুর্দান্ত অগম্য ঘটনার রহস্য— সেটি বিগ ব্যাং এর মুহূর্তে মহাবিশ্বের জন্মের পরবর্তী ঘটনাগুলোই হোক, কিংবা কোথাও এক সপ্তাহ পরের আবহাওয়ার পূর্বাভাষই হোক, কিংবা কীভাবে জ্বালানী পুড়লে পঞ্চাশ বছর পর বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন কোন্ পর্যায়ে পৌছবে সে রহস্যই হোক।

একটি মডেলের ইতিহাস:

বৈজ্ঞানিক মডেলের সব চেয়ে পরিচিত উদাহরণগুলোর একটি হলে ম্যাপ ও গ্লোব। ম্যাপ একটি নির্দিষ্ট জায়গার হতে পারে, তবে গ্লোব হলো পুরো পৃথিবীর মডেল। মজার ব্যাপার হলো ধরাছোঁয়ার মত যে সব মডেল তার মধ্যে ম্যাপ ও গ্লোবের ইতিহাস বেশ প্রাচীন, আর এখনো এই মডেলের বিকাশ থেমে নেই। বল্তে গেলে মডেল মাত্রই এক ধরণের ম্যাপিং— তাকে বাস্তবতার একটি ম্যাপ বল্লে ভুল কিছু বলা হয়না। নিজের আশপাশের জায়গার একটি প্রতিনিধিত্বমূলক ছবি এঁকে মানুষ এই বিশেষ ক্ষেত্রে ম্যাপিঙের সূচনা করেছিলো একেবারে প্রাচীন কালেই— নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

তবে আমাদের পরিচিত বড় জায়গার সব চেয়ে পুরানো ম্যাপ যা পাওয়া গেছে তা লিপি উদ্ভাবনের পরের ঘটনা। তাতে রয়েছে প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের একাংশের একটি ম্যাপ— দেখে বোঝাই যায় যে এটি অনেকটা আন্দাজের ওপর নির্ভর করে আঁকা হয়েছে। হয়তো লোকমুখে শুনে বা পর্যটকদের বিবরণ থেকে আশপাশের বিস্তীর্ণ জায়গা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া গিয়েছিলো তারই প্রতিফলন এটি। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের এই ম্যাপ খুব সম্ভব ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানীদের আঁকা। সেটি মনে করার কারণ হলো এর ঠিক মাঝখানে রয়েছে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে দেখানো ব্যাবিলন এবং এবং তার চারিদিকে আসিরীয়া (উভয়ে বর্তমান ইরাকে)। এর পরেই কিন্তু দেখানো হয়েছে আরারাট (আর্মেনিয়ার প্রাচীন নাম) এবং আরো কিছু ভূখণ্ড। এর কাছাকাছি সময়ের কিছু গ্রীক ম্যাপ আবিষ্কৃত হয়েছে যার পরিধি আরো অনেক বড়। পুরো ম্যাপটা বৃত্তাকার ভূখণ্ড, যার চারিদিকে সমুদ্র। ভূখণ্ডটি তিনটি ভাগে বিভক্ত যারা একে অপর থেকে সরু জলভাগ দিয়ে বিভক্ত। এর একটির নাম রয়েছে ইউরোপ, একটি এশিয়া, অন্যটি লিবিয়া (আফ্রিকা)। বোঝা যাচ্ছে দুহাজার বছরেরও আগের গ্রীকদের কাছে এই তিনটি মহাদেশ সম্পর্কে এক রকম আবছা ধারণা ছিল, যেগুলো নিজেদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তিন পাশে খানিকটা জলভাগ দিয়ে আলাদা রয়েছে। এত বড় বড় ভূখণ্ডকে গ্রীকরা যে নিজেদের চিন্তার মধ্যে আনতে পেরেছিলেন তার কারণ সম্ভবত দূরদূরান্ত ঘুরে আসা পর্যটকদের বর্ণনা এবং নিজেদের জ্ঞানচর্চার খাতিরে মিশর, ব্যাবিলন ইত্যাদি নানা জায়গার দার্শনিক বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ। নিজেদের এসব ধারণাগুলোকে তাঁরা ম্যাপের মডেলে রূপ দিয়েছিলেন।

এ সময় পর্যন্ত এরকম ম্যাপ শুধু সমতলে কাগজ ইত্যাদির ওপরেই আঁকা হয়েছে, গ্লোবের ওপর নয়। এর কারণ তখন পর্যন্ত পৃথিবীকে চেপ্টা মনে করাই সাধারণ জ্ঞান ছিল, গোলাকার পৃথিবীর ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর কয়েকশ' বছরের মধ্যেই গ্রীকরা যে শুধু গোলকাকার পৃথিবীর ধারণা আবিষ্কার করেছেন তা নয়, এমনকি তাঁদের অনবদ্য জ্যামিতি ব্যবহার করে এই গোলকের পরিধিও প্রায় নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেছিলেন। সেই থেকে গ্রীক বিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে গ্লোবের মডেলে দেখে এসেছেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম সত্যিকার গ্লোবের কথাও জানা গেছে এই গ্রীসেই খৃষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দে লেখা একটি বর্ণনায়: "আমরা ছোট একটি গোলকের ওপর পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করলাম। এই বসবাসের অঞ্চলগুলোকে একটি চতুর্ভূজের মধ্যে স্থাপন করে তার ভেতর সেগুলোকে এঁকে দিলাম।"

পরবর্তী কালের আর একটি গ্লোবের উল্লেখ খুব কৌতূহলোদ্দীপক। আরব ভূগোলবিদ আলবেরুণীর ১০১২ খৃষ্টাব্দের লেখায় তাঁর একটি গ্লোবের কথা জানা যায় যেখানে তিনি এশিয়া, ইউরোপ আর আফ্রিকাকে দেখিয়েছেন যার

স্থান পুরো গ্লোবের দুই পঞ্চমাংশ। বাকি অংশটি তিনি দেখিয়েছেন জলভাগ ও অজানা একটি মহাদেশ হিসেবে (যা সে সময় লোকগাঁথায় কল্পনা করা হতো)। তবে সবচেয়ে প্রাচীন সত্যিকার একটি গ্লোব আমাদের হাতে যেটি এসেছে সেটি ১৪৯২ সালের— জার্মানীর মার্টিন রেহাইমের তৈরি। এর একটি নামও দেয়া হয়েছে— *এরডাপফেল*, যার মানে পৃথিবী-আপেল। কাঠের গোলকাকৃতি কাঠামোর ওপর স্তরের পর স্তর লিনেন কাপড় সেঁটে ওটি তৈরি হয়েছিলো যার ওপরে আঁকা ছিল সে সময় জানা পৃথিবীর ম্যাপ। এরপর যতই নানা অভিযাত্রার মাধ্যমে পৃথিবীর নতুন নতুন এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান বেড়েছে ততই গ্লোবের আর ম্যাপের ক্রমে সম্পূর্ণতা ঘটেছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর ভূপ্রকৃতির নানা তথ্যও তাতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, যা অন্য বৈজ্ঞানিক মডেলের মতই ভূ-বিজ্ঞান নিয়েও নানা তত্ত্ব গড়ে তোলার কাজে সহায়ক হয়েছে।

গ্লোব আর ম্যাপ এই দুইকে কিছুটা ভিন্ন ভাবে মডেল হিসেবে কাজে লেগেছে। পুরো পৃথিবীকে, তার গোলকাকৃতিকে, এবং ভূগোলকের অক্ষের সঠিক কোণ করে থাকা এবং তার ঘূর্ণন ইত্যাদিকে যখন গুরুত্ব দিতে হয়েছে তখন গ্লোবের প্রয়োজন হয়েছে। তাছাড়া সত্যিকার পৃথিবীর মহাদেশগুলো এবং তাতে ভূ-গঠন ইত্যাদির সঠিক চিত্র আসলেই ভূ-গোলকের পৃষ্ঠদেশেই রয়েছে বলে গ্লোবের ওপরেই সেগুলোকে সব দিক থেকে সঠিক অনুপাতে স্থাপন করা যায়। অথচ বিস্তারিত ভাবে সেগুলোকে দেখতে গেলে ব্যবহারযোগ্য ছোট গ্লোবে সীমাবদ্ধ থাকলে চলেনা— তাকে সমতল কাগজ ইত্যাদির ওপর ম্যাপের আকারেই আঁকতে হয়। গোলকের পৃষ্ঠের জিনিসকে সমতলে বিছানো অবস্থায় আনতে গিয়ে তার মধ্যে সুসঙ্গতির অভাব দেখা দিয়েছে। সমস্যাটি সহজে বোঝা যায় একটি কমলা লেবুর ছাড়ানো ছিলকাকে সমতলের ওপর বিছানোর চেষ্টা করলে। ম্যাপের ক্ষেত্রে এটি করতে গিয়ে এক ধরণের প্রজেকশন্ বা প্রক্ষেপনের সাহায্য নিতে হয়েছে— যেটি প্রথম চেষ্টা করেছিলেন ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ভূগোলবিদ মার্কেটর। পরবর্তী কালে এর আরো উন্নত সংস্করণ তৈরি হলেও সব ক্ষেত্রেই এটি করতে গিয়ে মহাদেশ ইত্যাদির সত্যিকার আকৃতিটি কিছুটা হলেও বিকৃত করে দেখাতে হয়েছে। ফলে ম্যাপে পৃথিবীর দুই বিন্দুর মধ্যেকার ন্যূনতম দূরত্বটি আসলের ঠিক সমানুপাতিক ভাবে আসেনা— যা গ্লোবে আসে। আজকাল প্রায়ই ১৮/১৯ ঘন্টার একটানা বিমান যাত্রায় পৃথিবীর এক শহর থেকে অনেক দূরবর্তী আরেক শহরে সরাসরি চলে যাওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। এই যাত্রায় বিমানের অনুসৃত পথটি দেখতে হলে গ্লোবের ওপরেই তা দেখতে হবে— কারণ বিমান যে সরলতম পথটি ব্যবহার করে তা সমতল ম্যাপে সরলতম মনে হবে না।

এই বিকৃতি মেনে নিয়েও কাজ করতে গিয়ে ম্যাপের অনেক সুবিধা— ইচ্ছেমত বড় করে এতে খুঁটিনাটি দেখানো যায়, একে ভাঁজ করে রাখা যায়,

যত ইচ্ছে বিস্তারিত করে কম্পিউটারে রাখা যায়। আজকাল জিআইএস (জিওগ্র্যাফিক্যল ইনফর্মেশন সিস্টেম) নামের ম্যাপে একই জায়গায় নানা রকম তথ্য ডিজিট্যাল তথ্য রূপে পরস্পরের ওপর উপরারোপিত করে কম্পিউটারে রাখা যায়- যা কার্যত একই জায়গার নানা ম্যাপের উপরিপাতন। যেমন এতে জনসংখ্যা, উদ্ভিদবৈচিত্র, প্রাণীবৈচিত্র, শিলাবৈচিত্র, বিভিন্ন সম্পদের বন্টন ইত্যাদি অনেক কিছুর ম্যাপ উপরিপাতিত করে রাখা যায়। এটি যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি বৈজ্ঞানিক মডেল তা বলাই বাহুল্য।

এভাবে গ্লোবের বিভিন্ন বিশেষায়িত রূপ যুগে যুগে ভূ-বিজ্ঞানে অনেক সুরাহা করে দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের একেবারে শুরুতেই ১৬০০ খৃষ্টাব্দের দিকে ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম গিলবার্ট এরকম একটি অনবদ্য মডেল সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর আবিষ্কৃত ভূ-চুম্বকত্ব তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এজন্য তিনি ছোট একটি গ্লোব তৈরি করেছিলেন প্রাকৃতিক চুম্বক-পাথর (লোডস্টেন) দিয়ে। এই চুম্বক-পাথর নিজেও একটি চুম্বক— গোলকাকার আকৃতি দেয়াতে এই গোলকের দুই মেরু একটি চুম্বকের উত্তর মেরু ও অন্যটি দক্ষিণ মেরু হয়। একটি গ্লোব হিসেবে এই মডেলটির একটি নামও গিলবার্ট দিয়েছিলেন— 'টেরেল্লা' যার মানে ছোট্ট পৃথিবী। চুম্বক-পাথর দিয়ে চুম্বক গুণ সম্পন্ন এই গ্লোবটি তৈরি করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিলো পৃথিবী যে নিজেই যে একটি প্রকাণ্ড চুম্বক তাঁর সেই আনুমানিক তত্ত্বকে হাতেকলমে প্রমাণ করা। চুম্বক-পাথরে তৈরি ওই গ্লোবটির গা ঘেঁষে তিনি এর পিঠের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেছেন একটি ছোট্ট কম্পাস। ওভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে কম্পাসটি সব সময় গ্লোবের নিজের উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বরাবর থাকে— পৃথিবীর পিঠে কম্পাসের যা হয়। তাছাড়া এ সময়ের কিছু আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিলো যে পৃথিবীর নানা জায়গায় একটি কম্পাসকে খাড়াভাবে রাখলে কম্পাস শলাকাটি কিন্তু খাড়া থাকে না, লম্বের সঙ্গে একটি কোণ করে থাকে যাকে বলা হয় ডিপ কোণ। মেরুর নৈকট্য অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে এই কোণ পরিবর্তিত হয়। গিলবার্ট দেখালেন তাঁর টেরেল্লাতেও ঠিক তাই ঘটে। এভাবেই গিলবার্ট বিশেষ ধরণের গ্লোবকে মডেল হিসেবে গড়ে তুলে ভূ-চুম্বকত্বের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন— এরকম মডেলের ক্ষেত্রে তিনি একজন পথিকৃতের কাজ করেছিলেন।

টেরেল্লার কাহিনী কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। গিলবার্টের ৩০০ বছর পর ১৮৯৫ সালে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান বিরকেল্যান্ড টেরেল্লা নামের আরেকটি গ্লোব তৈরি করেছিলেন— অনেকটা একই ভাবে চুম্বক-পাথর দিয়েই। এবার পৃথিবীর এই চৌম্বক মডেলটির উদ্দেশ্য ছিল মেরু অঞ্চলের আকাশ জুড়ে আরোরা বা মেরুজ্যোতি নামের যে আলোকছটা ঝিলিক দিয়ে যায় তার ওপর তত্ত্ব খাড়া করা। এজন্য বিরকেল্যান্ড টেরেল্লাকে বায়ুশূন্য কাচপাত্রের

মধ্যে রেখে তার ওপর ক্যাথোড রে' ফেল্‌লেন। ক্যাথোড রে' হলো বায়ুশূন্য স্থানের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ। দেখা গেলো এর ফলে টেরেল্লার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর চারধার জুড়ে আরোরার মত জ্যোতির ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। অনুমান করা হয়েছিলো মহাশূন্য থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মির চার্জযুক্ত কণাগুলো পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ চৌম্বক মেরুর কাছে আরোরা সৃষ্টি করে তাদের সঙ্গে ভূ-চুম্বকক্ষেত্রের বিক্রিয়ার ফলে। কণাগুলো এর ফলে এখানে কেন্দ্রীভূত হয় এবং বাতাসে গ্যাসের এটমের সঙ্গে সংঘর্ষে ওই জ্যোতির কারণ ঘটে। এই নতুন টেরেল্লার মডেলে প্রায় হুবহু একই রকম ঘটনা দেখতে পেয়ে আরোরার তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছে।

মডেলই যখন বিজ্ঞানের ছবি:

গ্লোবকে যখন আমরা দেখি তখন তাকে পৃথিবীর একটি সুদূর অনুকরণ হিসেবে চিনি, আমাদের কল্পনায় তখনো পাহাড়-পর্বত-সাগর-নদীতে গড়া আসল পৃথিবীটিই থাকে, কারণ সেটিও আমরা কম-বেশি দেখেছি; অন্য যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছেও শুনেছি। কিন্তু বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে সেই সুযোগ আমাদের কারোই থাকে না, বিজ্ঞানীরও না। কাজেই বিজ্ঞান তার যেই মডেলকে প্রতিষ্ঠিত করে সেই ছবিটিই আমাদের কাছে ওই 'আসল' জিনিস। ওটি নিয়ে যখন আমরা কথা বলি, ওর থেকে যখন আমরা নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খাড়া করি, নানা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত টানি, তখন কিন্তু এর সেই একমাত্র ছবিই আমরা ব্যবহার করি— সেটি হলো তার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক মডেলটি। আগেই দেখেছি এই মডেল সব সময় এক রকম নাও হতে পারে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মডেলের বিকাশ ঘটে, কখনো আগের মডেল সম্পূর্ণ বাতিলও হতে পারে। সেক্ষেত্রে তখন আমাদেরকেও মাথায় জিনিসটির নতুন ছবি নিয়ে কাজ করতে হয়। কাজেই বিজ্ঞান আমাদের কাছে যাকে তুলে ধরে সেটিকে আমরা সাময়িক ভাবেই শুধু আসল বলে মনে করতে অভ্যস্ত হয়েছি। এর একটি চমৎকার উদাহরণ হলো এটমের মডেল। এই উদাহরণ থেকে আমরা ব্যাপারটি ভাল বুঝতে পারবো।

এটমের প্রথম ধারণা এসেছিলো আড়াই হাজার বছর আগের গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের কাছ থেকে। এটি ছিল সম্পূর্ণ রূপে কল্পনা প্রসূত— কোন জিনিসকে ক্রমাগত কাটতে থাকলে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে হতে শেষ পর্যন্ত তার একটি অবিভাজ্য রূপ পাওয়া যাবে, যে জন্য সেটিকে বলা হয়েছে 'এটম' বা কাটার অযোগ্য। ডেমোক্রিটাস বা তাঁর সহযোগী এটমিস্ট দার্শনিকদের কাছে এটমের আদৌ কোন মানসিক ছবি ছিল কিনা আমরা জানিনা— এক এক জিনিসের এটম এক এক আকৃতির হবে এমনি একটি আবছা ধারণা ছাড়া। তবে শিগগির নানা জিনিসের গুণের বর্ণনা এটমের

পরিপ্রেক্ষিতে দেয়ার চেষ্টায় তাঁরা এটমেরও এক এক রকম অবয়ব কল্পনা করেছেন। যেমন লোহা অনেক তাপ দিলেও সহজে গলেনা লক্ষ্য করে তাঁরা বলেছেন লোহা খুব কঠিন ও নিরেট বস্তু বলে এমন হয়। আর লোহার এটমের সঙ্গে এক ধরণের হুকের মত আংটা লাগোনো আছে এমন কল্পনা করে তাঁরা বললেন এই হুকগুলোর সাহায্যে এর এক এটম অন্য এটমকে শক্ত করে ধরে রাখে বলেই লোহা এমন নিরেট। আর পানির মত তরল সহজে গড়াতে পারে দেখে তাঁরা কল্পনা করেছেন তরলের এটম মসৃণ এবং পিচ্ছিল, তাই সহজে একে অপরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। তবে এসব নিয়ে সত্যিকার বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরির চেষ্টা তাঁরা করেননি, বরং এটমের অবিভাজ্যতা, অবিনাশিতা ইত্যাদি নিয়ে যুক্তিতর্ক দিতেই ব্যস্ত ছিলেন। আবার তাঁদের অনেকে যাঁরা প্লেটোর আইডিয়ালিজমে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা একই সঙ্গে এটমের নানা সন্নিবেশে গড়া নানা বস্তুর অস্থায়ীত্ব, অসারতা ইত্যাদির পক্ষেও যুক্তি দিতেন।

এটমের ধারণাটি সত্যিকার অর্থে আবার বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব পেয়েছে একেবারে আধুনিক কেমিস্ট্রিতে এসে; ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ড্যালটন (১৮০৩ খৃষ্টাব্দ) তখন একে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের (মৌল) অবিভাজ্য উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কেমিস্ট্রির নানা তত্ত্বের ব্যাখ্যা ড্যালটন এই এটমের পরিপ্রেক্ষিতেই দিতে পেরেছেন। আর এজন্য এটমের মডেল হিসেবে শুধু একটি ক্ষুদ্র গোলক কল্পনা করেই কাজ চলেছে, এর কোন অবয়বের প্রশ্ন ওঠেনি। তাই ওই সময় যাঁরাই এটমের কথা ভেবেছেন তাঁদের কাছে এটি অবয়বহীন ছোট্ট গোলক ছাড়া আর কিছু ছিলনা— ওটিই ছিল তখন এটমের ছবি। এটমের এই মডেলের বাইরে তার আর কোন ছবি ছিলনা। এটম বলতে সবাই একরকম ক্ষুদ্র মার্বেলের মত কিছু বোঝাত।

এটমের একটি বিস্তারিত অবয়বের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো ১৮০০ শতকের একেবারে শেষের দিকে এসে। কিছু নতুন আবিষ্কারের ফলে তখন বোঝা যাচ্ছিলো যে এটম নিজেই ক্ষুদ্রতম ও একে ভাগ করে ক্ষুদ্রতর আর কিছু পাওয়া যাবেনা— এ কথাটি ভুল। ব্যাপারটি বোঝা গেলো ক্যাথোড রে' নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট থেকে। বায়ুশূন্য করা কাচ নলের দুই প্রান্তে যদি একটি বিদ্যুৎ-বর্তনীর দুটি ছিন্ন প্রান্ত (ইলেকট্রোড) রাখা হয় এবং এই দুই ইলেকট্রোডের মধ্যে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তখন দেখা যায় যে ধনাত্মক ইলেকট্রোডটির পেছন থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা করা হচ্ছিলো এভাবে— ভোল্টেজের ফলে ঋণাত্মক ইলেকট্রোড (ক্যাথোড) থেকে এক রকম ঋণাত্মক চার্জের কণা নির্গত হয়ে এবং ধনাত্মক ইলেকট্রোড দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তার দিকে শূন্যের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই কণা অল্প পরিমাণে থাকা বাতাসে এটমের সঙ্গে সংঘর্ষ করে ওই আলোর জন্ম দিচ্ছে। এ জন্যই এই প্রবাহের নাম দেয়া হয়েছে ক্যাথোড রে বা ক্যাথোড রশ্মি।

১৮৯৬ সালে ইংল্যান্ডে জে জে থমসন এর ওপর কাজ করছিলেন। থমসন দেখলেন ওই কেথোড রে'র কণার বৈদ্যুতিক চার্জের কারণে এই রশ্মিকে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে এদিক ওদিক বাঁকানো যায়। এভাবে বাঁকানোর পরিমাণ থেকে তিনি এর চার্জ ও ভর নির্ণয় করলেন এবং দেখালেন যে এই কণার চার্জ সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বৈদ্যুতিক চার্জ; আর এর ভরও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। একে নাম দেয়া হলো ইলেকট্রন। আরো দেখা গেল ওই যে বর্তনীর ঋণাত্মক ইলেকট্রোড কেথোড, তা যেই ধাতু দিয়েই তৈরি হোক না কেন তাতে একই গুণ সম্পন্ন একই ইলেকট্রন পাওয়া যাচ্ছে। এর মানে ক্যাথোডের যে বস্তু রয়েছে তার এটম থেকে ইলেকট্রন তো নির্গত হচ্ছেই, সব রকম বস্তুর এটমেই এই একই ইলেকট্রন রয়েছে। এরপর থেকে এটমকে আর নিরেট মার্বেলের মত অবয়বহীন অবিভাজ্য জিনিস হিসেবে কল্পনা করা গেলোনা, কারণ ওর ভেতরেই অন্তত ইলেকট্রন নামের এই ক্ষুদ্রতর অংশ রয়েছে। কিন্তু এটম শুধু ইলেকট্রনে গড়া এটা বলা যায়না, কারণ ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ আছে, অথচ এটম নিজের কোন চার্জ নেই। বোঝা যাচ্ছে যে এটমের একটি ধনাত্মক চার্জযুক্ত অংশও আছে— উভয়ের মধ্যে কাটাকুটি হয়ে এটম নিজে নিরপেক্ষ হয়েছে। অন্যান্য নানা সাক্ষ্য থেকে থমসন ধরে নিলেন এটমের ওই ধনাত্মক চার্জ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ও সমভাবে পুরো এটমে ছড়ানো আছে, আর ইলেকট্রনগুলো তার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

থমসনের অনুমানে আমরা তাই এটমের একটি অভাবনীয় মডেল পেয়ে গেলাম— যা তার হাজার বছরের ছবির সঙ্গে মেলেনা। গঠনের সাদৃশ্যের কারণে উপমায় এই মডেলটিকে বলা হলো 'কিসমিস দেয়া পুডিং মডেল'। পুরো এটমে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকা ধনাত্মক অংশটি হলো মূল পুডিংটি, আর এতে ছড়ানো ছিটানো ঋণাত্মক ইলেকট্রনগুলো হলো ওই কিসমিসের মত। এটি নেহাতই উপমা মাত্র। তবুও এর পর থেকে এটম বলতে মনের পর্দায় এরকম একটি জিনিসই ভেসে ওঠে। এটমের কোন চিত্ররূপ যদি আদৌ আনতে হয় এভাবে নিরবিচ্ছিন্ন ধনাত্মক চার্জযুক্ত জিনিসে ছড়ানো ইলেকট্রনের ছবিই হবে সেই চিত্র। বিজ্ঞানীরাও নানা ঘটনার ব্যাখ্যায় এই মডেলটি ব্যবহার করতে পারছিলেন, যেমন সেই ক্যাথোড রে'র ব্যাখ্যায়। কিন্তু শিগ্‌গির গুরুত্বপূর্ণ অন্য ঘটনার ব্যাখ্যায় এই মডেলটি ব্যর্থ হলো, সেই সঙ্গে আমাদের ধারণায় এটমের গঠন, ফলে এটমের চিত্রটি যথেষ্ট বদলে গেলো।

ইতোমধ্যে তেজস্ক্রিয়তার (রেডিওএ্যাকটিভিটি) বিষয়টি আবিষ্কৃত হয়েছিলো। এতে কোন কোন বস্তু থেকে (তার এটম থেকে) আপনা আপনি কিছু কিছু কণা ইতস্তত নির্গত হতে দেখা গেছে। রশ্মির আকার নেয় বলে তিন রকমের এগুলোকে বলা হলো আলফা রে', বীটা রে' এবং গামা রে'। বীটা রে' ওই ইলেকট্রনেই গঠিত, তাই এর কণা মানে ইলেকট্রন যা ঋণাত্মক চার্জের।

আলফা রে' কিন্তু এর চেয়ে অনেক ভারি— প্রায় হিলিয়াম এটমের সমান ভারি এবং তা ধনাত্মক চার্জের। গামা রে' আসলে এক ধরণের শক্তি-রশ্মি। ১৯১১ সালের দিকে ইংল্যান্ডে এর্নস্ট রাদারফোর্ড এই তেজষ্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি আলফা কণাকে ব্যবহার করে একটি এক্সপেরিমেন্টে দেখতে চাচ্ছিলেন এর দ্বারা থমসনের 'কিসমিস দেয়া পুডিং' এটম মডেলটিকে প্রমাণ করা যায় কিনা। সোনা ধাতুটি পিটিয়ে খুবই পাতলা পর্দায় পরিণত করা যায় যে অবস্থায় তা অল্প কিছু এটমের পুরুত্বেই গড়া থাকে। রাদারফোর্ড ভাবলেন ধনাত্মক ঘনীভূত চার্জের আলফা কণিকা যদি এরকম একটি পাতলা পর্দার গিয়ে আঘাত করে তা হলে সেখানকার সোনার এটমের ভেতরে একেবারে পাতলা করে বন্টিত ধনাত্মক চার্জ দিয়ে সেটি খুব একটা বিকর্ষিত হবেনা। ফলে বেশি এদিক ওদিক না গিয়ে সোজা চলে যাবে। পর্দাটির চারিদিকে অনেকগুলো আলফা কণিকা উদ্ঘাটক যন্ত্র দিয়ে ঘিরে রেখে দেখার চেষ্টা করা হলো সোনার পরমাণুতে ঢোকার পর আলফা কণিকাগুলো কতগুলো কোন্ দিকে যায়। আর প্রত্যাশিত ভাবে গেলে থমসনের কিসমিস দেয়া পুডিং মডেলটি সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। ওই ভাবে সোনার পাতলা পর্দা ব্যবহারের কারণে এই এক্সপেরিমেন্টটি রাদারফোর্ডের 'গোল্ড ফয়েল' এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

এতে যেই ফলাফল আশা করা হয়েছিলো এক্সপেরিমেন্টটি থেকে তা মোটেই পাওয়া গেলোনা। অধিকাংশ আলফা কণিকা এটমগুলোর মধ্য দিয়ে সোজা চলে গেলো বটে, কিন্তু অল্প কিছু সোজা পেছন দিকে ফেরৎ আসলো। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ঘটনা। স্বয়ং রাদারফোর্ড একে তুলনা করেছেন পাতলা কাপড়ের পর্দায় কামানের গোলা ছোঁড়ার পর পর্দায় লেগে কোন কোন গোলা কামানের দিকে সোজা ফিরে আসার সঙ্গে— সোনার অতি পাতলা পর্দায় থাকা এটমের তুলনায় আলফা কণিকা আকার ও শক্তিতে কামানের গোলার মতই বটে। এর একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে যে এটমের অভ্যন্তরে ধনাত্মক চার্জ মোটেই সর্বব্যাপ্ত ভাবে নেই, বরং মাঝের একটি ছোট্ট জায়গায় সব ধনাত্মক চার্জ কেন্দ্রীভূত অবস্থায় আছে। একে বলা হলো এটমের নিউক্লিয়াস। যে ক'টি আলফা কণিকা তার কাছ দিয়ে গেছে নিজেরাও ধনাত্মক হওয়াতে সেগুলো সজোরে বিকর্ষিত হয়ে সোজা পেছনের দিকে চলে এসেছে। কেন্দ্রীয় ওই ধনাত্মক চার্জ অঞ্চলটি ছাড়া এটমের বাকিটা ফাঁকা জায়গা যাতে ক্ষুদ্র ঋণাত্মক ইলেকট্রন ক'টি রয়েছে। ধনাত্মক নিউক্লিয়াসে ঋণাত্মক ইলেকট্রনগুলো আকৃষ্ট হয়ে যেহেতু পুরো এটম চুপসে যায়নি তাই ধরে নেয়া যায় যে ইলেকট্রনগুলো নিজ নিজ কক্ষ পথে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে।

রাদারফোর্ডের গোল্ড ফয়েল এক্সপেরিমেন্ট থমসনের সেই কিসমিস দেয়া পুডিং রূপী এটম মডেলকে প্রমাণ করা তো দূরে থাক, একে বরং সম্পূর্ণ

বাতিল করলো। তার বদলে এটমের একটি নতুন মডেল মেনে নিতে হলো যাকে বলা যায় রাদারফোর্ডের 'সৌর জগত সদৃশ' মডেল। সৌর জগতে যেমন কেন্দ্রে সূর্য আর তার চারিদিকে নিজ নিজ কক্ষ পথে ঘুরছে গ্রহগুলো, এটমেও তেমনি কেন্দ্রে ধনাত্মক নিউক্লিয়াস আর তার বাইরে ঘুরছে ক্ষুদ্র ঋণাত্মক ইলেকট্রনগুলো।

সেই থেকে আমরা এটম বলতে এমনি চেহারার জিনিসকেই বুঝি, একেই এটমের ছবি হিসেবে সর্বত্র আঁকা থাকতে দেখি। রাদারফোর্ডের এই মডেলে তখনই একটি দুর্বলতা চোখে পড়েছে; সেটি হলো চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রন যদি ওভাবে ঘোরে তাহলে তার থেকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি বিকীর্ণ হতে থাকবে— প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব অনুসারে। এভাবে শক্তি বিকীর্ণ হতে হতে শক্তি কমে গিয়ে ইলেকট্রনের কক্ষ পথ ক্রমেই ছোট হবে এবং শেষ পর্যন্ত এটি নিউক্লিয়াসে গিয়ে মিশে যাবে। এমন এটম তাই স্থায়ী হতে পারে না। পরে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে ড্যানিশ বিজ্ঞানী নীল বোর এর একটি সমাধান দেন। তিনি বলেন ইলেকট্রন যেহেতু কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী শুধু বিশেষ বিশেষ কিছু শক্তিতে থাকতে পারে, এর মাঝামাঝি কোন শক্তিতে নয়; তাই সেটি নিজ কক্ষেই থাকবে সাধারণত শক্তি বিকিরণ করে অন্যত্র যাবেনা, বিকিরণ করবে শুধু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে। এ সবের কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ বাস্তবে পাওয়া যাওয়াতে নীল বোরের মডেলটিই অনেকটা স্থায়ী হয়ে গেলো। আমরা এটমের সেই চিত্রটিই প্রায়শ ধারণ করছি। স্কুলে-কলেজে পদার্থবিদ্যা ও কেমিস্ট্রির যাবতীয় পাঠে এই মডেল ব্যবহারই যথেষ্ট। জনমনেও এটম বলতে এমনি ছবিই রয়েছে।

তবে ইতোমধ্যে আরো সম্পূর্ণ কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিরিখে বিজ্ঞানীদের কাছে মডেলটি আবার কিছুটা বদলে গেছে। এই তত্ত্বের অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী এটমের ইলেকট্রন কোন নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকতে পারে না, কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতেও না। বরং আমরা শুধু পাই নানা স্থানে তার থাকার গাণিতিক সম্ভাবনাগুলো। একে বরং বুঝতে হয় এক রকম কুয়াশার আকারে। তাত্ত্বিক ভাবে নানা স্থানে নানা ঘনত্বের কুয়াশার ছবিতেই ইলেকট্রনকে পাওয়া যায়। এখন তাই কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস ও তার বাইরে ইলেকট্রনের কুয়াশার এই ছবি নিয়েই এটম। এর ভিত্তিতেই এর থেকেই গাণিতিক ভাবে অত্যন্ত নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা যায় পদার্থবিদ্যা ও কেমিস্ট্রির সমস্ত কিছুর ফলাফল। কাজেই এখন এটিই সত্যিকার অর্থে এটমের মডেল।

এক সময় এটম বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল মার্বেলের মত, এরপর ছিল কিসমিস দেয়া পুডিং সদৃশ, এরপর সৌর জগত সদৃশ, এখন তা প্রধানত কুয়াশা সদৃশ। সর্বশেষ জ্ঞানের ভিত্তিতে এভাবেই নানা জিনিস সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলাতে হয়। যে সময় যেই মডেল প্রতিষ্ঠিত, বিজ্ঞানী তার ভিত্তিতেই সব কিছু জানার চেষ্টা করতে পারেন, এর বেশি করার উপায় তাঁর

নেই। পরের মডেল আগেরটির থেকে উন্নত একথা মানতেই হয়, কারণ এর থেকে সবকিছুর আরো ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, আরো উন্নত সাফল্য আসে। তা হলে প্রশ্ন ওঠে এটম আসলে কী? বিজ্ঞানের কাছে সর্বশেষ মডেলটিই সত্য; আরো সত্য যদি কিছু থাকে তাহলে বিজ্ঞান তাও খুঁজে পাওয়ার আশা রাখে। এভাবে নানা বাস্তব রূপকল্পের হিসেবে এটমের মডেলকে দেখা হলেও কার্যক্ষেত্রে মডেলগুলো গণিতের সমীকরণের রূপেই রয়েছে, ওই রূপকল্পের গাণিতিক ভাষ্যে। তবে সবগুলোর বাইরে এটমের কোন 'আসল' ছবি আছে কিনা সেটি অনেকটা জ্ঞান-বিচারের বিষয়, বিজ্ঞানের নয়। বড়জোর বলা যায় বিজ্ঞান ক্রমাগত সেই আসলের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, সেই যাত্রা কখনো শেষ হবেনা। আসল বাস্তবতার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কের এমনিতরো প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা পরে আরো অলোচনা করবো।

জটিল প্রকৃতিকে আদর্শ গণিতের ছাঁদে বেঁধে ফেলা

নানা তত্ত্ব থেকে তৈরি মডেলঃ

স্থপতিরা বা প্রকৌশলীরা যেভাবে আসল জিনিসের ছোট আকারের মডেল বানিয়ে তার ওপর চিন্তা ভাবনা করেন, বিজ্ঞানীরাও কোন কোন ক্ষেত্রে ওভাবে ধরাছোঁয়ার মত, আসলের একরকম 'খেলনা' রূপ তৈরি করে গবেষণা করেন। এর একটি সুন্দর উদাহরণ রয়েছে উড্ডয়ন-বিদ্যায় (এরোনটিক্স)। সেখানে খেলনা বিমানের মতই ছোট বিমান-মডেল নিয়ে তা উইন্ড টানেলে উড়িয়ে দেখা হয়। উইন্ড টানেল হলো সুড়ঙ্গ-পথের মত অপেক্ষাকৃত সরু কিন্তু দীর্ঘ স্থানে কৃত্রিম বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করা; যে প্রবাহের প্যাটার্ন, বেগ, দিক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এবার মডেল বিমানের ডিজাইনে নানা পরিবর্তন এনে তা ওই উইন্ড টানেলে ছেড়ে দেয়া হয়; বায়ু প্রবাহের কারণে সেগুলো উড়তে থাকে। এদিকে বায়ুপ্রবাহেও নানা পরিবর্তন এনে (যেমন ঘূর্ণি বা ঝড়ো হাওয়া) এই উড্ডয়নের নানা দিক রেকর্ড করা হয়। এভাবেই আবিষ্কৃত হতে পারে উড্ডয়ন-বিদ্যার আরো সূক্ষ্ম দিকগুলো এবং উদ্ভাবিত হতে পারে আরো ভাল ডিজাইনের বিমান। আসল আকাশে আসল বিমানের ওপর এসব পরীক্ষা নিরিক্ষা করার চেয়ে উইন্ড টানেলে উড়ন্ত মডেলে করা যে অনেক বেশি নিরাপদ, সস্তা, ও কার্যকর তা স্পষ্ট।

কিন্তু যখন আমাদের সমস্যাটি হয় আরো একটু ব্যাপক— ওরকম একটি 'খেলনা' সদৃশ মডেল বানিয়ে যার থেকে কথা আদায় করা যায়না, তখন কী হবে? ধরা যাক এটি আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেবার সমস্যা। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অনেক রকম জিনিসের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ওপরে নির্ভর করে আমার এই সীমিত জায়গায় কয়েক ঘন্টা পর, অথবা আগামী কাল, অথবা এক সপ্তাহ পর আবহাওয়া কী রকম থাকবে। ব্যাপারটি একটি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ক্ষেত্রেও

হতে পারে; যেমন বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে হাজার হাজার মাইল দূরে সৃষ্টি হয়েছে একটি ঘূর্ণিঝড়— যেটি একটু একটু করে আমাদের এলাকার দিকে আসছে। আগামী দিনগুলোতে এর মতিগতি কী হবে কিছুই জানিনা— অথচ তার ওপর নির্ভর করছে— লক্ষ লক্ষ মানুষের জান-মাল। যদি ওই উইন্ড টানেলের মত বাস্তব মডেল বায়ুমণ্ডল বা বঙ্গোপসাগরের থাকতো যার আচরণ দেখে আমরা পুরো আবহাওয়ার, কিংবা ঘূর্ণিঝড়টির আচরণ আগে থেকে জানতে পারতাম, যেভাবে বিমানের ক্ষেত্রে জানতে পেরেছি; তা হলে সমস্যাটির একটি সুরাহা হতো। কিন্তু বিমানের মত এত ছিমছাম জিনিস এটি নয় বলে আবহাওয়ার এবং তার পারিপার্শ্বিকতার বাস্তব মডেল তৈরি সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে অন্য বিকল্প হলো ওই পুরো ব্যাপারগুলোকে গাণিতিক মডেলে রূপান্তরিত করে সেই মডেল থেকে আগামী দিনগুলোতে আসল জিনিসের পূর্বাভাস দেয়ার দায়িত্ব কম্পিউটারের ওপর ছেড়ে দেয়া।

আবহাওয়া বা ঘূর্ণিঝড়ের মত এত ব্যাপক বিস্তৃত ঘোর-পেঁচের ও অনিশ্চয়তার বিষয়কে গণিতের সুন্দর সৌকর্যময় নিশ্চিত নিয়ম-মানা জগতে নিয়ে আসা যাবে একথা ভাবা কঠিন। কিন্তু মডেল মানেই তো এই অসম্ভবকে সম্ভব করা। এখানে কৌশলটি হলো জটিল বাস্তব জিনিসটির নানা দিককে আলাদা করে ফেলে তার সব খুঁটিনাটির ওপর জোর না দিয়ে বরং শুরুতে তাকে সরল গাণিতিক আদর্শে ধরে নেয়া। উদাহরণ হিসেবে এক সময় বিজ্ঞানীরা গ্যাসের কাল্পনিক অণুগুলোর ছোটাছুটিকে বিজ্ঞানের মধ্যে আনার চেষ্টা কী ভাবে করেছেন দেখা যাক। নানা আলামত বলছিলো যে উত্তাপের কারণে গ্যাসের অণুগুলো ইতস্তত ছোটাছুটি করে। প্রকৃত গ্যাসে যখন এটি হয় অণুর এই গতির মধ্যে অনেক কিছুর ছোট ছোট প্রভাব থাকে যেমন আশপাশের অন্য অণুগুলোর দূর থেকে বিভবের (পোটেনশিয়াল) প্রভাব থাকে। এসব প্রভাব অণুর গতিকে খুবই জটিল করে তোলে। অথচ অণুটির মূল গতির বিবেচনায় এসব খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই 'প্রকৃত গ্যাসের' বদলে বিজ্ঞানী একটি 'আদর্শ গ্যাস' কল্পনা করলেন— যাতে ক্ষুদ্র বিন্দুর মত অণুর আয়তনের তুলনায় তার প্রতিবেশী অণুগুলোর দূরত্ব এত বেশি থাকে যে তাদের প্রভাব নগণ্য মনে করা যায়। একবার এই আদর্শ মেনে নিলে তাকে গণিতের সরল নিয়মের আদর্শে নিয়ে আসতে বেগ পেতে হয় না। এভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে আদর্শ গ্যাসের ভারি সুন্দর নিয়ম। যদিও কোন গ্যাসই আদর্শ গ্যাস নয় তবুও অনেক গ্যাসই এর খুব কাছাকাছি আচরণ করে, বিশেষ করে সেগুলো যদি হালকা গ্যাস হয়, এবং অধিক উত্তাপে ও কম চাপে থাকে (সে অবস্থায় অণুগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব বেশি থাকে বলে)। আর যে গ্যাসের আচরণ আদর্শ গ্যাসের থেকে একটু বেশি আলাদা তাঁদের ব্যতিক্রমগুলোর জন্য কিছু সংশোধন ওই আদর্শ গ্যাসের নিয়মে জুড়ে নেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানের গবেষণায় পদে পদে এরকম গাণিতিক আদর্শ ব্যবহৃত হয়েছে— অধিক পরিচিত উদাহরণ হিসেবে জ্যামিতিক বিন্দুর আদর্শে ইলেকট্রন, আদর্শ পেন্ডুলামের ভারহীন সূতা, গতির ক্ষেত্রে বাতাসের শূন্য বাধা, স্প্রিং এর কম্পনে শুধু সরল-রৈখিক অংশ রাখা ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। এসব আদর্শ পরিস্থিতি ধরে নেয়াতে এসবের গাণিতিক মডেল অনেক সরল হতে পেরেছে।

আবার আবহাওয়ার কথায় ফেরৎ যাই। আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রক উপাদানের সংখ্যা অনেক— প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর জটিলভাবে প্রভাব রাখছে। যেখানে যেখানে সম্ভব ওই আদর্শ হিসেবে তার জটিলতাকে তুচ্ছ করে দেখে তাতে গাণিতিক সমীকরণ পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। প্রধানত পদার্থবিদ্যার নানা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং নানা প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কগুলো থেকে এসব সমীকরণ পাওয়া যায়। আবহাওয়া কীভাবে এগোবে তাতে অনেক সুদূর জিনিসকেও বিবেচনায় রাখতে হয়— পৃথিবীর দৈনিক গতি, বার্ষিক গতি, সমুদ্র-স্রোতের রদবদল, দূরে কোথাও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত ঘটনা এসবের সূক্ষ্ম প্রভাব এতে অনেক সময় বড় প্রভাব হিসেবে দেখা দিতে পারে। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সর্বশেষ তত্ত্বগুলোকে গাণিতিক সমীকরণের আকারে মডেলে আনা হয় এবং একটির সমাধান অন্যটিকে কীভাবে বদলায় তাও এতে ধারণ করা হয়। এভাবে গত শতাব্দীর শুরুতে আদর্শ গ্যাসের গতিবিদ্যার বিখ্যাত অয়লার সমীকরণকে ভিত্তি হিসেবে ধরে তাতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণন ইত্যাদির প্রভাবগুলোকে যোগ করার জন্য কিছু পরিবর্তন এনে প্রথম উন্নত আবহাওয়া মডেলের সূচনা হয়েছিলো। আশা ছিলো যে অন্তত মাইলখানেক দূরত্বের জায়গার মধ্যে এই মডেলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মাইলের মধ্যে পরিমাপযোগ্য বিভিন্ন উপাত্ত— যেমন বাতাসের উত্তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, বেগ ইত্যাদি মেপে মডেলে ঢোকালে তা আগামী সময়ের পরিস্থিতি জানাতে পারবে। কিন্তু দেখা গেলো এজন্য মাইলের মধ্যে নয়, কয়েক ফুট দূরে দূরেরই উপাত্ত দরকার— যা মাপা সম্ভব নয়। ফলে অয়লার সমীকরণের বদলে আরো জটিল ব্যাপ্তি সম্পন্ন সমীকরণ ব্যবহার করতে হলো।

ওদিকে উপগ্রহ থেকে নিচের বায়ুমণ্ডলের পর পর স্বল্প দূরত্বের উপাত্ত সহজে নেবার সুযোগ আসাতে মাপার কাজটি সহজ হলো। এক এক অঞ্চলকে এখন তিনমাত্রিক গ্রাফ পেপারের মত ছোট ছোট খোপে ভাগ করে প্রত্যেক খোপ থেকে উপাত্ত ক্ষণে ক্ষণে নিয়ে তা মডেলে ঢোকানো সম্ভব হয়েছে। কম্পিউটারের ক্ষমতা বৃদ্ধিটিও এতে খুব কাজ দিলো। ফলে দুনিয়া জোড়া উপাত্ত সারাক্ষণ সংগ্রহ করা এবং দুনিয়ার বিশাল অংশের প্রত্যেকটি জায়গার আবহাওয়ার ভাল পূর্বাভাস অন্তত দিন দশেক আগেই পেতে পারা এখন

নিত্যকার ব্যাপার। সব কিছুর মূলে রয়েছে এর উপাদানগুলোর পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানের ভাল তত্ত্ব থাকা এবং সেগুলোর ভিত্তিতে উপযুক্ত সমীকরণের গাণিতিক মডেল হিসেবে খাড়া করতে পারা। এই মডেলটি কোন স্থির ফল দিচ্ছেনা— প্রতি মুহূর্তে ফল বদলাচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে; সময়ের সঙ্গে বিকাশের হারটি ওই সমীকরণগুলোরই বৈশিষ্ট। কম্পিউটার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সমীকরণগুলোর সমাধান করে এবং এবং সেই ফলাফলকে পরবর্তী সমীকরণের অংশ করে এই ক্রমপরিবর্তমান পরিস্থিতিটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে, সত্যি সত্যি ঘটবার অনেক আগেই।

আবহাওয়া নিষ্প্রাণ জিনিস, তাই এর যান্ত্রিক খুঁটিনাটি সমীকরণে আনা সম্ভব হয়েছে— এমন কথা কেউ ভাবতে পারেন। কিন্তু আমাদের শরীরের ঘটনাগুলো, এমন কি জীবন-মরণ সমস্যা হতে পারে এমন ঘটনাগুলো নিয়েও সমীকরণে গড়া গাণিতিক মডেল গড়া হয়েছে যার ভবিষ্যদ্বাণী জীবন রক্ষাকারী হতে পারে। পঞ্চাশ বছর আগেও মারাত্মক সব হৃদরোগকে অন্য প্রাণীর ওপর পরীক্ষা, চিকিৎসার অভিজ্ঞতা, এবং কিছু ল্যাবোরেটরি এক্সপেরিমেন্টের ভিত্তিতে বোঝার চেষ্টা করতে হতো। এখন তা গাণিতিক মডেল থেকে স্পষ্ট ছবিতে এবং সুনির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক ফলাফলে অনেক বেশি নিশ্চয়তার সঙ্গে জানা যায় এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। এর কিছু উদাহরণ নেয়া যাক।

রক্ত যখন ধমনী ও শিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তার চাপ ওই রক্ত-নালীগুলোর দেয়ালে অনুভূত হয়। নালীর দেয়ালের গঠন, স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদির সঙ্গে ওই প্রবহমান রক্তের ও তার চাপের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে। রক্তের রসায়ন এবং নালীর দেয়ালের রসায়নটিও এতে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর ওপরেই নির্ভর করে ওই রক্ত সঞ্চালনের সুস্থতা অথবা সংকট। একে যদি গণিতের মডেলে আনতে হয় তা হলে প্রবহমান রক্তের সঙ্গে রক্ত-নালীর দেয়ালের এই জটিল ঘাত-প্রতিঘাতকে সমীকরণের মধ্যে আনতে হবে। রক্তের চাপ ওই দেয়ালে যে যান্ত্রিক শক্তি হস্তান্তর করে তাতে নালী স্ফীত হয়। এই শক্তি হস্তান্তর ক্রিয়া যে ধরণের সমীকরণে ধারণ করা যায় গণিতে সেগুলোকে বলা হয় ল্যাভিয়ের-স্টোক সমীকরণ। অন্যদিকে রক্ত প্রবাহের আঘাত পাওয়া নালী রক্তের কাছে যেভাবে সেই শক্তি ফিরিয়ে দেয় সেগুলোকে ধারণ করা যায় দৃঢ় বস্তুর বলবিদ্যায় ব্যবহৃত সমীকরণে। এই শেষের সমীকরণে চলে আসে নালী-দেয়ালের গঠন— সেখানে মসৃণতা, বাধা, টানাপোড়েন, বিকৃতি, বিশেষ করে কোষ-কলার সম্ভাব্য ক্ষতি। এর সঙ্গে রয়েছে রক্তের অক্সিজেন অণু, চর্বির অণু, ওষুধের অণু ইত্যাদি কীভাবে নালীতে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে শোষিতও হয় তা। বিশেষ করে চর্বির অণু নালীর গায়ে কীভাবে জমে, সেখানে তার প্রভাব কী সেটি গুরুত্বপূর্ণ। এই শেষের বিষয়গুলো নিয়েও আদর্শ গাণিতিক সমীকরণ রয়েছে যেগুলো মূলত পদার্থবিদ্যা, কেমিস্ট্রি ইত্যাদি

সাধারণ বিজ্ঞানেরই আবিষ্কার। এসব সমীকরণ একই রকম সবকিছুর ওপরেই প্রযোজ্য, শুধু রক্ত বা রক্তনালীর ওপরে নয়। এ সবের পারস্পরিক সম্পর্ককে ঠিক রেখে রচিত হয় রক্তনালীতে রক্ত প্রবাহের মডেলটি।

এমন মডেলের হিসেবের ভেতরে রুগীর দেহের পরিমাপকৃত কিছু উপাত্ত ঢুকিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আশা করা হয়। কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যারের কল্যাণে উত্তরগুলো নানা রঙে স্পষ্ট হয়ে ছবি বা গ্রাফের আকারে আসে— রঙ ঘনত্ব ইত্যাদি থেকে বাস্তব পরিস্থিতিটি স্পষ্ট করে তুলে; অথবা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে। প্রশ্নগুলো হতে পারে রক্তের প্রবাহের অবস্থা, রক্তনালীর দেয়ালে পরিবর্তন, এখানে ক্ষত সৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে, অথবা হতে পারে ওই রক্তনালীতে কোন্ অস্ত্রোপচার করা যাবে তা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পর প্রথম দিন ওখানে প্রবাহ, ক্ষত ইত্যাদির কী রকম পরিস্থিতি হবে, তিন দিন পর কী রকম হবে, কখন এটি স্থিতিশীল হবে এসবের আগাম ভবিষ্যদ্বাণী মডেল থেকেই পাওয়া যাবে। এগুলো আগেভাগে অনুমান করে সঠিক ব্যবস্থা নেয়া যাবে। এই সব ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়ার জন্য রুগীর বর্তমান অবস্থা পরিমাপ করে নানা রকম খুঁটিনাটি ইনপুটকে মডেলের মধ্যে ঢোকাতে হবে। আজকাল কোন রকম কাটাছেঁড়া না করেই অনেক গভীরে গিয়ে এসব খুঁটিনাটি মাপা সম্ভব— এমআরআই, ডিজিট্যাল এনজিওগ্রাফি, ডপলার এনোমোমেট্রি ইত্যাদির মাধ্যমে। এমআরআই রক্তনালীর দেয়ালের গঠনে সূক্ষ্মতম পরিবর্তনগুলো দেখিয়ে দেয়, এনজিওগ্রাফি রক্ত প্রবাহের বাধাগুলো চিহ্নিত করে, ডপলার এনোমোমেট্রি রক্তপ্রবাহের বেগ খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করে— সবই বাইরে থেকে। গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া প্রয়োজন সেগুলো হলো পরিস্থিতির এই ধারা চলতে থাকলে সামনের দিনগুলোতে রক্তপ্রবাহ ও নালী দেয়ালের অবস্থা কী হবে, অস্ত্রোপচার না করলে কী হবে, কোন্ ধরণের অস্ত্রোপচারে কী হবে। যেমন হার্টের পেশিতে রক্ত সরবরাহ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেরোটিড ধমনী যেখানে দুভাগে বিভক্ত হয়েছে তার কাছাকাছি জায়গাগুলোতে রক্ত প্রবাহের বেগ জানাটি খুব প্রয়োজন। নানা পরিস্থিতিতে সেটি কী হতে পারে তা মডেল হিসেবে করে বলে দিতে পারে। মডেল থেকে পাওয়া ফলাফল যখন প্রাবাহ-গুণ অনুযায়ী রক্তের বিভিন্ন রঙের ছবি হিসেবে দেখা দেয়, তাতে ওই জায়গার কোথায় প্রবাহ কী রকম হবে তা চিকিৎসক দেখতে পান। আর একটি উদাহরণে ওখানকার রক্তনালীর দেয়ালে কোথায় কত তেরচা ভাবে রক্তের চাপ পড়ে, কত চাপ পড়ে তা জানা যায়। এর থেকে বোঝা যায় এখন পরিস্থিতি কী, সামনে ঝুঁকি কী, ঝুঁকি কমাতে কী করতে হবে। কী করতে হবে তা জানতে নানা পরিবর্তিত ইনপুট দিয় তার ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায়, এবং তার থেকে কর্তব্য নির্ধারণ করা যায়। সত্যি সত্যি করে দেখার আগেই এসব জানা যায়। এখানেই মডেলের বাহাদুরি।

মডেলের পেছনে কিছু নিয়মঃ

যখনই গাণিতিক মডেল তৈরি করা হয় মডেলটি ঠিক পথে রয়েছে কিনা তা দেখার উপায় হলো এটি বিজ্ঞানের ও গণিতের কিছু অনিবার্য নিয়ম মেনে চল্‌ছে কিনা দেখা— যেমন নিত্যতার নিয়মগুলো। একটি উদাহরণ থেকে এরকম কয়েকটি বিষয় দেখা যেতে পারে। ধরা যাক একটি পাহাড়ি নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করা যাবে কিনা এবং গেলে কী রকম বাঁধ দিতে হবে তা আগাম জানার জন্য একটি গাণিতিক মডেল তৈরি করতে চাই। এ মডেল তৈরিতে এর মধ্যে বিজ্ঞানের দিক থেকে সব চেয়ে জরুরি বিষয়টি কী সেটি আগে দেখতে হবে— তা হলো বাঁধের উচ্চতা, কারণ কোন্ উচ্চতায় পানি জমেছে তার ওপরেই এর জমা শক্তি নির্ভর করবে যা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু প্রকল্পটি হাতে নেবার আগে মডেলে আরো অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। আসতে হবে বাঁধের দৃঢ়তা, পুরুত্ব, যেই নির্মাণ বস্তু দিয়ে বাঁধ তৈরি হবে তার গুনাগুন। ওর মধ্যে নদী প্রবাহের ও বন্যার প্রভাব এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ; এমনকি ও জায়গায় মানুষের বসত, তাদের জীবন-জীবিকা, তাদের স্থাপনা পরিবেশের পরিস্থিতি ইত্যাদিও।

তবে খুবই মৌলিক পর্যায়ে পদার্থবিদ্যার কতগুলো প্রাথমিক নিয়ম এর সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে কিনা তার যাচাই খুব জরুরি। যেমন পানির যে মোট ভর তা ওই প্রবাহিত হবার সময়, জমা হবার সময়, ওপর থেকে নিচে পড়ার সময়, টারবাইনের মধ্য দিয়ে যাবার সময়, ওখান থেকে বেরিয়ে আবার নিচের নদীতে যাবার সময়, কখনোই কমবেশি হবার জো নেই— ভরের নিত্যতা এখানে কাজ করবে। মডেল গড়ার সময় যদি দেখা যায় যে কোথাও এই নিত্যতা লঙ্ঘিত হয়েছে তা হলে মডেল সঠিক হবে না। একই কথা ভর-বেগের (মোমেন্টাম) নিত্যতার সম্পর্কেও খাটে। যে ভরবেগে বাঁধের উজানে পানি প্রবাহিত হয়, যে ভরবেগে পানি নিচে পড়ে, যে ভরবেগ কিছুটা পানির দ্বারা টারবাইনের ব্লেইডে প্রযুক্ত হয় এবং বাকি কিছুটা তার বাইরে দিয়ে প্রবাহিত হয় তার যোগফল— এসব সব সময় সমান থাকতে হয়।

যে কোন মডেলে কতগুলো গাণিতিক বিষয়ও সঠিক থাকতে হয়, যেমন সমীকরণে থাকা প্রত্যেকটি রাশির 'মাত্রা' একই থাকতে হবে। এখানে মাত্রা বলতে বোঝাচ্ছে রাশিটি শেষ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার কোন্ সত্ত্বার প্রতিনিধিত্ব করছে তা— সেটি কি ভর, না শক্তি, না ভরবেগ না অন্য কিছু। খুব সাধারণ অংকে যেমন গাছের সঙ্গে পাথর যোগ করে যোগফল বলা যায়না, তেমনি কোন অংকেই তা বৈধ নয়। সমীকরণ যদি ভরের ব্যাপার হয় তা হলে বাম পাশের সব রাশিকে সামগ্রিক ভাবে ভরই হতে হবে এবং ডান পাশের সব রাশিকেও। প্রত্যেক রাশির সব কটি উপাদানের যে একক সেগুলোকে গুণ-ভাগ কাটাকুটি করলে শেষ পর্যন্ত ভরই পাওয়া যেতে হবে।

আর একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তা স্কেলের ব্যাপার অর্থাৎ মডেলে বিমূর্ত প্রকাশ করতে গিয়ে একটি জিনিসকে কতগুণ উঁচু পর্যায়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে, অথবা কতগুণ নিচু পর্যায়ে। মূল জিনিসটি হয়তো অনেক জটিল কিন্তু তাকে অনেক সরল পর্যায়ের কিছুতে নামিয়ে এনে আমরা তার খুব সরল গণিতকেই ওই জটিল জিনিসটির মডেল হিসেবে নিচ্ছি। যেমন ধরা যাক একটি ৫০ তলা ভবন— একে আমরা স্রেফ একটি স্প্রিং হিসেবে বিবেচনা করে স্প্রিং এর অপেক্ষাকৃত অনেক সরল গণিতে এর গাণিতিক মডেলিং করছি। ওই ভবনে যা যা ঘটতে পারে— দেবে যাওয়া বা না যাওয়া, বাতাসের বেগে উপরের অংশ দোলা, ভূমিকম্পে কাঁপা সত্ত্বেও না ভাঙ্গার মত স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি স্প্রিঙের ওরকম ঘটনার সঙ্গে তুলনীয় বলেই এটি আমরা করতে পারছি। ওরকম একটি বহুতল ভবন তৈরির সময় স্প্রিঙের এই মডেলটি দারুণ সহায়ক হতে পারে। একইভাবে বাংলাদেশী স্থপতি ফজলুর রহমান খান খুব উঁচু ভবনের জন্য আরেকটি মডেল দিয়েছেন সত্তরের দশকে আমেরিকার শিকাগোতে তিনি সিয়ার্স টাওয়ার নির্মাণ করেছিলেন যা সে সময় বহু বছর পৃথিবীর উচ্চতম ভবন ছিল। গাণিতিক মডেলে একে তিনি ইস্পাতের কিছু ফাঁপা টিউবের বান্ডিল হিসেবে নিয়ে খুব হালকা রেখে ভবনকে এত উচ্চতায় নিতে পেরেছিলেন। এরকম বান্ডিলের কলাম শুধু বাইরে থাকায় ভবনটির অভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গার অভাব হয়নি, ওজন বাড়েনি, অথচ ওই বান্ডিলের কারণে তা বায়ু প্রবাহের চাপ সহ্য করতে পেরেছে। এই টিউব ফজলুর রহমান খানের বিখ্যাত আবিষ্কার। স্প্রিং অথবা টিউবের বান্ডিল মডেলে আমরা স্কেলকে সুউচ্চ ভবন থেকে অনেক নামিয়ে আনছি। অন্যদিকে স্কেলকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে নিয়ে গিয়ে একটি অণুর এটমগুলোর মধ্যে যে রাসায়নিক বন্ধন, তার মধ্যে যে কম্পন তাকেও একটি স্প্রিং এর একই আচরণ দিয়ে গাণিতিক মডেল করা যায়। এক্ষেত্রে মডেলের স্কেলটি নিচের দিকে নামিয়ে না এনে বরং ওপরের দিকে তোলা হবে। উভয় স্কেলিঙে মানগত তফাৎ রয়েছে; ভবনের থেকে স্প্রিং যতগুণ ছোট, অণুর চেয়ে স্প্রিং তার থেকে অনেক বেশি গুণ বড়। এই স্কেল পরিবর্তনটির বিষয় মডেলিঙের গাণিতিক বিবেচনায় রাখতে হয়।

কোন জিনিসে বা ঘটনায় একটি গুণের সঙ্গে অন্যটির সরল-রৈখিক সম্পর্কটিই আমাদের মস্তিষ্ক ভাল বুঝতে পারে। এক্ষেত্রে এরকম সম্পর্ক সমানুপাতিক হবে— একটি দ্বিগুণ হলে অন্যটিও দ্বিগুণ হবে। গণিতেও সরল-রৈখিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ করতে পারলে আমাদের সুবিধা হয়। কিন্তু প্রকৃতি সাধারণত মোটেই সরল-রৈখিক নয়— প্রায়শ একটি গুণ নির্ভর করে অন্যটির বর্গ, কিউব বা আরো জটিল কোন রূপের ওপর যা শেষ অবধি অস্থিতিশীলতায় পর্যবেশিত হতে পারে। এমন জটিলতা এবং অস্থিতিশীলতা

নিয়ে বিজ্ঞানের কাজ করা কঠিন— তাই বিজ্ঞান সব কিছু সরল-রৈখিক গাণিতিক মডেলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে— তা সে সাধারণ এলজেব্রার সমীকরণেই হোক কিংবা ক্যালকুলাসের সমীকরণেই হোক। ভবনকে স্প্রিং অথবা টিউবের বান্ডিলে মডেল করার মধ্যে এই চেষ্টাই থাকে। তাই বলে সত্যিকার ভবনে, বা সত্যিকার প্রকৃতিতে সরল-রৈখিক নয় এমন জটিল যে সম্পর্কগুলো অবশ্যম্ভাবী ভাবে থাকে সেগুলোর কী হবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরল-রৈখিকতাই সিংহভাগ আচরণ দেয় বলে ওগুলোকে আমরা তুচ্ছ করতে পারি, অথবা নেহাৎ প্রয়োজন হলে সেগুলোর জন্য কিছু সংশোধনী যোগ করতে পারি। এই সরল-রৈখিকতার দিকটিও মডেলের একটি বৈশিষ্ট।

মডেলকে ত্রুটিমুক্ত করতে হলে তার বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক ভিত্তিগুলোকে এমনি ভাবে নানা শর্ত পূরণের মাধ্যমে মজবুত করতে হয়। তবে শেষ অবধি মডেলের দ্বারা অজানা উপাত্তের ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর আমরা তখনই আস্থা রাখতে পারি যখন নানা রকম জানা ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এর সত্যতা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়। যেমন বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের মডেলের ওপর এরকম আস্থা রাখার কথা বলা যাক। আবহাওয়ার মডেলের মতই জলবায়ুর সব উপাদানের সম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে গ্রিন হাউস এফেক্ট, কার্বন ডাই অক্সাইডের মত গ্রিন হাউস গ্যাস উদগীরণ, তার ফলে গড় ভূ-উত্তাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোর ভিত্তিতে এরকম জলবায়ু মডেলগুলো রচিত। মডেলগুলোতে ওসময়ের গড় ভূ-উত্তাপ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেন ইত্যাদি গ্যাসের উদগীরণ, ইত্যাদির পরিমাপ ইনপুট হিসেবে দিলে পরবর্তী কোন সময়ের গড় ভূ-উত্তাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ও শীত-গ্রীষ্মে পরিবর্তন, সমুদ্র-পৃষ্ঠ উচ্চতা, ঘূর্ণি-ঝড় প্রকোপ ইত্যাদি ফলাফল পাওয়া যায়। এভাবে কিছুটা দূর অতীতের কোন সময়ের জানা তথ্য ইনপুট দিয়ে তার চেয়ে নিকট অতীতের ফলাফল এর থেকে নেয়া যায়। সেই নিকট অতীতের পরিমাপকৃত জানা উপাত্তের সঙ্গে যদি মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী মেলে তা হলে এর ওপর আস্থা রাখা যায়। তবে যা এখনো অতীত হয়নি সেই সময়ের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যিকার ফলন দেখতে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। মডেল সেগুলো আগেভাগেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছে। তবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভর করে মডেলের মধ্যে আমরা আমাদের আচরণের কী রকম দৃশ্যপট থেকে ইনপুট দিয়েছি। যেমন পরিবেশ সচেতন হয়ে কার্বন উদ্গীরণ কমালে এবং বর্জ্য পদার্থ কমালে ভবিষ্যদ্বাণী এক রকম হবে, তা না করলে অন্য রকম হবে, কম করলেও অন্য রকম হবে। কাজেই মডেলই বলে দিতে পারছে এখন কী রকম আচরণ করলে ভবিষ্যতে কেমন বিপদ হবে, আর কীরকম আচরণ করলে সেই বিপদ এড়াতে পারবো।

এক্সপেরিমেন্টের কাজ কম্পিউটারেই সেরে ফেলা যায় কি?

জ্ঞানের খোঁজে তৃতীয় নয়নঃ

প্রকৃত ঘটনার গাণিতিক মডেল কম্পিউটারে চালিয়ে তাতে সেই ঘটনার অনুকরণ করা যায়। এটিই কম্পিউটার সিম্যুলেশন। কম্পিউটার সিম্যুলেশনের সবচেয়ে দুর্দান্ত ব্যবহার হলো একে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টের বিকল্প হিসেবে গণ্য করতে পারা। বাস্তবে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করি নতুন জ্ঞান পাওয়ার জন্য, প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন জ্ঞান। এক্সপেরিমেন্টে যাচাইয়ের মাধ্যমে নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কম্পিউটারে সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টে আসলে বাস্তবে কোন এক্সপেরিমেন্ট না করেই একই কাজ সম্ভব হচ্ছে। এ পর্যন্ত আমরা যে গাণিতিক মডেলগুলো দেখেছি, এবং তাদেরকে কম্পিউটারে সফটওয়্যার হিসেবে দিয়ে তাতে প্রকৃত ঘটনার যে সিম্যুলেশন (অনুকরণ) সৃষ্টির কথা বলেছি সাধারণ ভাবে তার প্রধান উদ্দেশ্যটি হলো ভবিষ্যদ্বাণী করা। মডেলটি সৃষ্টি করতে যে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব বা তত্ত্বগুলো ব্যবহার করা হয়েছে শেষ অবধি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সেই তত্ত্বেরই ভবিষ্যদ্বাণী। কম্পিউটারের সুবিধা গ্রহণ করে নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার সুযোগটিই এখানে বড়— আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ঘূর্ণিঝড়ের গতি-প্রকৃতি আগাম জানা, ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তন জেনে সতর্ক হওয়া, হৃদরোগের অস্ত্রোপচারের আগে কী করলে কী হতে পারে তা জানা ইত্যাদি। এখানেই এ ধরণের সিম্যুলেশনের বৈশিষ্ট। ভবিষ্যদ্বাণী করাতেই তার অনন্যতা, অন্য কিছু নয়। এতে পুরানো তত্ত্বেরই নতুন ব্যবহার ঘটে, নতুন তত্ত্ব আসেনা।

খুবই কাজে এলেও যেহেতু নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হয়না জ্ঞানের বিচারে এসবের মধ্যে খুব অবাক হবার কিছু নেই। তত্ত্ব বা অনুমান থেকে যুক্তির সাহায্যে, বিশেষ করে গাণিতিক যুক্তির সাহায্যে নানা ফলাফলে যাওয়াটিই এর কাজ— আমাদের সেই পরিচিত ডিডাকশন বা যৌক্তিক নির্ণয়। লজিক্যাল পজিটিভিস্টরা একে 'কথার হেরফেরের' থেকে বেশি সম্মান না দিলেও আমরা এখন বুঝতে পারছি এটি মোটেই হেলাফেলা করার মত জিনিস নয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলো আরো অনেক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের অর্থের বিস্তৃতি ঘটছে।

কিন্তু কম্পিউটার সিম্যুলেশনের কাজ শুধু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর সবচেয়ে বেশি চমকপ্রদ কাজ দেখা যায় কম্পিউটার সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টে। এমন সিম্যুলেশন কিন্তু শুধু যুক্তি বিস্তারে কাজ করেনা রীতিমত এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে কাজ করে, যা সত্যিকার বাস্তব এক্সপেরিমেন্টের নতুন জ্ঞান সৃষ্টির সমতুল্য। বাস্তব এক্সপেরিমেন্ট আমরা বাস্তব সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি নিয়ে করি, বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করি; সেই এক্সপেরিমেন্টে ইতিবাচক ফল পেলে আনুমানিক তত্ত্বটি বাস্তবে সমর্থিত হয়েছে বলে মনে করি। সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টে ওসব

যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, কিছুই ব্যবহৃত হয়না, শুধু কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। তারপরও দাবী করা হয় যে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টের মতই এর মাধ্যমে আমরা প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন জ্ঞান পাই। অথচ কাজ যা করার সবই কম্পিউটারই করে— স্রেফ সফ্টওয়্যারের আকারে দেয়া বিজ্ঞানের গাণিতিক মডেলের কম্পিউটার-প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে। বাস্তবিক প্রকৃতিতে কোন কিছু না করে কীভাবে নেহাৎ একটি কম্পিউটার সফ্টওয়্যারের কাজকে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টের মতই একটি 'এক্সপেরিমেন্ট' হবার দাবী করা যায়?

আজকাল অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক্সপেরিমেন্টে এভাবেই হচ্ছে। বিজ্ঞানের যেসব ক্ষেত্রে সাধারণ বাস্তব এক্সপেরিমেন্ট আদৌ সম্ভব নয়, সেখানেও এই সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট করেই বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে আসল কোন এক্সপেরিমেন্ট না করে এ ভাবে কম্পিউটারের কাজকে এক্সপেরিমেন্ট বলে মেনে নেবার পেছনে যুক্তি কী? মনে রাখতে হবে কম্পিউটার সফ্টওয়্যার যে গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলো সৃষ্টি করে তা বাস্তব নয় বটে কিন্তু বাস্তব প্রকৃতিকে বিমূর্ত মডেলিং করে গণিতে আনার মাধ্যমেই সেই সফ্টওয়্যার তৈরি হয়েছে। কাজেই প্রকৃতির অনুকৃতি তার মধ্যে রয়েছে। একটি বিশেষ সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টের পেছনের প্রকৃত ঘটনার সব কিছু বিমূর্ত রূপে তার সফটওয়্যারে আছে। কাজেই এক্সপেরিমেন্টটি যদি বাস্তবে করতাম প্রকৃত ঘটনাগুলো সেখানে যেই যেই ফল সৃষ্টি করতো, তেমনি ফল কম্পিউটারের মধ্যে ওই সফ্টওয়্যারের কাজেও সৃষ্টি হতে পারে। প্রকৃত এক্সপেরিমেন্টে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপে যেমন নতুন সব উপাত্ত আমরা পাই, তেমনি সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টে সফ্টওয়্যারের কাজ নতুন উপাত্ত সৃষ্টি করে, যা ওই পরিমাপকৃত উপাত্তের মতই প্রকৃতির নতুন জ্ঞানের সন্ধান দেয়।

এভাবে এক্সপেরিমেন্টের কাজকে কম্পিউটারের হাতে সমর্পণ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন— যাকে বলা যায় কম্পিউটার জগতের মাত্রা। আমরা দেখেছি বিজ্ঞানের আবিষ্কারে অর্থাৎ নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে একটি অবদান থাকে সৃজনশীল অনুমানের মাধ্যমে আনুমানিক তত্ত্ব সৃষ্টিতে— যা চিন্তায় ঘটে। আরেকটি অবদান থাকে সেই অনুমানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ অথবা এক্সপেরিমেন্টে— যা বাস্তবে ঘটে। তাই তত্ত্ব ও বাস্তব এক্সপেরিমেন্টেকে আমরা সব সময় জ্ঞান সৃষ্টির দুটি পথ মনে করেছি। এখন অনেকে বলছেন এই সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট জ্ঞান সৃষ্টির একটি তৃতীয় পথ নিয়ে এসেছে যা চিরাচরিত অন্য দুই পথের থেকে আলাদা। এ যেন জ্ঞান সৃষ্টির সনাতন দুই চোখের অতিরিক্ত একটি তৃতীয় চোখ— জ্ঞানের খোঁজে একটি তৃতীয় নয়ন। বিজ্ঞানীরা এর একটি মজার নামও দিয়েছেন। বিশেষ করে জীববিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার অনেকটাই করেন প্রকৃতিতে নানা মডেল জীবের ওপর এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে—

কীটপতঙ্গ, শামুক, ইঁদুর, বানর ইত্যাদির ওপর। এই এক্সপেরিমেন্টকে তাঁরা বলেন 'ইন ভিভো' অর্থাৎ প্রাণীর মধ্যে। তাছাড়া তাঁরা ল্যাবোরেটরিতে দেহাংশ, কোষকলা, অণুজীব বা জৈব রাসায়নিক নানা বিষয় নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন, একে তাঁরা বলেন 'ইন ভিট্রো', অর্থাৎ কাচের মধ্যে (ল্যাবোরেটরির কাচপাত্রে এক্সপেরিমেন্ট হয় বলে)। এখন বিজ্ঞানীরা এরই ধারাবাহিকতায় সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টকে বলছেন 'ইন সিলিকো', অর্থাৎ সিলিকনের মধ্যে (কম্পিউটারের উপাদান ট্রানসিস্টরগুলো সিলিকনে তৈরি বলে)।

অনেকেই অবশ্য সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টকে জ্ঞানের সম্পূর্ণ আলাদা রকম উৎস বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে করার পদ্ধতি একেবারে ভিন্ন হলেও সাধারণ এক্সপেরিমেন্টে পাওয়া জ্ঞান আর সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টে পাওয়া জ্ঞান মূলত একই রকম। আবার এর একেবারে বিপরীত মতামতও রয়েছে। সেটি বলে সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট বাস্তব এক্সপেরিমেন্টের সত্যিকার বিকল্প হতে পারে না— কারণ সিম্যুলেশনের মধ্যে বাস্তবতা না থাকায় তার মান সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের মত হতে পারে না। এসব আলোচনায় আমরা একটু পর আসবো, তার আগে দেখি কী কী ভাবে এই সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টের কাজটি চলতে পারে।

বিজ্ঞানের যে সব এলাকায় প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব গাণিতিক রূপে রয়েছে সেখানেই সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট সহ যে কোন কম্পিউটার সিম্যুলেশনের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ ও ব্যাপক। গাণিতিক সমীকরণগুলোই মডেল রূপে সেক্ষেত্রে সত্যিকার বাস্তবের একটি খুব নির্ভরযোগ্য অনুকৃতি গড়ে তোলে। এটি আরো বাস্তবানুগ হয় যখন বাস্তব ঘটনাগুলো সময়ের সঙ্গে যেভাবে পরিবর্তিত হয় ক্যালকুলাসের ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন রূপে তাও এর সমীকরণগুলো ধারণ করতে পারে। ফলে মডেলটি বাস্তবতার বিকাশটিকেও সুন্দর ভাবে অনুকরণ করতে পারে। অনুকরণ দুভাবে হতে পারে— একটিকে বলা যায় 'কণার মত', আরেকটিকে বলা যায় 'ক্ষেত্রের (ফিল্ড) মত'। প্রথমটিতে থাকা প্রত্যেক উপাদানকে এক একটি আলাদা আলাদা কণার মত বিবেচনা করে তার প্রত্যেকটির বিকাশ নিয়ে সমীকরণ এতে থাকে। ফলে পুরো সিস্টেমটি কম্পিউটারে বাস্তবানুগ ভাবে বিকশিত হয়। যেমন এর একটি উদাহরণ হতে পারে মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিগুলোর জন্ম ও বিকাশের সিম্যুলেশন। এখানে এক একটি গ্যালাক্সিই যেন সেই কণা। মহাবিশ্বে গ্যালাক্সির জন্ম ও বিকাশের সর্বশেষ গাণিতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে এই মডেল আমরা গড়ে তুলি। বাস্তবে ওখানে যা হচ্ছে, যেভাবে তা বদলাচ্ছে, এই মডেলের সফ্‌টওয়্যার কম্পিউটারে গাণিতিক ভাবে তেমনটিই সৃষ্টি করে যায়। বাস্তব গ্যালাক্সির পর্যবেক্ষণ থেকে যে রকম নতুন উপাত্ত পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ওই কম্পিউটার প্রসেসিঙের মাধ্যমে একই ভাবে নতুন উপাত্ত কম্পিউটারেই সৃষ্টি

হতে পারে। এর থেকেই নতুন কোন তত্ত্ব সমর্থনও পেতে পারে, ওই গ্যালাক্সি জগত সম্পর্কে। এটি 'কণার মত' সিম্যুলেশন। অন্য দিকে মডেলের সমীকরণগুলো যখন এক একটি নিরবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রের ও তার পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে তখন আসে দ্বিতীয় রকমের সিম্যুলেশনটি— 'ক্ষেত্রের মত' সিম্যুলেশন। সারা এলাকা জোড়া আবহাওয়া এমনি নিরবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রের একটি উদাহরণ। আবহাওয়া মডেল এমনি ভাবেই প্রকৃত আবহাওয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে এটি আজকের আবহাওয়ার উপাত্ত থেকে কয়েকদিন পরের আবহাওয়া নির্ণয় করতে তো পারেই, প্রকৃত আবহাওয়ার আরো পর্যবেক্ষণ যেভাবে আবহবিদ্যায় নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে, এর সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টও তেমনি পারে। কণার মতই হোক আর ক্ষেত্রের মতই হোক এরকম সিম্যুলেশনগুলোকে 'গাণিতিক মডেল নির্ভর' বলা যায়।

এতো গেলো বিজ্ঞানের বেশি গাণিতিক শাখা সমূহের বিষয়। যেখানে এতটা গাণিতিক তত্ত্ব পাওয়া যায়না সিম্যুলেশন সেখানেও থেমে থাকে না। সেক্ষেত্রে উপাদানগুলোকে শুধু কণা হিসেবে বিবেচনা করা যায়, ক্ষেত্র হিসেবে নয়। যেমন একটি ইকো সিস্টেমে অনেক রকমের প্রাণী পরস্পর সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বসবাস করে এবং সেই প্রকৃত সিস্টেমটিকে সিম্যুলেশনে আনতে চাই। ওখানে যে পরিবেশ ও ওসব প্রাণীর মধ্যে যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া তার জন্য হয়তো পদার্থবিদ্যার মত সর্বব্যাপ্তভাবে প্রযোজ্য দুর্দান্ত কোন গাণিতিক সমীকরণ নেই। কিন্তু এক একটি ইকোসিস্টেমের মধ্যে স্থানীয় ভাবে প্রাণীগুলোর (কণাগুলোর) সম্পর্কগুলো নিয়ে যে তত্ত্ব আছে সমীকরণ হিসেবে সহজ গণিতে প্রকাশ করা যায়, আর তার ভিত্তিতে সিম্যুলেশন সফ্‌টওয়্যারও তৈরি করা যায়। ফলে ওই প্রকৃত ইকোসিস্টেমে প্রাণীদের পরিস্থিতি কী হচ্ছে— এদের বংশবৃদ্ধি বা হ্রাস কিংবা বিলুপ্তি ইত্যাদি ওই সিম্যুলেশন থেকেই পাওয়া সম্ভব। এখানেও এসব ভবিষ্যদ্বাণীগুলো করা ছাড়াও এর থেকে সম্পূর্ণ নতুন উপাত্ত বেরিয়ে আসতে পারে যা এ বিষয়ে নতুন জ্ঞান, নতুন তত্ত্বের জন্ম দিতে পারে। পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত গাণিতিক সমীকরণ-নির্ভর না হওয়াতে এ ধরণের সিম্যুলেশনকে গণিত-নির্ভর না বলে বলা যায় 'এজেন্ট-নির্ভর'। গণিতের সৌকর্যময় সমীকরণগুলো এখানে বড় কথা নয়, বরং আলাদা আলাদা এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসেবে ওই প্রাণীগুলো ও তাদের পরিবেশের উপাদানগুলো এখানে সিম্যুলেশনের মধ্যে কাজ করছে। কাজেই সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট করতে বিজ্ঞানের খুব গাণিতিক ক্ষেত্র হতে হবে এমন কথা নেই।

প্রকৃতিতে এমন অনেক ঘটনা আছে যা নিশ্চিত নিয়ম ধরে চলেনা— অনেকটা ইতস্তত ঘটে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলফা কণা বা বিটা কণা যে যে নির্গত হয় তা এটমের নিউক্লিয়াসের

অবক্ষয়ের ফলে ঘটে। একটি কণা নির্গত হওয়ার পরের কণাটি কখন নির্গত হবে সেটি ইতস্তত ব্যাপার— সঙ্গে সঙ্গেও নির্গত হতে পারে, বেশ খানিক্ষণ পরও নির্গত হতে পারে। এমন ঘটনার সিম্যুলেশন কম্পিউটারে কীভাবে করা যাবে— বাস্তবে এ তো লটারির টিকেট টানার মতই অনিশ্চিত। এমন লটারি সিম্যুলেশনে আসবে কী করে? আসলে বাস্তবের মত গণিতেও একেবারে লটারির মত ইতস্তত নানা সংখ্যা সৃষ্টির কৌশল আছে যাদের মধ্যে কোন রকম নিয়ম বা শৃঙ্খলা থাকে না— পুরোটাই একেবারে চান্সের ব্যাপার। একে বলা হয় মন্টে কার্লো পদ্ধতি— যা ইউরোপের মনাকোতে জুয়া খেলার জন্য বিখ্যাত মন্টে কার্লোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এগুলোকে সংখ্যাতাত্ত্বিক নিয়মে গাণিতিক ভাবেই সুনির্দিষ্ট ফল দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। তা হলেই এটি ওরকম লটারির মত ঘটা প্রকৃত ঘটনার সিম্যুলেশন হতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে ইতস্তত কণা বের হওয়া সত্ত্বেও কম্পিউটারেও সেই ইতস্তত ব্যাপারটি অনুকরণ করতে পারার মাধ্যমে সেখানেও বাকি কাজ আসল এক্সপেরিমেন্টের মতই সম্পন্ন হতে পারে। অনেক সিম্যুলেশনে এই মন্টে কার্লো পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়।

কম্পিউটার সিম্যুলেশনের বেশ কিছু সাধারণ ব্যবহার আমরা দেখেছি। এখন কম্পিউটার সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টকে আবশ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে হয়েছে এমন দু'একটি ক্ষেত্র দেখা যাক। সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ দিতে গেলে ভূ পৃষ্ঠের ওপর বড় বিস্ফোরণ বা শক্ তরঙ্গের ফলে ভূগর্ভের গভীরে শিলাস্তরগুলোর ক্ষতি ও ভূমিকম্পের ওপর তত্ত্ব গড়ে তুলতে কম্পিউটারে সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে— যা এই ক্ষেত্রে নতুন ভূ-তত্ত্বের জন্ম দিতে পেরেছে। ক্যানসার ওষুধ আবিষ্কারের কাজে, প্রোটিনে বিষক্রিয়া নির্ধারণকারী আবিষ্কারে ডিএনএ'র প্রতিলিপি তৈরির সময় সৃষ্ট ভুলের সংশোধন প্রক্রিয়া আবিষ্কারে এমনি সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট ব্যবহৃত হয়েছে। এই শেষোক্ত সিম্যুলেশনগুলো জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে সর্বশেষ তত্ত্বগুলোর ভিত্তিতেই খাড়া হয়েছিলো।

সাধারণ বাস্তব এক্সপেরিমেন্ট সব ক্ষেত্রে অধিক কাম্য বটে, কিন্তু সেগুলো কখনো দুরূহ বা অসম্ভব হয়, যেমন ওপরের উদাহরণগুলোতে হয়। তখন সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টই ভরসা। কিন্তু বাস্তব এক্সপেরিমেন্ট সম্ভব হলেও তার সহযোগী হিসেবে সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টের গুরুত্ব অনেক। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটারের দ্রুততা, একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অনেক তথ্য নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা ইত্যাদি খুব কাজে আসে। তাছাড়া এক্ষেত্রে নিমিষে স্কেল পরিবর্তন করে আরো সূক্ষ্ম স্কেলে এক্সপেরিমেন্ট চালানোর ক্ষমতাটিও বেশ যুৎসই হয়। যেমন ধরা যাক আমরা তরলের বা গ্যাসের ঘূর্ণির ওপর সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট করছি। বড় ঘূর্ণি পর্যায়ে ফলাফল পাওয়ার মধ্যে এর

একাংশে ঘূর্ণির মধ্যে আরো ছোট ঘূর্ণিতে কম্পিউটার নিমিষে স্কেল বদল করতে পারে, তারপর তার ভেতরে আরো ক্ষুদ্র ঘূর্ণিতে। কম্পিউটার এটি অনায়াসে করতে পারে অনেকটা ছবি তোলার সময় 'জুম' করার মত করে। বাস্তব এক্সপেরিমেন্টে এটি সহজ নয়। তাই যেসব ক্ষেত্রে বাস্তব এক্সপেরিমেন্ট সম্ভব সেখানেও তার অতিরিক্ত সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট এর ফলাফল সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতা অনেক বাড়ায়।

সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট কি আদৌ এক্সপেরিমেন্টঃ

এখন সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে যে সংশয়গুলো প্রকাশ করা হয় তার আলোচনায় যাওয়া যাক। মনে রাখতে হবে যে যেকোন সিম্যুলেশনের পেছনে একটি বাস্তব ঘটনা থাকে যাকে বলা যায় সিম্যুলেশনটির লক্ষ্যবস্তু-ঘটনা। যে প্রশ্নটি প্রধানত ওঠে তা হলো বাস্তব-প্রকৃতির যে লক্ষ্যবস্তু-ঘটনা নিয়ে এই সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট করার দাবী করা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টটি কি সত্যি সত্যি তার ওপর হচ্ছে? যেমন ওপরের উদাহরণে সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টটি কি সত্যিই ভূ-পৃষ্ঠের বিস্ফোরণের ওপর হচ্ছে? সেই বাস্তবতা তো এর প্রক্রিয়ায় নেই— আছে শুধু কম্পিউটার প্রসেসিং। যাঁরা এরকম সংশয়বাদী নন্ তাঁরা অবশ্য বলেন কোন্ এক্সপেরিমেন্টই বা হুবহু তার লক্ষ্য-বস্তু ঘটনার অনুরূপ হয়? যাকে আমরা সাধারণ এক্সপেরিমেন্ট বলি সেখানেও বাস্তব লক্ষ্য-বস্তু-ঘটনাকে নানা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এনে তার যথেষ্ট ভিন্ন রূপ কি আমরা দিই না— যেমন বাস্তবে যেখানে বাতাস আছে এক্সপেরিমেন্টে তাকে বায়ুশূন্য করে, বাস্তবে যা সাধারণ উত্তাপে থাকে এক্সপেরিমেন্টে তা অতি শীতল উত্তাপে নিয়ে গিয়ে ইত্যাদি রকমের ভিন্নতা এনে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্বগুলো পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী কণিকা ত্বরকের মধ্যে নানা কণিকার অতি উচ্চ শক্তির সংঘর্ষ ঘটিয়ে কণিকা ভাঙ্গা, নতুন বস্তু কণিকা ও শক্তি কণিকা সৃষ্টি ইত্যাদির এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ের প্রকৃত বাস্তব পরিবেশ কি আমরা এই এক্সপেরিমেন্টে সৃষ্টি করতে পেরেছি? সে পরিবেশ কি আমরা আদৌ পুরাপুরি জানি? তারপরও এই সাধারণ এক্সপেরিমেন্টগুলো সম্পর্কে আমরা লক্ষ্য-বস্তু-ঘটনার ওপর তা হচ্ছেনা এমন সংশয় প্রকাশ করিনা— এর কারণ এই এক্সপেরিমেন্টে এমন কিছু অপরিহার্য প্রক্রিয়া আছে যা আমাদেরকে এ সংশয়মুক্ত রাখে। সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টেও যদি সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের মতই এই অপরিহার্য প্রক্রিয়াগুলো থাকে তাহলে তাকেও শেষোক্তগুলোর মত একই পর্যায়ে ফেলা উচিত— সিম্যুলেশনের ক্ষেত্রে কোন বাড়তি সংশয় থাকা উচিত নয়। হাজার হলেও কথায় বলে— যে পাখি দেখতে হাঁসের মত, সাঁতার কাটে হাঁসের মত, প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ তোলে হাঁসের মত, সেটি হাঁস হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। হাঁস হবার অপরিহার্য গুণগুলোর মত

এক্সপেরিমেন্ট হবার অপরিহার্য গুণগুলো দেখা যাক্। তারপর দেখি সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের সেই অপরিহার্য গুণগুলো সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টেরও রয়েছে কিনা।

যে কোন সাধারণ এক্সপেরিমেন্টকে নিশ্চিত হতে হয় যে এর সব কার্যকর অংশ ও যন্ত্রপাতি সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়া কিনা ও সেভাবে কাজ করছে কিনা। উদাহরণ স্বরূপ নিশ্চিত হতে হয় যে উত্তাপ বাড়লে তার ফলে ওখানে যেই অংশে ও যেই যন্ত্রে যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে, যেমন থার্মোমিটারের কাঁটা যেখানে যাওয়া দরকার সেখানে যাচ্ছে, যা যতটুকু প্রসারিত হওয়া দরকার তাই হচ্ছে; অবাঞ্ছিত কিছু হচ্ছেনা। তাছাড়া দেখতে হয় শেষ অবধি বাস্তবের ওপর নির্ভর করে এসব যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন করা হয়েছে কিনা, অর্থাৎ তার স্কেলের শুরু, শেষ ইত্যাদির মাপ নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা। তাছাড়া সেটি বজায় আছে কিনা। যেমন বাস্তবে যে উত্তাপে বরফ গলে তাতেই সেলসিয়াস স্কেলের থার্মোমিটারের শূন্য ডিগ্রি ঠিক করা হয়েছে কিনা এবং এখনো শূন্য বলতে তাই বোঝাচ্ছে কিনা। প্রশ্ন হলো সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টেও কি এসব শর্ত পূরণ হয়? মনে রাখতে হবে এখানেও বাস্তব লক্ষ্য-বস্তু ঘটনার গাণিতিক মডেলিং যে সমীকরণগুলোর দ্বারা করা হচ্ছে সেগুলো ওই ঘটনাগুলোর সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বেরই অংশ। ওপরের উদাহরণের উত্তাপ পরিবর্তনের কথা যদি ওঠে তা হলে এই সমীকরণ উত্তাপের ফল সংক্রান্ত একই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব থেকেই এসেছে, তাই তার ফলও একই হবে— হোক না সেই ফল কম্পিউটারে কাজের মধ্যে। এখানেও শূন্য ডিগ্রি উত্তাপ একই ভাবে ঠিক করা আছে, সফ্টওয়্যার দ্বারা সুনির্দিষ্ট হওয়াতে এই ক্যালিব্রেশন থেকে সরে যাওয়া এখানে সাধারণ এক্সপেরিমেন্ট থেকেও কঠিন।

সাধারণ এক্সপেরিমেন্টে দ্বিতীয়ত আরেকটি জিনিস অপরিহার্য— তা হলো এর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জিনিসকে সঠিক পর্যায়ে সঠিক ভাবে পরিচালিত করতে পারা। যেমন এখানে থাকা একটি তরল এক্সপেরিমেন্টের যে পর্যায়ে গিয়ে ফুট্তে থাকার কথা সে পর্যায়ে তা ফুটতে থাকা; যখন গিয়ে সম্পূর্ণ বাষ্পে পরিণত হবার কথা তখন বাষ্পে পরিণত হওয়া। এক্সপেরিমেন্ট যেভাবেই পরিচালিত হোক না কেন সঠিক পর্যায়ে এসব পরিবর্তন আনতে পারা জরুরি। সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টের কথা বল্লে সেখানে পরিবর্তনগুলো আরো অনায়াসে সুনিশ্চিত ভাবে ঘটতে পারে— কারণ তা এক সমীকরণের সমাধান থেকে অন্য সমীকরণের কোন কোন অংশের পরিবর্তনের ব্যাপার মাত্র।

সাধারণ এক্সপেরিমেন্টে আরো একটি জিনিস নিশ্চিত করতে হয় যা সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টেও অনায়াসে ঘটে। এতে যখন একটি অংশ তার

কোন উপাদান বদলে নিয়ে নতুন নতুন মান নেয়, তখন প্রত্যেকবার উপাদানটিকে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হয়। যেমন উত্তাপ যদি একটি নতুন মাত্রায় যায়, সেই নতুন উত্তাপটি দিয়েই এখন বাকি সব কাজ চলতে হবে; এই নতুন উত্তাপটি সব দিক থেকে স্বাধীন থাকতে হবে। এ স্বাধীন থাকার অর্থ হলো এ পরিবর্তনের ফলে অন্য জিনিসের কোন প্রভাব উত্তাপের এই নতুন মানের ওপর এসে পড়লে চলবেনা। সিম্যুলেশনে এটি সহজ কারণ সরল-রৈখিক গাণিতিক সম্পর্কের মধ্যে থাকা ধ্রুবকটিকে পরিবর্তন করে দিলেই কোন নিয়ামকের একটি নতুন মান পাওয়া যায় যেটি দিয়ে আগের অংকটি হুবহু আবার করা যায়, নতুন মানের স্বাধীনতায় হানি ঘটার কোন সম্ভাবনা ছাড়াই।

যে কোন সাধারণ এক্সপেরিমেন্টে নানা রকম ভুল ঢোকার আশঙ্কা থাকে, আর এসব ভুলকে ন্যূনতম পর্যায়ে আনার চেষ্টা করতে হয়। এর মধ্যে আছে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকা, যন্ত্রের পাঠ নিতে ভুল হওয়া, ইলেকট্রনিক্সে 'নয়েজ' থাকা ইত্যাদি যা ফলাফলের সঠিকতা কমিয়ে দিতে পারে। সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টে ভুলগুলো হয় সফ্টওয়্যারে ত্রুটির কারণে যা দ্রুত দূর করার প্রক্রিয়া কম্পিউটারের মধ্যেই থাকে, কারণ এর ফলে সৃষ্ট অসঙ্গতিগুলো ধরতে পারার সফ্টওয়্যারও আছে। সাধারণ এক্সপেরিমেন্ট যে বাস্তবতারই বিশ্বস্ত আয়োজন তা বোঝা যায় এর ফলাফলের মধ্যে যৌক্তিক সঙ্গতিগুলো দেখে— যেমন অদ্ভুত বা অবৈধ কিছু না আসা, একের সঙ্গে অপরের মিলে যাওয়া ইত্যাদি। সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টে এই সঙ্গতি দেখার দায়িত্ব সফ্টওয়্যারের— এখানেও অসঙ্গত কিছু গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। সাধারণ এক্সপেরিমেন্টে শেষ পর্যন্ত যে উপাত্তগুলো ফলাফল হিসেবে পাওয়া যায় সেগুলো কোন অর্থহীন উপাত্ত হিসেবে থাকতে পারে না— কোন আনুমানিক তত্ত্বের সমর্থনে বা অসমর্থনে ব্যবহৃত হলেই এক্সপেরিমেন্টের সার্থকতা আসে; এর ভিত্তি যে বাস্তবের মধ্যে তা তখন বোঝা যায়। সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টের উপাত্তগুলোও যখন তত্ত্বের প্রতি এভাবে সমর্থন বা অসমর্থন যোগাতে পারে তখন তাকেও বাস্তবানুগ বলতে হয় বৈ কি। সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলে অনিবার্য কিছু ত্রুটি ঢুকে যাওয়ার কারণে ফলাফলে যেটুকু এদিক ওদিক হতে পারে সেটি সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে ফলাফল থেকেই পাওয়া যায় এবং দেখানো যায়। সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টে কম্পিউটার এগুলো নিমিষে নির্ণয় তো করেই, তাকে বিচিত্র গ্রাফ ইত্যাদির আকারে সুন্দরভাবে তুলেও ধরতে পারে।

সাধারণ এক্সপেরিমেন্ট ও সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে ওপরের বিষয়গুলো মিলিয়ে বোঝা গেল যেসব আবশ্যকীয় শর্ত মানার কারণে প্রথমটিকে বাস্তবানুগ বলা যাচ্ছে একই সব শর্ত মানার কারণে দ্বিতীয়টিকেও বাস্তবানুগ না বলার উপায় নেই। দার্শনিকের মত জ্ঞান-বিচারে নেমে যে প্রশ্ন

এসেছে সাধারণ এক্সপেরিমেন্ট যেই জ্ঞান দেয়, সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টও হুবহু সেই একই জ্ঞান দেয় কিনা, সে প্রশ্ন এভাবে ফয়সালা হতে পারে। এতে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের যে যন্ত্রপাতি সেগুলোর কাজ যতখানি বাস্তব, সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টের ট্রানসিস্টর সার্কিট ইত্যাদিতে গড়া কম্পিউটার ততখানিই বাস্তব। জ্ঞান-বিচারে অন্য একটি প্রশ্নও উঠতে পারে। বাস্তবের যে লক্ষ্য-বস্তু ঘটনার ওপর এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে তার সঙ্গে এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলগুলো মিলছে কিনা। এখানে সাধারণ এক্সপেরিমেন্টই হোক কিংবা সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টই হোক, প্রশ্নটি হলো ব্যবহৃত মডেলের বাস্তবানুগতা নিয়ে। সাধারণ এক্সপেরিমেন্টেও আমরা হুবহু বাস্তব প্রকৃতিকে ব্যবহার করিনা— কোন না কোন ভাবে তার একটি আদর্শ-স্থানীয় মডেলকেই ব্যবহার করি। এই মডেল বাস্তবের মতই ফল দেয় কিনা তা আমরা জানা ক্ষেত্রে ব্যবহার করে জানতে পারি। উইন্ড টানেলে 'মডেল বিমানের' আচরণ দেখে যখন আমরা সত্যিকার বিমান তৈরি করি এবং তাতেও ওই আচরণই দেখতে পাই তখন বলতেই হয় উইন্ড টানেল মডেলটি বাস্তব ফল দিচ্ছে। এরপর এই উইন্ড টানেল ব্যবস্থা দিয়ে এ সম্পর্কে এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলকে বাস্তবানুগ বলতে আমাদের কোন অসুবিধা থাকে না। সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টেও যে গাণিতিক বা কম্পিউটার মডেল ব্যবহার করা হয় জানা ক্ষেত্রে সেটিকে প্রয়োগ করে এবং তার ফলাফলকে জানা বাস্তব উপাত্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় যে মডেলটি সঠিক ও বাস্তবানুগ কিনা। তারপর এক্সপেরিমেন্টে ব্যবহার করলে তার ফলও একই ভাবে সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের মতই বাস্তবানুগ হবে এটি ধরে নিতে পারি।

ওপরের এই উভয় দিক থেকে সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের মত একই রকম বাস্তব-সম্মত জ্ঞান দিতে দেখার পরও সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টকে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টের সমান মর্যাদা দিতে অনেকে নারাজ। তাঁদের মতে সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সত্যিকার প্রকৃতির একটি অন্যরকম ব্যবধান আছে সাধারণ এক্সপেরিমেন্টে যেটি নেই। সাধারণ এক্সপেরিমেন্ট হবহু প্রকৃতির মত না হলেও সেটি প্রকৃতির মতই 'বাস্তব', কিন্তু সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট বাস্তবের ডিজিট্যাল অনুকরণ মাত্র, বাস্তব নয়। অনেকটা এরকম ভাবনা থেকেই কেউ কেউ সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টকে 'মনে মনে করা এক্সপেরিমেন্টের' সমতুল্য বলে মনে করেছেন— যেই সব এক্সপেরিমেন্ট বিজ্ঞানীরা সত্যি সত্যি হাতেকলমে করেননা কিন্তু এর সবগুলো পর্যায় মনে মনে ভেবে কিছু যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। ওগুলোতে যেমন এক্সপেরিমেন্ট না করেই এক্সপেরিমেন্টের কিছু ফল পাওয়া যায়, তাঁদের মতে সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টও তাই।

সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট কি মনে মনে করা এক্সপেরিমেন্টের মতঃ

সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট ঠিক সত্যিকার অর্থে এক্সপেরিমেন্ট নয়, বরং আলাদা কিছু এমন ধারণা থেকে কেউ কেউ বোঝার চেষ্টা করছিলেন এটি কী ভাবে আলাদা। জ্ঞানের রাজ্যে এর আসল ভূমিকাটিই বা কী ধরণের? এটি বুঝতে গিয়ে তাঁদের কাছে 'মনে মনে করা এক্সপেরিমেন্টের' (থট্ এক্সপেরিমেন্ট) কথা স্মরণে এসেছে। বিজ্ঞানে এ ধরণের এক্সপেরিমেন্ট কম হয়না, বিজ্ঞানের সারা ইতিহাস জুড়েই এগুলো হয়েছে; কোন কোনটি দারুণ খ্যাতিও পেয়েছে। যখনই বিজ্ঞানীর পক্ষে কোন এক্সপেরিমেন্ট সত্যি সত্যি করা প্রযুক্তিগত ভাবে বা অন্য কোন কারণে সম্ভব নয় বলে মনে হয়েছে তখন তিনি এরকম মনে মনে এক্সপেরিমেন্টের শরণাপন্ন হয়েছেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে। এতে এক্সপেরিমেন্টের নানা আয়োজন থাকে, নানা পর্যায়ে করণীয়গুলো থাকা, ফলে কী পাওয়া গেলো সেই ফলাফল থাকে, এরকম ফল থেকে কী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত টানা যায় তাও থাকে। শুধু পার্থক্য হলো এগুলোর কিছুই সত্যি সত্যি বাস্তব স্থানে থাকে না, এর কিছুই সত্যি সত্যি করাও হয়না; সবই থাকে বিজ্ঞানীর মাথার মধ্যে তাঁর চিন্তায়। এজন্যই এটি মনে মনে করা এক্সপেরিমেন্ট।

তাই বলে বিজ্ঞানী ইচ্ছে করলেই এই এক্সপেরিমেন্টকে মনে মনে যেদিকে চাইবেন সেদিকে গড়াতে দিতে পারেন না। এক্সপেরিমেন্টের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেই করতে হয়— যুক্তিই একে সুনির্দিষ্ট ফল আর সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। এরকম বাস্তবতা-বিহীন শুধু যুক্তিতে এগিয়ে যাওয়া এক্সপেরিমেন্ট করার বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। কেউ কেউ এটি করেছেন তাঁদের দেয়া কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা বা তত্ত্বের পেছনে যুক্তি যোগাতে, একে আরো অকাট্য করে তুলতে। কোন প্রচলিত তত্ত্বের বা ধারণায় অসঙ্গতি ধরিয়ে দেয়ার জন্যও এটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কেউ কেউ তাঁদের আবিষ্কারের মূল প্রেরণা পেয়েছেন এরকম মনে মনে এক্সপেরিমেন্ট করার মাধ্যমে। সাম্প্রতিক কালে স্বয়ং আইনস্টাইন তাঁদের একজন। তাঁর একটি মনে মনে এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে মহাশূন্যে সুদূর অজানা জায়গায় একটি কাল্পনিক লিফ্টের মধ্যে একজন কাল্পনিক আরোহীর কাল্পনিক অভিজ্ঞতা আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের পেছনে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। এমন আরো কিছুতে মনে মনে এক্সপেরিমেন্টের সহায়তা তিনি নিয়েছেন।

আমরা কিন্তু এখানে বিজ্ঞানের আরো পুরানো ইতিহাস থেকে এরকম দুটি উদাহরণ তুলে ধরবো যা এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে ইতোমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। ১০০০ খৃস্টাব্দের দিকে ইবনে সিনা গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের আদি এটমিক থিওরির বড় সমালোচক ছিলেন— যে থিওরি ইবনে সিনারও দেড় হাজার বছর আগের। ডেমোক্রিটাসের সমসাময়িক সমালোচকরাই বলতেন

তিনি যে এটমকে একদিকে অবিভাজ্য মনে করেছেন আবার অন্যদিকে এর আকৃতি আছে বলেছেন— এই দুই পরস্পর-বিরোধী কথা। আকৃতি থাকলে একাধিক তল থাকবে, আর এই তলগুলোকে আলাদা করে তার বিভাজনও করা যাবে। এর উত্তরে এটমিস্টরা বলেছেন এটমের আসলে একটিই তল, কাজেই তা অবিভাজ্য। ইবনে সিনা একটি মনে মনে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখালেন যে কোন কিছুরই একটি তল সম্ভব নয়। তাঁর কথা মত আমি যদি আমার আর সূর্যের মাঝখানে একটি অতি পাতলা পাত রাখি, এই পাতের অন্তত দুটি তল থাকবে— একটি সূর্যের দিকে যেটি আলোকিত, আরেকটি আমার দিকে যেটি আলোকিত নয়। যদি কেউ বলেন যে পাতটি এত পাতলা যে এর একটিই তল তা হলে যে তল সূর্যের দিকে সেটি আবার আমার দিকেও হবে— সেটি সম্ভব নয়। এই মনে মনে এক্সপেরিমেন্টটি ইবনে সিনা করেছেন একটি প্রাচীন ধারণার মধ্যে অসঙ্গতি দেখাতে।

মনে মনে এক্সপেরিমেন্টের দ্বিতীয় উদাহরণটির খুঁটিনাটি অনেক বেশি— রীতিমত সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের মতই। ইবনে সিনার আরো প্রায় পাঁচ শ' বছর পর গ্যালিলিও এটি করেছিলেন। তখন পর্যন্ত প্রায় দু'হাজার বছর ধরে চলে আসা এরিস্টোটলের গতি তত্ত্বের ধারণা অপরিবর্তিত ছিল। এই তত্ত্ব বলে যতক্ষণ কোন বস্তুকে ঠেলা হয় ততক্ষণই শুধু এটি চলে, ঠেলা বন্ধ হলে চলা বন্ধ হয়ে যায়। গ্যালিলিও এই মনে মনে এক্সপেরিমেন্টটি করে দেখিয়ে ছিলেন যে এই সঠিক নয়— একবার চলতে আরম্ভ করলে কোন বস্তু চলতেই থাকে চিরকাল।

গ্যালিলিওর পক্ষে সত্যিকার বাস্তব এক্সপেরিমেন্ট করে তাঁর নতুন তত্ত্ব প্রমাণ করা সম্ভব ছিলনা। কারণ বাস্তব প্রকৃতিতে চলন্ত বস্তু ঘর্ষণে থেমে যায়। তাই তিনি মনে মনে করা এক্সপেরিমেন্টের সাহায্য নিলেন। এতে মনে মনে তিনি দুটি তেরচা করা খাড়া মসৃণ ঢালু তল কল্পনা করেছেন। একটির গায়ের ওপর দিয়ে একটি বল গড়িয়ে নিচে পড়ে লাফিয়ে ওঠে এবং অন্যটির গা বেয়ে ওপরে ওঠে। গ্যালিলিও কল্পনা করলেন সে তল দুটি অসীম ভাবে মসৃণ— এতে কোন ঘর্ষণ নেই, আর বলটির স্থিতিস্থাপকতাও একেবারে নিখুঁত। তাই যত উঁচু থেকে পড়া, তত উঁচুতেই ওঠা। মনে মনেই যখন এক্সপেরিমেন্ট তাই ওভাবে নিখুঁত করে ভেবে নিতে অসুবিধা ছিলনা, বাস্তব এক্সপেরিমেন্টে যা সম্ভব হতো না। এবার দ্বিতীয় তলটিকে একটু একটু করে যতই ঢালু করা হবে নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠতে বলটিকে ততই দূরে যেতে হবে। তলটির অসীম দৈর্ঘ কল্পনা করে সেটিকে যদি একেবারে ভূমিতে শুইয়ে দেয়া হয় তা হলে ওই একই উচ্চতায় উঠতে তাকে অসীম দূরত্বে চলে যেতে হবে; অর্থাৎ অসীম ভাবে চলতেই থাকবে। এমনি ভাবে গ্যালিলিও আধুনিক গতিতত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তী কালে এক্সপেরিমেন্টের জায়গাটি বায়ুশূন্য করে, এতে

চলাচলের পথকে যথাসম্ভব মসৃণ করে সাধারণ বাস্তব এক্সপেরিমেন্টেও এর কাছাকাছি ব্যাপারটি দেখা গেছে— কিন্তু মনে মনে এক্সপেরিমেন্টের মত এতো নিখুঁত ভাবে নয়।

যাঁরা সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টকে মনে মনে করা এক্সপেরিমেন্টের সমতুল্য মনে করেছেন তাঁদের কাছে উভয়ের মধ্যে মিল একটিই— এর কোনটাই আসল এক্সপেরিমেন্ট নয়; এর কোনটিই তত্ত্বকে আসল এক্সপেরিমেন্টের মত প্রমাণ করতে পারে না, প্রমাণে সাহায্য করতে পারে মাত্র। এটি তাঁদের ধারণা; কিন্তু আসলে সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট আর মনে মনে করা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে— এ পার্থক্য উভয়ের সৃষ্ট জ্ঞানের চরিত্রের মধ্যেই। বড় পার্থক্যটি হলো মনে মনে এক্সপেরিমেন্টের প্রত্যেকটি পর্যায় আমরা মাথায় ধারণ করছি, তাই এর সবকিছু আমরা মাথায় খেলাচ্ছি এবং তা আমাদের বোধের মধ্যে আসছে। এর আগাগোড়া আমাদের কাছে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। এই প্রাঞ্জলতাটির মধ্যেই এই ধরণের এক্সপেরিমেন্টের কার্যকারিতা নিহিত রয়েছে, যার কারণে আমরা এর দ্বারা কোন অনুমানকে পরীক্ষা করতে পারি বা কোন ধারণার অসঙ্গতি ধরিয়ে দিতে পারি। এতে অনেকটা অংকের এক একটি ধাপের মত প্রত্যেক পর্যায়ে কিসের থেকে কী হচ্ছে তা আমরা ধরিয়ে দিতে পারি— সেজন্যই ওই সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারি, কোন বাস্তবতা না থাকা সত্ত্বেও। সাধারণ বাস্তব এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে এই বিশেষ গুণটি বা কার্যকারিতাটি নেই। একই ভাবে সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টেও তা নেই।

সাধারণ এক্সপেরিমেন্টে পরীক্ষণ-পাত্রের মধ্যে, যন্ত্রপাতির মধ্যে, এক্সপেরিমেন্ট-বস্তুর মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে কী হচ্ছে তার সব আমাদের দৃষ্টিতে বা বোধশক্তিতে আসেনা। আমরা এসবের মধ্যে ঢুকতে পারিনা— শুধু ফলাফলগুলোই আমাদের কাছে আসে। শুধু তাই নয় মাঝপথটি অগম্য থাকে বলে এই ফলাফল অনেকটা ম্যাজিকের মত 'সারপ্রাইজ' হিসেবে হঠাৎ দেখা দেয়— তা প্রত্যাশিতই হোক আর অপ্রত্যাশিতই হোক। সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টেও ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটে। কম্পিউটার যখন সফ্‌টওয়্যার নিয়ে কাজ করে তাতে প্রতি মুহূর্তে কী প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে তা আমাদের একেবারেই অগম্য— সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের চেয়েও বেশি অগম্য। কাজেই এদিক থেকে সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট বরং সাধারণ এক্সপেরিমেন্টের সমতুল্য, মনে মনে করা এক্সপেরিমেন্টের নয়।

সাধারণ এক্সপেরিমেন্ট এবং সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট উভয়েই এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে যে সব তত্ত্ব ব্যবহৃত হয় তার অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান সৃষ্টি করে— প্রকৃতির লক্ষ্যবস্তু-ঘটনার সম্পর্কে সেই নতুন জ্ঞান। মনে মনে করা এক্সপেরিমেন্টের সেই সুযোগ নেই। মনে মনে এক্সপেরিমেন্ট থেকে যে সিদ্ধান্তগুলোতে পৌঁছানো যায় তা কোন এক ভাবে এর তত্ত্বেই দেয়া ছিলো—

সেগুলোকে প্রাঞ্জল করা হয় মাত্র। এদিক থেকে সাধারণ এক্সপেরিমেন্টে ও সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টের একই রকম কাজ, একই রকম ক্ষমতা, প্রকৃতি সম্পর্কে একই রকম নতুন জ্ঞান আবিষ্কার। উভয়েই প্রকৃতির মডেল ব্যবহার করে, সেই মডেলে যা থাকে তার থেকে অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান প্রকৃতি সম্পর্কে বের করে। এসব মনে মনে করা এক্সপেরিমেন্টে সম্ভব নয়।

আমরা আগেই দেখেছি সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট গাণিতিক ও এজেন্ট ভিত্তিক এই দুই রকমের হতে পারে। গাণিতিক সিম্যুলেশন প্রকৃতি সম্পর্কে তত্ত্বের সমীকরণ থেকে আসে। এজেন্ট ভিত্তিক ক্ষেত্রে মডেলটি নিজেই সিম্যুলেশন সৃষ্টি করে। প্রথমে এই শেষেরটির একটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক নতুন জ্ঞান কেমন করে সৃষ্টি হচ্ছে।

জীববিবর্তন সংক্রান্ত সিম্যুলেশনে একটি প্রজাতিকে এজেন্ট করে মডেল তৈরি হয় আর সিম্যুলেশন হয় সেটি নিয়েই। তাতে লক্ষ্যণীয় হলো এই নির্দিষ্ট প্রজাতিটি নানা নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে বিবর্তনে নতুন কী কী প্রজাতি সৃষ্টি করে তা দেখা। মডেলটির মধ্যে বিবর্তনের ফলে যা সৃষ্টি হবে তার কোন আভাস দেয়া থাকে না। শুধু থাকে ওই প্রজাতিকে তাৎক্ষণিক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার হবে তার শর্তাবলী এবং ওই প্রজাতির দলের নানা সদস্যদের মধ্যে এ নিয়ে যা ক্রিয়া-বিক্রিয়া হতে পারে তার নিয়ম-কানুন— যেমন নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা, অনাত্মীয়দের সঙ্গে অন্য রকম বা কম সহযোগিতা, বংশবৃদ্ধির নিয়ম ইত্যাদি। বিবর্তনের কোন নিয়ম কিন্তু মডেলে দেয়া থাকে না। কিন্তু যেহেতু বিশেষ প্রকৃতি-পরিবেশে প্রজাতিটির আচরণ দেয়া থাকে সিম্যুলেশনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ওই বিবর্তন প্রক্রিয়াটিই এখানে বিকশিত হতে আরম্ভ করে। মধ্যবর্তী ধাপগুলো আমাদের কাছে অগম্য হলেও শিগ্‌গির এর ফলাফল হিসেবে বিবর্তনটি স্পষ্ট হয় এবং নতুন নতুন প্রজাতি (কম্পিউটার জগতের ভার্চুয়াল প্রজাতি) সৃষ্টি হয়। এই জ্ঞান কিন্তু মডেলের ভেতরে ছিলনা— এটি নতুন জ্ঞান; বিবর্তন নিয়ে সাধারণ এক্সপেরিমেন্ট করলে যে জ্ঞান সৃষ্টি হতো ঠিক সে রকম জ্ঞান। কিন্তু জীব বিবর্তনের ক্ষেত্রে সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট করা যত সহজ সাধারণ এক্সপেরিমেন্ট করা মোটেই তা নয়। কারণ সাধারণ এক্সপেরিমেন্টে এতে জীবের যে বহু প্রজন্ম প্রয়োজন তার জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ সময় দরকার, অথচ কম্পিউটারে তা খুবই সামান্য সময়ে ঘটতে পারে।

গাণিতিক সমীকরণ ভিত্তিক সিম্যুলেশনে প্রক্রিয়াগুলো সমীকরণের মধ্যে ঘটে। এখানে সিম্যুলেশন সমীকরণগুলোকে দ্রুত সমাধান করে, একের সমাধান অন্যটাতে ঢুকায়, এমন কি আগের সমীকরণের ফলাফল অনুসারে পরের সমীকরণকে সম্পূর্ণ বদলেও দিতে পারে। কাজেই সিম্যুলেশনের ফলে মূল মডেলের বর্ণনামূলক সমীকরণগুলোই যে শুধু কাজ করতে থাকবে তা নয়,

নিজেই নিজের মত একটি গতি (ডাইনামিক) পেয়ে এই সিম্যুলেশন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে। বাস্তব এক্সপেরিমেন্টেও এমনি ভাবেই মূল মডেলের বাইরে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হয়। সাধারণ গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে আমরা যে রকম তার থেকে নানা প্রশ্নের উত্তর যৌক্তিক ভাবে পাই তার সঙ্গে সিম্যুলেশনের পার্থক্য রয়েছে। একটি পার্থক্য হলো সিম্যুলেশন মডেল গতিশীল মডেল— যে নিজস্ব একটি গতি সৃষ্টি করে বিকশিত হয়, শুধু মূল মডেলের ব্যাখ্যা করেনা। অন্য পার্থক্যটি হলো সাধারণ গাণিতিক মডেলের সমীকরণকে আমরা নিজে ভেবে বিশ্লেষণ করে সমাধানের মাধ্যমে যেভাবে অনুসরণ করতে পারি সিম্যুলেশনের কাজকে তা পারিনা— যেটি আমাদের অগোচরে কম্পিউটারেই ঘটে। এই উভয় বৈশিষ্টই আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি এবং এগুলোই সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্টকে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টের মত করে তুলেছে, নেহাৎ আর দশটা মডেল ব্যবহারের মত করে নয়।

সাধারণ এক্সপেরিমেন্টে কিছু কিছু কাজ অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়বহুল হয়; অনেক ক্ষেত্রে আদৌ করা যায়না। তাই প্রায়শই অতি ব্যয়বহুল ও জটিল এক্সপেরিমেন্ট বাস্তবে করার আগে সিম্যুলেশনে করা হয়। যেমন অত্যন্ত ব্যয় বহুল যন্ত্র জেনেভায় থাকা কণিকা ত্বরক 'লার্জ হেড্রন কলাইডারে' এক একটি এক্সপেরিমেন্ট অত্যন্ত আয়োজন-সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়াতে প্রাথমিক ভাবে এর অনেক এক্সপেরিমেন্ট সিম্যুলেশনে করা হয়েছে। এই উভয়ের সংমিশ্রণে কাজ করতে পারলে বিজ্ঞানী সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে সিম্যুলেশনে যদি এতটাই করা যাবে তা হলে আদৌ এত ঝামেলা করে বাস্তব এক্সপেরিমেন্ট করা কেন? সিম্যুলেশনের সকল বাস্তব সদৃশতা সত্ত্বেও সেটি যে বাস্তব নয় এ কথাটি আমাদের মনের গহীনে রয়েছে বলেই হয়তো বিজ্ঞানী সব সময় সাধারণ বাস্তব এক্সপেরিমেন্টকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন— যেখানে সেটি সম্ভব। বাস্তবিক এক্সপেরিমেন্ট করা, সেখানে বাস্তবিক সব ত্রুটি ঘটবার সম্ভাবনা নিরূপণ, সেই ত্রুটিকে ন্যূনতম রাখার কাজে সাফল্য, এই সব কিছু বিজ্ঞানী তাঁর কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসও এই বাস্তবতাকে সবার ওপরে গুরুত্ব দিয়েছে। অত্যন্ত উচ্চমানের সিম্যুলেশন এক্সপেরিমেন্ট করতে পারা সত্ত্বেও ইতিহাসের সৃষ্ট এই পক্ষপাতিত্ব মুছে ফেলা বিজ্ঞানীর পক্ষে কঠিন।

গণিত জিনিসটাও বা কী

একটানে গণিতের কিছু ইতিহাস

আমরা দেখেছি যেখানেই সম্ভব বিজ্ঞান গণিতের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে চায়। প্রকৃতির জটিলতাকে গণিতের সারল্যে বাঁধার চেষ্টাটি বিজ্ঞানের একটি কৌশল— যা ম্যাজিকের মত কাজ করেছে। এ কারণে বিজ্ঞানের অনেক অংশকে এখন গণিতের থেকে আলাদাভাবে চেনাই দায় হয়। অথচ বিজ্ঞান আর গণিত সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়, এমনকি বলতে গেলে এরা একই জগতের বিষয়ই নয়। তা সত্ত্বেও এরা দুইই কী করে প্রকৃতির ঘটনার একই রকম ব্যাখ্যা দেয় সেটি একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা। এটি কেমন ভাবে সম্ভব হলো তা বোঝার জন্য গণিতের ভাবসাবটিও আমাদের একটু জানা দরকার, এই অধ্যায়ে আমরা সেই চেষ্টাটুকু করবো। পরের অধ্যায়ে দেখার চেষ্টা করবো বিজ্ঞানের থেকে গণিত এত ভিন্ন হয়েও কীভাবে সেটি বিজ্ঞানের কথা বলে। এজন্য শুরুতে একটানে গণিতের কিছু ইতিহাস দেখা যাক।

অনেক প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে দেখা গেছে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কালেও মানুষ এক ভাবে গণিতের চর্চা করেছে। সেই সব অবশ্য প্রধানত বাস্তব কাজে— গোণা-গুণতিতে, দিনের সময় নির্ধারণে, বা নিজেদের নির্মাণ ও স্থাপত্য কাজে সুসমতা আনতে গিয়ে। তখনকার বাস্তবতার কাজের এসব নমুনায় কিছু লেখাজোকা নেই বলে এদের পেছনে গণিত-চিন্তাগুলো কী রকমের ছিল তা জানা মুশকিল। তাই প্রাগৈতিহাসিক এসব গণিতকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে সৃষ্ট 'প্রাক্‌গণিত' বলাটাই সঙ্গত। গণিত বলতে আমরা যা বুঝি তার রূপটি এর চেয়ে অনেক বেশি বিমূর্ত, কোন নির্দিষ্ট কিছুর সঙ্গে তা আবদ্ধ নয়। কিন্তু নেহাৎ ব্যবহারিক ওই প্রাকগণিত থেকেই মানুষের মাথায় এই বিমূর্ত গণিতের উদ্ভব হয়েছে তা অনেকটাই নিসন্দেহ।

বিমূর্ত গণিতের ধারণাগুলো সবার আগে কখন কীভাবে এসেছিলো তা জানতে গণিতের ওপর তখনকার লেখাজোকার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। হাজার চারেক বছর আগে যখন মানুষের প্রথম লিপি উদ্ভাবন ও ব্যবহার বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে তখন থেকেই আমরা গণিত সম্পর্কেও প্রচুর লেখাজোকা পাচ্ছি। এই লিপি যেখানে এসেছিলো সেই প্রাচীন ইরাকের ব্যবিলনে, কিংবা প্রাচীন মিশরেই আমরা এমন গণিতের প্রথম বিস্তারিত উল্লেখ

দেখতে পাচ্ছি। মিশরের হাইরোগ্লীফিক লিপি লেখা হতো বেতের মত গাছের ছিলকা জুড়ে জুড়ে তৈরি প্যাপিরাসের ওপর, আর ব্যাবিলনের কিউনিফর্ম লিপি ছোট ছোট কাদার পাটার ওপর তীর চিহ্নের সীল মেরে মেরে। এমনিতরো মাধ্যমে লেখা লিপির ভাষ্যে ফুটে ওঠেছে চার হাজার বছর আগে থেকে মানুষের অপূর্ব সৃষ্টি বিমূর্ত গণিতের নানান্ কিছু।

সেখানেও ব্যবহারিক গণিতের উৎসাহটি খুব বড় ছিল— বিশেষ করে নির্মাণ, স্থাপনা ইত্যাদির কাজের একটি বড় তাগিদ এর পেছনে ছিল, যেমন মিশরে পিরামিড তৈরিতে। কিন্তু বিমূর্ততাই ছিল গণিতের প্রাণ। ব্যবহারটি বড় তাগিদ ছিল বটে কিন্তু সেই ব্যবহারের জন্যই গণিতকে ইতোমধ্যে বাস্তব জগতের বাইরে একটি স্বাধীন সত্তায় রূপ দেয়া হয়েছিল— এটিই ছিল গণিতের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় ঘটনা। উদাহরণ স্বরূপ সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে ছোট ছোট সংখ্যার দুটি হরিণ, তিনটি পাথর, পাঁচটি গাছ এমনিতরো নানা সংখ্যায় নানা বস্তুকে চিনতে হয়েছে। সেখানে দুটি হরিণ আর দুটি পাথরের মধ্যে কোন রকমের কোন সাধারণ ধারণা তারা দেখতে পায়নি— উভয়েই সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার প্রথমটি হরিণের একটি বিশেষণ, দ্বিতীয়টি পাথরের একটি বিশেষণ। কিন্তু এক সময় যেদিন ওই গণনা থেকে হরিণ, পাথর, গাছ ইত্যাদিকে ঝেড়ে ফেলে শুধু এক, দুই, তিনকে স্বাভাবিক সংখ্যার স্বাধীন বিমূর্ত প্রকাশ হিসেবে নিয়ে সংখ্যা-ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে— সেদিনকেই বলা যায় আসল গণিতের জন্ম।

ওই সংখ্যা-ব্যবস্থা কালক্রমে পাটিগণিতের নানা নিয়মে রূপ পেয়েছে। এ যেন সংখ্যা নিজেই নিজের মত করে এক রকম ডানা মেলেছে। একবার ডানা মেলার পর তাকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। সংখ্যার এ ডানায় ভর করে বাস্তব সব জিনিসের গাণিতিক রূপ দিতে দেরী হলোনা— যে সব বাস্তব জিনিস আকাশ পর্যবেক্ষণে লাগে, কৃষির সেচের জন্য বন্যার আগাম খবর দিতে লাগে, ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা তৈরিতে লাগে। বিজ্ঞানের যে গাণিতিক মডেলের কথা বলেছি তার কাজ এভাবে তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিলো। ওই বাস্তব জগতের কোণ, ক্ষেত্র, ঘন-বস্তু ইত্যাদির ধারণাও বিমূর্ত রূপ পেলো জ্যামিতির বিন্দুতে, রেখায়, কোণে, ক্ষেত্রে, ঘন-আয়তনে। এক পর্যায়ে ব্যাবিলনের গণিতবিদরা জানা মানের সংখ্যার সঙ্গে অজানা মানের সংখ্যা মেশালেন তাকে মানবিহীন কোন চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করে। এই জানা-অজানা রাশি-সমীকরণের সমাধান করে অজানা মান কেমন করে পাওয়া যায় তার মোটা দাগের কিছু নিয়মও বের হয়ে গেলো— যাকে এ্যালজেব্রার পূর্বাভাস বলা যায়।

ব্যাবিলনে ও মিশরে ওই নানা রকম গণিতের ফলগুলো অবশ্য এসেছিলো কিছুটা এগুলো নিয়ে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে এবং কিছুটা গাণিতিক অন্তর্দৃষ্টি থেকে। অনেক পরবর্তীকালে গাণিতিক যুক্তি-চিন্তায় পর পর পদক্ষেপে

গণিতের থিওরেমগুলো যেভাবে গড়ে তোলা হয়েছিলো এ ঠিক সে রকম ছিলনা। করতে করতে অভিজ্ঞতাই সেদিনের ফলাফল পেতে সাহায্য করেছে। এসব একদিনে গড়ে ওঠেনি— অন্তত হাজার দুয়েক বছর ধরে ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় গণিতবিদের অভিজ্ঞতা এগুলো সৃষ্টি করেছিলো এবং ক্রমাগত উন্নত করেছিলো। যেমন এদের মধ্যে ত্রিকোণমিতির অনুপাতগুলোর মানের সারণিও পাওয়া গেছে। এভাবেই নানা সংখ্যার বর্গমূল, ঘনমূল বের করার; বৃত্ত, ত্রিভূজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার; কিউব, পিরামিড ইত্যাদির মতো ঘন আকৃতির আয়তন বের করার; বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত সেই অদ্ভুত সংখ্যা 'পাইয়ের' মানের বেশ ভাল একটি আসন্ন রূপ পাওয়ার তাঁদের কাছে ফরমুলা ছিল। এর বেশির ভাগের পেছনেই কিন্তু যুক্তির নিয়ম বড় একটা তখন ছিলনা— কিন্তু কাজ চালাবার মত নিখুঁত গণিতের সক্ষমতা ছিল। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। পরবর্তীকালে জ্যামিতির পিথাগোরাসের থিওরেম যুক্তিতে প্রমাণ করে সবাই জেনেছে যে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভূজের ওপর অংকিত বর্গক্ষেত্র অন্য দুই বাহুর ওপর অংকিত বর্গক্ষেত্র দুটির যোগফলের সমান। কিন্তু প্রাচীন মিশরীয় গণিতবিদরা অভিজ্ঞতা থেকেই জানতেন যে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু দুটি যদি ৩ ও ৪ একক লম্বা হয় তা হলে অতিভূজ হবে ৫ একক লম্বা। এখন আমরা পিথাগোরাসের থিওরেম থেকে এই ফল পাই। সাধারণ ভাবে থিওরেমটি না জানলেও তাঁরা ৩,৪,৫ এই ত্রয়ীয় মধ্যে সম্পর্কটি বের করে ফেলেছিলেন এবং তা পিরামিডের ভূমি তৈরির ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন।

বোঝা যাচ্ছে গণিতের অনেক ধারণার উন্মেষগুলো মিশরীয় আর ব্যাবিলনীয়দের দীর্ঘ হাজার হাজার বছরের চর্চার অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে আর আজ থেকে হাজার তিনেক বছর আগে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রীসে, ভারতে ও অন্যান্য জায়গার এমনিতরো গণিতচর্চার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো। এর পরে পরে অবশ্য প্রাচীন গ্রীসে দেখা গিয়েছে গণিতচর্চার সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু ধরণ-ধারণ। এর কারণ ব্যবহারিক প্রয়োগের উর্ধ্বে গিয়ে তাঁদের ছিলো একরকম দার্শনিক মন। শুধু অভিজ্ঞতায় পাওয়া ফরমুলা বা সারণি দেখে ব্যবহারিক কাজে লাগানো গণিতে তাঁদের মন ভরেনি— বরং তাঁরা গণিতকে বিশ্লেষণের চোখে দেখতে চেয়েছেন, যুক্তির ওপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। সংখ্যা নিয়ে, এ্যালজেব্রা নিয়ে এই বিশ্লেষণের দারুণ চেষ্টা তাঁদের মধ্যে ছিল বটে, কিন্তু সেটি করতে গিয়ে শুরুতেই কিছু বড় ধাক্কা খেতে হয়েছে। ওই যুক্তি প্রয়োগেই তাঁদের মধ্যে দার্শনিক জেনো দেখালেন যে কোন গতি বা পরিবর্তনকে অংকে ধারণ করতে গেলে অসীম সংখ্যার মত বেঢক জিনিস নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হয় যা নেহাত প্যারাডক্সই সৃষ্টি করতে পারে। আবার পিথাগোরাসের অনুসারীরা দেখলেন দুইয়ের বর্গমূল $\sqrt{2}$ এমন এক

অদ্ভুত অমূলদ সংখ্যা থাকে স্বাভাবিক সংখ্যার ধারাবাহিকতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়না— এটি নিত্যন্তই অযৌক্তিক (ইর‍্যাশনাল)। এমন বেশ কিছু অযৌক্তিক সংখ্যার দেখা মিল্‌লো যাদের বাস্তব জ্যামিতিক অস্থিত্ব রয়েছে অথচ সংখ্যা ব্যবস্থায় যারা স্বাভাবিক নয়। যুক্তিপ্রিয় গ্রীকরা তাই পাটিগণিত বা এ্যালজেব্রার থেকে জ্যামিতির দিকেই ঝুঁকছেন বেশি। তাঁদের প্রভাবে মূলস্রোত গণিতেও এই ঝোঁক হাজার হাজার বছর বজায় থেকেছে।

গ্রীকদের গণিত-প্রতিভা জ্যামিতিকে অসম্ভব সৌকর্যে নিয়ে গিয়েছে। নিজে নিজে স্পষ্ট এমন অল্প কিছু স্বতসিদ্ধকে প্রমাণহীন ভাবে মেনে নেবার পর তাঁরা শুধু গাণিতিক যুক্তিতে একের পর এক অকাট্য ভাবে থিওরেম বা উপপাদ্য গুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রমাণ করার এই যে অনিবার্যতা যা আধুনিক গণিতের বড় গুণ— তা গ্রীকরাই এভাবে শুরু করেছিলেন। স্কুলের জ্যামিতিতে আমরা বিখ্যাত গ্রীক গণিতবিদ ইউক্লিডের নানা থিওরেমের প্রমাণেরই পুনরাবৃত্তি করেছি। গ্রীকরা সেই দু'হাজার বছর আগের যুগে এই জ্যামিতি ব্যবহার করে এক জায়গায় বসে পৃথিবীর পরিধি নিখুঁতভাবে মাপার মত কাজ করতে পেরেছেন!

গ্রীক গণিতের স্বর্ণযুগের শেষের দিকটায় বৃত্ত কিংবা যে কোন রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ জায়গার ক্ষেত্রফল কিংবা গোলক ইত্যাদির ঘন আয়তন বের করার এক অদ্ভুত কৌশল তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ফালির যে ক্ষেত্রফল সেগুলোকে ক্রমাগত যোগ করে করে এই পুরো ক্ষেত্রফল বের করাটাই ছিল সেই কৌশল যা দেড় হাজার বছর পর ইনটেগ্রাল ক্যলকুলাসে রূপ পেয়েছিলো। এমনি ভাবে পরবর্তী আধুনিক গণিতের অনেক আভাস আমরা প্রাচীন মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং গ্রীক গণিতের মধ্যেই পেয়ে গেছি।

এর কিছু কিছু আরো অনেক উন্নত নতুন রূপ লাভ করেছে পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দীর ভারতীয় গণিতবিদদের হাতে। বিশেষ করে সংখ্যা-ব্যবস্থার দশ ভিত্তিক পদ্ধতিতে শূন্যের যোগ করে তাঁরা পাটিগণিতে বিপ্লব এনেছিলেন। আজ দুনিয়ার সর্বত্র যে সংখ্যা ব্যবস্থা তা তাঁদেরই অবদান। এ্যালজেব্রা এবং ত্রিকোণমিতিও তাঁদের হাতেই সত্যিকার পূর্ণতা পেয়েছিলো। আরো কিছু পরে ইসলামী গণিতবিদরা এর প্রত্যেক কিছুকেই— সংখ্যা-ব্যবস্থা, এ্যালজেব্রা, ত্রিকোণমিতি— অনেকটা আধুনিক পর্যায়েই নিয়ে এসেছেন, যাঁদের থেকে শেষ মধ্যযুগের ইউরোপীয় গণিতবিদরা এসব পেয়েছেন। আলোকবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার মত বিষয়কে সম্পূর্ণ গাণিতিক বিশ্লেষণ নির্ভর করে এ্যালজেব্রায় ও ত্রিকোণমিতিতে প্রকাশের কৃতিত্বও এই ইসলামী গণিতবিদদের। এ্যালজেব্রার সমীকরণ সমাধানে ও অন্যান্য গাণিতিক সমীকরণে নিয়মবদ্ধ ধাপে ধাপে এগুনোকে আজও যে আলগরিদম বলা হয় তা আদি ইসলামী জগতের গণিতের একজন মুখ্য নায়ক আলখারেজেমীর নামের ইউরোপীয় অপভ্রংশ থেকেই এসেছে।

গণিতের এর পরবর্তী অগ্রগতি রেনেঁষা ও তার পরবর্তী যুগের ইউরোপে। ১৬ শতকের গণিতে ফাংশান জিনিসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একটি রাশি যদি অন্য একটি রাশির ওপর কোন গাণিতিক সম্পর্কের কারণে নির্ভরশীল হয় তাহলে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির ফাংশান বলা যায়। এতে দ্বিতীয়টির মান বদলালে প্রথমটির মানও বদলায়। দ্বিতীয়টির মান খুব ক্ষুদ্র পরিমাণে বদলালে তাতে প্রথমটির মানও যদি অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে বদলায় তা হলে ফাংশানটিকে একেবারে নিরবিচ্ছিন্ন ধরে নেয়া যায়। এই ফাংশানের সম্পর্কের মধ্যে পাটিগণিত, এ্যালজেব্রা, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতির সব কিছু থাকতে পারে যা একভাবে গণিতে এই সব শাখাকে একীভূত করে। এটি আবার বিজ্ঞানসহ বাস্তব জীবনের নানা ঘটনার গাণিতিক মডেলিং করার সুযোগ অনেক বাড়িয়ে দেয়। আর একবার সেটি করা গেলে তারপর আমাদের কাজ ওই এ্যালজেব্রা, পাটিগণিত বা ত্রিকোণমিতির নিজস্ব নিয়মেই এগোতে পারে— শেষ পর্যন্ত বাস্তব জগতের সন্ধান দিয়ে। নানা শাখার একীভূত এই কাজগুলো করতে গিয়ে গণিতে নতুন নতুন সম্পর্কের আবিষ্কার ঘটলো— লগারিদম, এক্সপোনেন্‌শিয়াল, কম্‌প্লেক্স নাম্বার ইত্যাদি। এই কমপ্লেক্স নাম্বারটির কথাই যদি বলি মনে রাখতে হবে যে সমীকরণের সমাধানে ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলও এসে পড়ে। ঋণাত্মক সংখ্যার এরকম বর্গমূল গণিতের সাধারণ চিন্তায় কোন অর্থ বহন না করায় একে 'কাল্পনিক' বলে উড়িয়ে দেয়া হলো। কারণ বর্গমূল সব সময় একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক হয়, এবং বর্গ করলে উভয়ের ক্ষেত্রেই সাধারণ ধনাত্মক সংখ্যাই পাওয়া যায়। শুধু তাই বলি কেন প্রাচীন গ্রীক গণিতবিদদের এত উন্নতি সত্ত্বেও কিন্তু ঋণাত্মক সংখ্যা ভারতীয়দের আবিষ্কার। অথচ এই ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল হয়ে ওই অদ্ভুত 'কাল্পনিক সংখ্যা'ও অয়লার, গাউস প্রমুখ ১৭ শতকের অত্যন্ত প্রতিভাবান গণিতবিদের হাতে সোনা ফলিয়েছে— গণিতে প্রকৃত ও কাল্পনিক সংখ্যার সমন্বয়ে কমপ্লেক্স নাম্বারকে জায়গা করে দিয়ে। এই দুইজন সহ প্রতিভাবান গণিতবিদদের অনেকেই ছিলেন খুবই উচ্চ মানের বিজ্ঞানীও। এর ফলে তাঁদের হাতে গণিতের আবিষ্কার সমূহের সঙ্গে সঙ্গে তার বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক প্রয়োগও একই সঙ্গে বিকশিত হতে পেরেছিলো।

একাধারে গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথা বল্‌লে ওসময়ের যাঁর নাম সব চেয়ে বেশি সামনে আসে তিনি আইজ্যাক নিউটন। প্রাচীন গ্রীকদের সময় থেকে অনেক গণিতবিদকে দারুণ ভাবিয়েছে দুটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা। সমস্যা দুটি পরবর্তীকালে একটু একটু করে সমাধানের দিকে গিয়েছে। এর একটি হলো যেই বক্ররেখা কোন কিছুর গতির গ্রাফের মত, সেটির কোন একটি বিন্দুতে তার স্পর্শকটি কতখানি কাৎ হয়ে আছে সেই ঢাল্‌টি ঠিক ওইখানটিতে গতির

তাৎক্ষণিক বেগটি বলে দেবে— সেটি একটি মার্বেলের গতি হোক, কারো আয় বৃদ্ধির গতি হোক, কোন জনসংখ্যার বৃদ্ধিই হোক। সমস্যাটি হলো যে কোন বিন্দুতে সেই ঢালটি কীভাবে পাওয়া যাবে? অন্য সমস্যাটি হলো কোন বক্ররেখার দ্বারা সীমা নির্ধারিত স্থানের ক্ষেত্রফল বের করা। নিউটন এই দুই সমস্যার সমাধানকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে ক্যালকুলাস নামক দারুণ কার্যকর গণিতের সৃষ্টি করেছিলেন— যা তাঁর সমসাময়িক গণিতবিদ লাইবনিৎসও স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের কৌশলটি ছিল প্রথম সমস্যার সমাধানে ক্রমাগত ক্ষুদ্রতর অংশকে বিযোজন করে (ডিফারেনশিয়েশন) বা ডিফারেশিয়েট করে যা পাই তাকে ক্রমাগত সংযোজন বা ইন্টেগ্রেট করলে সেই ফাংশানই আবার ফেরৎ পাই— একটি অন্যটির বিপরীত প্রক্রিয়া। ওই যে ক্রমাগত ক্ষুদ্র অংশ তার আসল প্রকৃতিটি অবশ্য ধরা পড়তে আরো সময় লেগেছে। একেবারে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে গণিতবিদরা তা স্পষ্ট করতে পেরেছেন 'লিমিটের' ধারণা এনে— যার উদাহরণে দেখি একটি রাশি ক্রমাগত শূন্যের দিকে এগুচ্ছে, কিন্তু কখনো শূন্য পর্যন্ত পৌঁছছেনা। ক্যালকুলাস জিনিসটি গণিত ও বিজ্ঞানের চেহারা একেবারে বদলে দিয়েছে।

একটি রেখাকে (গ্রাফ) এ্যালজেব্রার সমীকরণ হিসেবে অর্থাৎ জ্যামিতিকে এ্যালজেব্রার ভাষায় প্রকাশ করা যে যায় তা ১০ শতকের পারসিক গণিতবিদ ওমর খৈয়াম (যাঁকে আমরা কবি হিসেবেই বেশি চিনি) প্রথম দেখিয়েছিলেন। একে আধুনিক রূপ দিয়েছেন ১৬ শতকের ইউরোপীয় গণিতবিদ দেকার্ত ও ফার্মা। এ্যালজেব্রার আদলে চলে আসতে এ্যালজেব্রার বিশ্লেষণমূলক (এ্যানালাইটিক) কৌশলগুলোতে ধরা দিয়ে জ্যামিতি আরো নতুন নতুন দিকে পাখা মেলতে পারলো। অন্যদিকে জ্যামিতির আদি ইউক্লীডিয় রূপের মূল ধারাকে অতিক্রম করে সমতলে সৃষ্ট জ্যামিতির বদলে বক্র তলের জ্যামিতি এলো অ-ইউক্লীডিয় জ্যামিতি রূপে। সঙ্গে সঙ্গে এর কোন বাস্তব বৈজ্ঞানিক অস্থিত্ব দেখতে না পাওয়া গেলেও গণিতবিদের কাছে এর অদ্ভুত সৌকর্য দেখা দিলো। এ এমন জ্যামিতি যেখানে উদাহরণ স্বরূপ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি হয়না— কম বা বেশি হয়। পরবর্তী কালে বিজ্ঞানও এরই সুযোগ অবশ্য গ্রহণ করতে পেরেছিলো স্থান-কাল সম্পর্কে আইস্টাইনের নতুন ব্যাখ্যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে কাউচি প্রমুখ গণিতবিদ শেষ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছর পুরানো গ্রীক দার্শনিক জেনোর প্যারডক্সগুলো সমাধান করতে পেরেছেন। সেই প্যারাডক্সে অসীম সংখ্যাক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় বলে কোন গতিই সম্ভব হচ্ছিল না; অর্থাৎ বাস্তব জীবনে গতি সম্ভব হলেও জেনোর প্যারাডক্স গাণিতিক ভাবে দেখাতে পারছিলোনা যে

গতি সম্ভব। কাউচি দেখিয়েছেন $\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{১৬}$ ... এভাবে ক্রমাগত ছোট ভগ্নাংশ অসীম ধারায় চলতে থাকলে তার যোগফল কিন্তু অসীম কিছু তো হয়ই না বরং একটি সসীম সংখ্যার দিকে (যেমন এক্ষেত্রে ১) এর কাছাকাছি যেতে থাকে। কাউচি এর কোন্ কোন্‌টি এভাবে সসীমের দিকে এগোবে তা নির্ণয়ের উপায় ফরমুলার আকারে বের করেছেন, এবং থিওরেমের মত করে প্রমাণ করেছেন। ফলে জেনোর প্যারাডক্স আর থাকলোনা। অসীমকে কী ভাবে বাগ মানাতে হয় সে কাজ কাউচি ও ক্যান্টরের মত গণিতবিদরা চমৎকার ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন— যেই অসীমের কূলকিনারা এর আগের কয়েক হাজার বছর ধরে গণিতবিদরা শত চেষ্টায়ও করতে পারেননি— সেই গ্রীক যুগের আদিকাল থেকে।

অসীমের আরো ভাল সন্ধান মিল্‌লো যখন এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই ক্যান্টর আধুনিক সেট থিওরির প্রবর্তন করেন। সেট মানে কিছু জিনিসের গুচ্ছ। সেই জিনিস সংখ্যা, ফাংশান ইত্যাদি গাণিতিক কিছু হতে পারে, অন্য রকম কিছুও হতে পারে; এমনকি অন্য সেটও হতে পারে। একটি সেটের মধ্যে ওই জিনিসগুলোর প্রত্যেকটি সেটটির এক একটি 'ইলেমেন্ট' অর্থাৎ উপাদান। ইলেমেন্টগুলো সেটের মধ্যে আরো কিছু সেটে ভাগ হয়ে থাকতে পারে— সেগুলো হবে সেটের সাবসেট। যেমন সব পাখির যদি একটি সেট হয় তা হলে উড়তে পারা সব পাখি হবে এর একটি সাবসেট, তেমনি উড়তে না পারা সব পাখি হবে এর অন্য একটি সাবসেট। শূন্য সেটও হতে পারে— যেই সেটের কোন ইলিমেন্ট নেই, শুধু একটি ইলিমেন্টের একক সেটও হতে পারে। তেমনি ভাবে অসীম সংখ্যক ইলিমেন্ট নিয়ে অসীম সেটও হতে পারে। যে কোন সেটকে অন্য সেটের সঙ্গে তুলনা করার, এবং এদের মধ্যে সম্পর্কের ও বিক্রিয়ার ভিত্তিতে সেটের গণিতের নিয়ম-কানুনও গড়ে তুলেছিলেন ক্যান্টর। ওই অসীম সেটও এই নিয়ম কানুনের বাইরে নয়। এভাবেই ক্যান্টর অসীমের সমাধান করতে পেরেছিলেন। ক্যান্টরের সেট থিওরি আগাগোড়া গণিতের মধ্যে একটি সুসঙ্গতি আনতে পারলেও এর যুক্তির মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম অসঙ্গতি থেকে গিয়েছিলো। বিংশ শতাব্দীতে সাম্প্রতিক গণিতবিদরা এই অসঙ্গতিটুকুও দূর করে পুরো গণিতকে সেট থিওরির ভিত্তিতে দাঁড় করাতে পেরেছেন। একই ভাবে বিংশ শতাব্দীতে আরো ক'জন গণিতবিদ ফ্রেগে, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ গণিতের উৎসমূল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন লজিককে— সেই লজিক বা যুক্তিবিদ্যা যা প্রাচীন কাল থেকেই পরিচিত তাকে গাণিতিক রূপ দিয়ে। গণিতের ইতিহাসের এই বড় বড় কয়েকটি মোড়ের সাক্ষাত আমরা কিছু পরে আবার পাব।

গণিত কি উদ্ভাবিত না আবিষ্কৃত

গণিতের জিনিসগুলো কী:

যখন বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয় তখন গণিতে ব্যবহৃত নানা জিনিস আমরা অন্য বিষয়ের জিনিসগুলো থেকে আলাদা করতে পারি। যে কেউ সংখ্যা, রেখা, বিন্দু, বৃত্ত, গোলক, ইত্যাদিকে গণিতের জিনিস হিসেবে চিনতে পারেন। যাঁদের সঙ্গে গণিতের পরিচয় আর একটু বেশি তাঁরা ফাংশান, সেট, নানা গাণিতিক চিহ্ন ইত্যাদিকেও গাণিতিক জিনিস হিসেবে চিনতে পারেন। সেদিক থেকে গণিতের জিনিস চেনা নিয়ে কোন সমস্যা নেই। সমস্যাটি হলো এসব জিনিসকে কোন্ ধরণের জিনিসের দলে ফেলা যায় তাই নিয়ে। এই জিনিসগুলো প্রকৃতিতে থাকা আমাদের ধরাছোঁয়ার জিনিসের মত নয়। যেমন একটি সংখ্যাকে বাস্তব জিনিসের মত দেখা-ধরা-ছোঁয়া যায়না। এমন কি প্রকৃতির যে সব জিনিস বিজ্ঞানের অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ বা অন্য কোন যন্ত্র দিয়ে হলেও দেখা যায় সে রকমও কিছু নয় গণিতের জিনিসগুলো। তাত্ত্বিক ভাবেও স্থানের মধ্যে কোথাও তার অস্থিত্ব নেই, কালের মধ্যেও কোথাও তার অস্থিত্ব নেই। অর্থাৎ সাধারণ বাস্তব জগতে বা বিজ্ঞানের পরোক্ষ ভাবেও পরীক্ষায় পাওয়া যাওয়ার মত কিছু এরা নয়। অন্য দিকে যদি বলি এদের অবস্থান আমাদের মস্তিষ্কে বা চিন্তায়, তাও ঠিক হবেনা। কারণ এর কোনটিই মস্তিষ্কে চিন্তার স্বাধীন উপাদান, বা সাড়া জাগানোর উপাদান হিসেবে নেই। কাজেই গণিতের জিনিসগুলো আমাদের মস্তিষ্কেও নেই, তার বাইরের জগতেও নেই; তাহলে এগুলো কী রকমের জিনিস? অথচ আমাদের সাধারণ কাজে ও বিজ্ঞানে এসব আমাদের পরিচিত জিনিস— হরদম আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করছি— কিন্তু এগুলো আছে কোথায়?

এই যে গণিতের জিনিসগুলোকে স্থানে, কালে, কিংবা মস্তিষ্কে খুঁজে না পাওয়া— এই ব্যাপারটিকে একটি উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করা যাক। কিউব জিনিসটি আমাদের খুব পরিচিত জিনিস। সব দিকে সমান চৌকা ঘন-আয়তনের এই জিনিসটি আমরা লুডু খেলার দান ফেলার ছক্কা থেকে শুরু করে রুবিক্স কিউব পর্যন্ত নানা ভাবে দেখে থাকি। লক্ষ্য করলে দেখবো জিনিসটি দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতা নিয়ে তিন মাত্রার। অবশ্য এর বিভিন্ন মাত্রার বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে দেখতে পারি— যেমন এর অভ্যন্তরটি তিন মাত্রার, একটি অভ্যন্তরই এর রয়েছে। এর তলগুলো দুই মাত্রার (দৈর্ঘ ও প্রস্থ)— মোট ৬টি তল রয়েছে। এর প্রত্যেকটি কিনারা এক মাত্রার (সরল রেখা)— মোট ১২টি কিনারা রয়েছে। এর ৮টি কোনার বিন্দু রয়েছে যার প্রত্যেকটি একটি বিন্দু, তাই শূন্য মাত্রার। ১টি অভ্যন্তর, ৬টি তল ১২টি কিনারা ও ৮টি বিন্দু নিয়ে কিউবের মোট অংশ (এদের যোগফল) ২৭টি। নিজে তিন মাত্রার জিনিস বলে এই কিউবটিকে আমরা বলতে পারি ৩-কিউব।

এখন ধরা যাক কিউবটিকে চাপ দিয়ে চেপ্টা করে দুই মাত্রার জিনিসে পরিণত করলাম— অর্থাৎ একটি বর্গ ক্ষেত্রে। মূলত কিউব থেকে এসেছে বলে একেও আমরা কিউবই বলতে পারি, তবে দুই মাত্রায় পরিণত হয়েছে বলে এখন বল্‌বো ২-কিউব। ২-কিউবের অংশগুলো হবে ১টি তল, ৪টি কিনারা, ৪টি বিন্দু— মোট ৯টি অংশ। এই ২-কিউব বা বর্গক্ষেত্রটিকেও একটি কিনারা বিপরীত কিনারার দিকে চেপে একটি সরল রেখায় পরিণত করতে পারি, এক মাত্রিক বলে যাকে বলতে পারি ১-কিউব। এই ১-কিউবের রয়েছে শুধু ১টি কিনারা আর ২টি বিন্দু— মোট ৩টি অংশ। একটু পর্যক্ষেণ করলে গণিতজ্ঞ না হয়েও বোঝা যায় যে ৩-কিউবের বিভিন্ন অংশের সংখ্যাকে একটি ফরমুলায় প্রকাশ করলে তার থেকে ২-কিউবের বিভিন্ন অংশ, এবং তার থেকে অনুরূপ ফরমুলায় ১-কিউবের বিভিন্ন অংশ আমরা হিসেব করে পেতে পারি। একই ফরমুলা দিয়ে অনুরূপ ভাবে ৪-কিউবের অর্থাৎ চার মাত্রিক কিউবের অংশগুলোর সংখ্যা অংক কষে বের করে ফেলা যায়— যাদের মোট সংখ্যা হবে ৮১। অংশগুলো জানা মানে ৪-কিউব সম্পর্কে গাণিতিক ভাবে সব কিছু জেনে ফেলা। কিন্তু এমনি কোন ৪-কিউব কি কেউ কোনদিন দেখেছে? ৪-কিউব দূরে থাক, চার মাত্রার কোন জিনিসই কি আদৌ কেউ কোনদিন দেখেছে? ৩-কিউব, ২-কিউব, ১-কিউব এগুলোর বাস্তব রূপ আছে— তা আমরা দেখেছি, সব সময় দেখে থাকি। লুডুর ছক্কা দিয়ে ৩-কিউব, একটি বর্গক্ষেত্র দেখে ২-কিউব এবং একটি সরল রেখা দেখে ১-কিউব আমরা বাস্তবে দেখি। কিন্তু বাস্তবের কোথাও কি ৪-কিউবের মত কিছু আছে? এমন কি আমাদের কল্পনায়ও কি এরকম কোন ৪-কিউব চিন্তা করতে পারি? অথচ এর গাণিতিক সব গুণ আমাদের জানা, গণিতের কাছে ৪-কিউব জিনিসটি খুবই উপস্থিত। তা হলে এই অদ্ভুত গাণিতিক জিনিসটি যা বাস্তবে নেই, কল্পনায়ও নেই, তা কোথায় আছে?

একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে ৩-কিউব, ২-কিউব, ১-কিউব যেগুলোকে বাস্তবে দেখি বলছি তাও কি সঠিক গাণিতিক আদর্শে দেখি? সত্যিকার গাণিতিক অর্থে লুডুর ছক্কাটিকে ৩-কিউব বলা যাবেনা কারণ যত যত্ন করেই একে তৈরি করা হোক, সূক্ষ্মভাবে মাপলে দেখা যাবে এর কিনারাগুলো হুবহু সমান নয়, পরস্পরের সঙ্গে একেবারে নিখুঁতভাবে সমকোণে নেই ইত্যাদি। একই ভাবে ২-কিউব (বর্গক্ষেত্র), ১-কিউব (সরল রেখা) কোনটাই গাণিতিক আদর্শ মতে বাস্তবে নেই। এদের উপস্থিতি একভাবে ওই ৪-কিউবের মতই— গণিতে আছে, বাস্তবে নেই।

বাস্তবে থাকা আর গণিতে থাকা নিয়ে আর একটি উদাহরণ দেয়া যাক— যেটি স্রেফ সংখ্যার ব্যাপার। আজ থেকে দশ কোটি বছর আগের কোন নদীর ধারের একটি দৃশ্য কল্পনা করি। দুটি ডাইনোসর নদী থেকে পানি খাচ্ছে। আর একটি ডাইনোসর এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল, এবং তাতে ওখানে তিনটি

ডাইনোসর হলো। এই যে দুটি ডাইনোসরের সঙ্গে আর একটি ডাইনোসর যোগ হয়ে তিনটি হলো তা কোন মানুষের চিন্তায় আসা গণিতের ঘটনা হবার কথা নয়, কারণ দশ কোটি বছর আগে কোন মানুষ ছিলনা। আসলে ওই ঘটনাগুলোর সঙ্গে গণিতের কোন সম্পর্কই নেই— ওগুলো ডাইনোসরেরই গুণ। ডাইনোসরের লম্বা গলা, ছোট মাথা যেমন ডাইনোসরের বৈশিষ্ট তেমনি তার দুটি হওয়া কিংবা তিনটি হওয়া তারই বৈশিষ্ট— একেবারে প্রকৃতিতে থাকা বাস্তব জিনিস। কিন্তু তার বহু কাল পর মানুষ আবির্ভাবেরও বহু দিন পর কিছু মানুষ এক, দুই, তিন, চার— এমনি করে বিমূর্ত সংখ্যা-ব্যবস্থা নিয়ে ভেবেছে যেগুলোকে যোগ বিয়োগ করা যায়। কিন্তু ডাইনোসর, কিংবা গরু, কিংবা অন্য কোন কিছুতে এই সংখ্যাগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাবেনা— এরা নেহাত বিমূর্ত সংখ্যা। এই সংখ্যা কী, ওরা কোথায় আছে সেই সমস্যাটি থেকেই যায়; শুধু গণিতেই তাদের অস্থিত্ব।

সেভাবে বাস্তব অস্থিত্ব খুঁজে না পেলেও, প্রাচীনকাল থেকে যেহেতু মানুষ গণিতের চর্চা করে এসেছেন, ওই জিনিসগুলোর এক রকম অস্থিত্ব মানুষকে মানতে হয়েছে। একটু একটু করে কালক্রমে গণিতের অনেক রকম জিনিসকে তার মানতে হয়েছে; যেমন সংখ্যা ব্যবস্থাকে মানতে হয়েছে, তেমনি এক সময় কিউবকে, এমনকি ৪-কিউবকেও, তেমনি আরো কত কিছুকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এসব কি গণিতবিদরা আবিষ্কার করেছেন না উদ্ভাবন করেছেন? যদি মনে করি জিনিসগুলো বরাবর কোন না কোন ভাবে কোথাও না কোথাও ছিল, গণিতবিদরা শুধু তা খুঁজে নিয়েছেন তা হলে বলতে হয় গণিতের জিনিসগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। আর যদি মনে করি এদের ওরকম কোন অস্থিত্ব আগে ছিলনা, গণিতবিদরা এসব সৃষ্টি করেছেন, তা হলে জিনিসগুলো গণিতবিদদের উদ্ভাবন। উভয়ের মধ্যে কিন্তু অনেক ফারাক্— আমাদের পরবর্তী আলোচনা এই ফারাকগুলোকে স্পষ্ট করবে।

আগেকার এবং আজকের সৃজনশীল গণিতবিদরা নিজেরাও সব সময় একমত হন্‌নি তাঁদের জিনিসগুলো আবিষ্কার না উদ্ভাবন। কিন্তু গণিত নিয়ে যাঁরাই কাজ করেন তাঁদের মনের গহীনে এরকম একটি ধারণা সাধারণত থাকে যে গণিতের এই জিনিসগুলোর সত্যিই একটি অস্তিত্ব রয়েছে— হোক তা প্রকৃতির বাইরে, স্থানের ও কালের বাইরে, মানুষের মাথার বাইরে। এ যেন এক রকম অদ্ভুত বিমূর্ত অস্থিত্ব। কিন্তু আবার জ্ঞানের প্রকৃতি নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের অধিকাংশ এরকম অদ্ভুত ধরণের অস্থিত্বকে স্বীকার করতে নারাজ। তাঁরা বরং মনে করেন এসব গণিতবিদদের নিজেদেরই উদ্ভাবন, নেহাত কাল্পনিক মনগড়া জিনিস, তবে খুবই কার্যকর। উদ্ভাবিত সেই জিনিসের রূপ নিয়েও অবশ্য নানা মত আছে যেগুলোর এপিঠ ওপিঠ জানলে গণিতের রহস্যটি বেশ খানিকটা বোঝা যাবে। মোটা দাগে বলতে পারি এই ব্যাপারে

দুটি পক্ষ— এক পক্ষ গণিতের জিনিসগুলোর বিমূর্ত এক রকম স্বাধীন অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, অন্য পক্ষ সেরকম অস্থিত্ব আছে এমটি মানতে রাজি নয়। প্রথম পক্ষটিকেই আগে দেখা যাক।

গণিতের জিনিসের বিমূর্ত স্বাধীন অস্থিত্বের ধারণা:

গণিতের জিনিসগুলোর এক রকম বিমূর্ত স্বাধীন অস্থিত্ব রয়েছে এমন ধারণা প্রকৃতিতে গ্রহের, কিংবা ইলেকট্রনের কিংবা ডিএনএ'র অস্তিত্বের ধারণার মত নয়। এই শেষেরগুলোকে বাস্তবে খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু গণিতের জিনিসগুলোকে পাওয়া যাবেনা। তবে বাস্তবে অর্থাৎ স্থানে বা কালে না থাকা জিনিসও যে 'আসলে' থাকতে পারে এমন একটি অদ্ভুত অস্থিত্বের কথা গ্রীক দার্শনিকদের কেউ কেউ খুব জোরালো ভাবে বল্‌তেন এবং তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে খ্যাতি পেয়েছেন প্লেটো। তাঁদের এই দর্শনকে বলা হয়েছে 'আইডিয়ালিজম', এবং 'প্লেটোনিজম'ও। তাঁরা অবশ্য এই রকম অদ্ভুত অস্থিত্বের কথা সব কিছু সম্পর্কে বল্‌তেন, শুধু গণিতের জিনিসের ক্ষেত্রে নয়। তাঁদের মত অনুযায়ী পার্থিব যে বাস্তব সেটি আসলে মায়ার মত, সত্যি নয়। পার্থিব এসব ধরা-ছোঁয়ার জিনিসের রয়েছে এক রকম বিমূর্ত গুণ যাকে তাঁরা বলতেন ফরম— সেটিই হলো আসল সত্ত্বা যার সন্ধান আমাদের করতে হবে। এই প্লেটোনিজম কী ভাবে দর্শনে ও বিজ্ঞানে অবদান রেখেছে তার কিছুটা আমরা এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে দেখেছি। প্লেটোর এই মতবাদ কিন্তু আরো সুস্পষ্টভাবে প্রযোজ্য হলো গণিতের ক্ষেত্রে— যে প্রয়োগ প্লেটো নিজেও করেছেন। তিনি অবশ্য সব কিছুর মূলেই এই গাণিতিক বিমূর্ত সত্ত্বাকে স্থান দিতেন। গণিতের জিনিসগুলোর একরকম স্বাধীন বিমূর্ত অস্থিত্বের ধারণাটি প্লেটোনিজমেরই একটি আধুনিক সীমিত প্রয়োগ— শুধু গণিতের জিনিসের ক্ষেত্রে। একে আমরা বল্‌তে পারি গাণিতিক প্লেটোনিজম— বা আপাতত শুধু প্লেটোনিজম।

এটি গণিতের জিনিসের এমন অদ্ভুত এক অস্থিত্ব মেনে নেয় যেটি বিমূর্ত— অর্থাৎ কোন বাস্তব অবয়ব সম্পন্ন জিনিসের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই; তাকে ধরাছোঁয়া-দেখার চেষ্টা করা বৃথা। এই অস্থিত্ব স্বাধীন কারণ এটি স্থানে নেই, কালেও নেই, মস্তিষ্কেও নেই— কোন কিছুই এর আধার নয়। বোঝাই যাচ্ছে যে এটি বিজ্ঞানের জিনিসের মত নয়, বিজ্ঞানের জিনিসের মত কার্য-কারণ সম্পর্কেরও ধার ধারেনা। বিজ্ঞানে যেমন বেলুনের গায়ের ওপর চাপ বাড়তে দেখে সেই 'কার্যটির' একটি কারণ অনুসন্ধান করতে পারি এবং বুঝি যে বেলুনের ভেতর গ্যাসের অণুগুলো তার দেয়ালে আছড়ে পড়াটাই সেই 'কারণ'। এখান থেকেই আমরা বুঝি যে গ্যাসের অণু সত্যিই সেখানে আছে। কিন্তু যখন ধরে নিই যে 'সংখ্যা' আছে, বা ৪-কিউব আছে, তখন সেই অস্থিত্বের পেছনে কার্য-কারণের প্রয়োজন দেখিনা, বা তা খুঁজেও পাইনা। তার

মানে কি এই যে এটি বিজ্ঞানের অতীত কোন অস্থিত্ব যেমন আধ্যাত্মিক কিছু, বা ধ্যানে পাওয়া দিব্য জ্ঞানের মত কিছু? না— গাণিতিক প্লেটোনিস্টরা তা বল্‌বেননা। গণিত এই ব্যাপারে একেবারেই অনন্য— কারণ গণিত যেভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, বিজ্ঞানকে যে ভাবে সে যুক্তি হাতে তুলে দেয়, সেটি এ ক্ষেত্রে গণিতকে নিজে বাস্তবে না থাকলেও, কার্য-কারণ না মানলেও একটি বৈজ্ঞানিক অনন্যতা দিয়েছে; সেটি আধ্যাত্মিক কিছুর মত নয়।

আধুনিক কালের অনেক বিখ্যাত গণিতবিদ গণিতের প্লেটোনিজমের সপক্ষে ভিন্ন রকম যুক্তি দিয়েছেন। তাঁদের একজন গণিতবিদ ফ্রেগের যুক্তি হলো গণিতের ভাষার মধ্যেই পদে পদে রয়েছে ওই বিমূর্ত ও স্বাধীন জিনিসগুলো— সংখ্যা, রেখা, ফাংশান, সেট— ওই সব কিছু। এগুলো দিয়ে গড়া গাণিতিক থিওরেমগুলো চিরায়ত যুক্তির সাহায্যে চমৎকার ভাবে প্রমাণিত হয়েছে, বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে— কাজেই এই থিওরেমগুলো সত্য না হয়ে পারে না। আর কোন বাক্যকে যদি আমরা সত্য বলে জানি তাহলে ওই বাক্যে ব্যবহৃত শব্দরূপী জিনিসগুলো কি অস্থিত্বহীন হতে পারে? কাজেই গণিতের ভাষায় ব্যবহৃত ওই শব্দরূপী 'জিনিসগুলো' সত্যিকার অস্থিত্ব রয়েছে— হোক্‌না তা বাস্তবের বাইরে। গণিতবিদ এগুলোকে 'আবিষ্কার' করেছেন, 'উদ্ভাবন' করেননি।

সাম্প্রতিক গণিতের আরেকজন দিকপাল গোয়েডেলও সুন্দর কিছু যুক্তিতে এই প্লেটোনিজমকে সমর্থন করেছেন। তিনি পাশাপাশি দুটি সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি সম্পর্ক হলো গণিতের জিনিসগুলো নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য তত্ত্বের সঙ্গে গাণিতিক ধারণার সম্পর্ক। অন্য সম্পর্কটি হলো বাস্তব জিনিসগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তত্ত্ব এবং ওগুলোর বৈজ্ঞানিক গুণাগুণের সম্পর্ক। এই দুটি সম্পর্ক পরস্পর ভিন্ন রকমের হলেও এদেরকে পাশাপাশি রাখলে একটি সমান্তরাল সাযুজ্য দেখা যায়। গোয়েডেলের মতে বাস্তব জিনিসগুলো ও তাদের গুণাগুণ যেমন মানুষের সৃষ্ট নয়, তেমনি গাণিতিক জিনিস ও তাদের গাণিতিক ধারণাগুলোও মানুষের সৃষ্ট নয়। বাস্তব জিনিসকে যেমন মানুষের মানসিক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেয়া যায়না, গণিতের জিনিসকেও তেমনি মানসিক ঘটনা বলে প্রতিপন্ন করা যায়না। বিজ্ঞানের বাস্তব জিনিসগুলো (কণিকা, তরঙ্গ ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়া সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মাধ্যমে। তাই বাস্তব জিনিস ও তাদের গুনাগুনের সঙ্গে আমাদের অনুভূতিগত সম্পর্ক আছে। এরই সমান্তরালে আমরা যখন গণিতের জিনিসগুলো ও তাদের গাণিতিক ধারণার দিকে লক্ষ্য করি সেগুলোর সঙ্গে আমাদের অংশত হলেও এক রকম অনুভূতিগত সম্পর্ক কি নেই? আমরা কি সংখ্যাকে, রেখাকে, সেট্‌কে

এবং তাদের মধ্যেকার ধারণাগুলোকে এক ভাবে অনুভব করিনা? স্থান বা কালে অবস্থান না করেও গাণিতিক জিনিসগুলোর অস্থিত্বের এই অনুভূতিটি গোয়েডেলের মতে আমরা ঠিকই অনুধাবন করি। আমাদের বাইরে গণিতের জগতটি সত্যিই রয়ে গেছে বলেই তা আমরা অনুধাবন করি এবং আবিষ্কার করি। এখানে তা নিজেরা সৃষ্টি করার বা উদ্ভাবন করার প্রশ্ন অবান্তর।

গোয়েডেলের আরেকটি যুক্তি হলো গাণিতিক অস্থিত্ব ভেতর ও বাইরে উভয় দিক থেকে স্পষ্ট। ভেতর থেকে স্পষ্ট এই জন্য যে আধুনিক গণিতে এমন কিছু স্বতসিদ্ধ ধরে নেয়া সম্ভব হয়েছে শুধু যার থেকে পুরো গণিতকেই নির্ণয় করে খাড়া করা যায়। এর ভেতরের গাণিতিক জিনিসগুলোর সত্যিকার অস্থিত্ব না থাকলে সেটি সম্ভব হতো না। অস্থিত্বটি বাইরে থেকেও স্পষ্ট এই জন্য যে গণিতে একটি থিওরেম বা একটি নীতি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর থেকে প্রমাণযোগ্য নানা ফলাফল পাওয়া যায় নতুন কোন স্বতসিদ্ধ ধরে নেয়া ছাড়াই। কোন নীতি যদি বাইরে নানা পরিস্থিতিতে গিয়ে এভাবে সফল হয় তখন তার মধ্যে থাকা গণিতের জিনিসগুলোর অস্থিত্ব নেই এমন কথা কি বলা যায়?

এভাবে দেখা যায় আধুনিক বড় বড় গণিতবিদ সহ গণিতের প্লেটোনিজমে অনেকে বিশ্বাস করেন। এমন অবৈজ্ঞানিক অস্থিত্বের প্রতি এসব গাণিতবিদের এতখানি দুর্বলতা কেন? এর একটি কারণ গণিতবিদের জন্য বা গণিতের চর্চায় থাকা সবার জন্য গণিতের জিনিসগুলোর স্বাধীনতাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ— এগুলোকে না ব্যক্তির ওপর, না পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করতে দেয়া যায়; বরং অংকের ফল সবার কাছে এক হতে হবে, শুদ্ধ ফলটাই সবাইকে সব পরিস্থিতিতে পেতেই হবে— এটিই যে গণিতের বৈশিষ্ট। গণিতের জিনিসকে একটি ধ্রুব, অপরিবর্তনীয়, স্বাধীন অস্থিত্ব দিতে না পারলে এটি কীভাবে সম্ভব হবে? তাই প্লেটোনিজমকে মানতে হয়েছে। এই মানাটি বৈজ্ঞানিক নয়, বরং এর স্থান মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যার সঙ্গে যার স্থান বিজ্ঞানে নেই— অনেকে মনে করেন জ্ঞানের জগতেই নেই। তাই জ্ঞানের বৈধতা বিচার করতে গেলে প্লেটোনিজম গণিতের জিনিসের ব্যাখ্যায় খুব সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হতে পারে না, বরং এর বিকল্প ব্যাখ্যাগুলোই যথেষ্ট শক্তিশালী।

স্বাধীন বিমূর্ত অস্থিত্বের ধারণায় সমস্যাঃ

গণিতের প্লেটোনিজম সন্তোষজনক না হবার বড় কারণ হলো এতে বিজ্ঞানের পাশাপাশি সমান্তরাল আরেকটি জগতের অস্থিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। বিজ্ঞানের জগতের জিনিসগুলো বাস্তবে আছে। গণিতের জগতের জিনিসগুলো বাস্তবে নেই, তার যে স্বাধীন বিমূর্ত অস্থিত্বের কথা প্লেটোনিজম বলে সেখান থেকে বাস্তবের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ তার নেই। রক্ত-মাংসের মানব

মস্তিষ্কের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটার সুযোগও তার নেই। জ্ঞানের রাজ্যে এমন দ্বৈততা চল্‌তে পারে না। বিশেষ করে এমন দ্বৈততায় থাকা গণিতের ফল কেমন করে বাস্তব বিজ্ঞানের ফলের সঙ্গে হুবহু মিলে যেতে পারে? এমন গণিত কী করে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভাষা হয়ে উঠতে পারে? আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীর কাছে এই ব্যাপারটিকে একটি অত্যাশ্চর্য রহস্য মনে হয়েছে— গণিতের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই মিলের ব্যাপারটিকে। প্লেটোনিজমকে মেনে এই রহস্যের সমাধান সম্ভব নয়।

প্লেটোনিস্টদের কথা মতো গণিতের জিনিস যদি রক্ত-মাংসের মস্তিষ্ককে স্পর্শ করতে না পারে তা হলে গণিতের জন্য আর একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়। গণিতের ইতিহাসে আমরা বার বার দেখেছি কিছু মানুষ স্রেফ তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি (ইনট্যুইশন) দিয়ে গণিতের দুর্ভেদ্য সব রহস্য ভেদ করেন— কোন নিয়মানুযায়ী ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া ছাড়াই। অনেক গণিতবিদ এমনি ভাবেই গণিতের জটিল কোন সম্পর্কে সরাসরি চলে গিয়েছেন— একরকম স্বভাব-গণিতবিদের মত। কিন্তু মানব-মস্তিষ্কে গণিতের জিনিসের ঠাঁই না থাকলে এই গাণিতিক অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার কোন উপায় থাকে না। বিংশ শতাব্দীতে এরকম অন্তর্দৃষ্টির একটি দুর্দান্ত উদাহরণ ছিলেন বৃটিশ ভারতের মাদ্রাজের তরুণ রামানুজন। স্কুলের গতানুগতিক সাধারণ গণিত শেখা শেষ করতে না করতেই কিশোর রামানুজন সর্বাধুনিক উচ্চতর গণিতে, বিশেষ করে নাম্বার থিওরিতে অত্যাশ্চর্য অবদান দেখাতে শুরু করেন। এর সবই ছিল পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে— যাকে গাণিতিক অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়না। স্কুলজীবনের শেষে কোন রকম একটি কেরাণীগিরির চাকরিই তাঁর জুটেছিলো— ওখান থেকেই তিনি অবাক-করা কিছু গাণিতিক আবিষ্কার সহ সেযুগের সব চেয়ে বিখ্যাত কয়েকজন গণিতবিদের কাছে চিঠি লিখেন। তাঁদের একজন টমাস হার্ডি ওগুলো দেখেই বুঝতে পেরেছেন রামানুজনের গণিতের অনন্যতা— যেই গণিতের কোন স্বাভাবিক ভিত্তি ছিলনা, যার আনুষ্ঠানিক প্রমাণ দেবার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। বাকিরা পত্রপাঠ তা নাকচ করলেও হার্ডি দেখামাত্র বুঝতে পেরেছিলেন এর সৃষ্টিকার একজন নিখাদ রত্ন। এটি বুঝতে পারাটাও হার্ডির গণিত-অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। পরে রামানুজন হার্ডির সহায়তায় অক্সফোর্ড গিয়ে কোন রকম পূর্ব-ইতিহাস ছাড়াই নিজেকে অত্যন্ত বড় গণিতবিদে পরিণত করেছিলেন। এরকম অন্তর্দৃষ্টিতে মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক অনন্যতাই প্রকাশ পায়। কিন্তু প্লেটোনিজম অনুযায়ী গণিতের জিনিসগুলো মস্তিষ্কের জিনিস নয়— তা হলে অন্তর্দৃষ্টি দেখা দেয় কেমন করে?

প্লেটোনিজমের অন্য কিছু সমস্যাকে বলা যায় দার্শনিক ধরণের সমস্যা। জ্ঞানের বিচারে ওরকম অদ্ভুত কিছু জিনিসের অস্তিত্ব মেনে নেয়া যায় কিনা সেই প্রশ্ন থেকে আসে এমনি সমস্যা। যেমন কোন কিছুর অস্থিত্ব নিয়ে আমার

জ্ঞানকে পাকা হবার জন্য সেই অস্থিত্বের মধ্যে আমার প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। এ প্রবেশাধিকারের মানে হলো তার সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ থাকতে হবে, সেটি কোন না কোন ভাবে আমাকে স্পর্শ করতে হবে। একমাত্র তখনই অন্তত নীতিগতভাবে হলেও আমি বিশ্বাস করতে পারবো জিনিসটির অস্তিত্ব রয়েছে। গণিতের মধ্যে সব চেয়ে অবশ্যম্ভাবী ভাবে যে গুণটি রয়েছে তা হলো একে বিশ্বাস করা চলে— দুইয়ে দুইয়ে চার হওয়ার মত। গণিতবিদ সব সময় এই বিশ্বাসযোগ্যতাকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি ধরে নেয় যে গণিতের জিনিসগুলোকে কোন ভাবে স্পর্শ করা যাবেনা, তাদের শুধু এক অদ্ভুত ভিন্ন-জাগতিক অস্থিত্ব রয়েছে, তা হলে সেগুলোর জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের নীতিগত বিশ্বাসও সম্ভব নয়। কাজেই বিশ্বাসযোগ্য গণিত অবিশ্বাসযোগ্য জিনিসের দ্বারা গড়া যায় কী ভাবে— যা প্লেটোনিস্টরা গড়তে চাইলেন?

গণিতের জিনিসকে চিনে নেবার বিষয়টি দেখা যাক। '৩' সংখ্যাটির কথা ধরা যাক— যা একটি গণিতের জিনিস। গণিতে '৩' এই সংখ্যাটিকে আমরা তার নানা গাণিতিক গুণ দিয়ে চিনি যার সবই অন্য সংখ্যার সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি— এটি ২ এর থেকে ১ বড়, এটি ৬ এর অর্ধেক, এটি একটি প্রাইম সংখ্যা— অর্থাৎ এটিকে সে নিজে অথবা ১ ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবেনা, ইত্যাদি। অন্য সংখ্যার এরকম ব্যবহার ছাড়া '৩' কে চেনার আর কোন উপায় নেই— পাটিগণিতের সব নিয়ম, সেট থিওরি, সব ব্যবহার করেও নেই। কিন্তু '৩' এর নিজের যেই গঠন, তাকে চিন্‌তে ব্যবহৃত অন্য সব সংখ্যারও সেই একই রকম গঠন। এই একই গঠন দিয়েই যদি তাকে চিনতে হয়, অর্থাৎ চিনতে গিয়ে এই গঠনের আওতার বাইরে যেতে না পারলে তা হলে '৩' কে কোন 'জিনিস' বলা যায়না। জিনিস হিসেবে চিনতে হলে নিজের গঠনের বাইরে কিছু দিয়ে তাকে চিনতে হয়। যেমন ধরা যাক টেনিস বলকে যদি একটি জিনিস হিসেবে চিনতে চাই, তা হলে তাকে ফুটবলের চেয়ে ছোট, পিংপং বলের চেয়ে বড়, ইত্যাদি দিয়ে চিন্‌লে চল্‌বেনা। কারণ সেভাবে ওই 'বল' নামক গঠনটির বাইরে যাওয়া হচ্ছে না। তাই টেনিস বলকে একটি জিনিস বলে চিন্‌তে হলে তার প্রস্তুতকারকের ট্রেডমার্ক, টেনিস খেলার সঙ্গে এর সম্পর্ক ইত্যাদি গুনাগুন দিয়ে তাকে চিন্‌তে হবে। প্লেটোনিজম যে ভাবে '৩' সংখ্যাটি বা গণিতের অন্য যে কোন জিনিসের যে রকম অস্থিত্বের কথা বলে তাতে ওরকম নিজ গঠনের বাইরে গিয়ে তাকে চেনার কোন উপায় নেই। গণিতের জিনিসের ওরকম অস্থিত্বও তাই সম্ভব নয়।

যখন আমরা $\sqrt{-1}$ এর মত কাল্পনিক সংখ্যা গণিতে দেখি তখন দিব্যি বুঝতে পারি যে এরকম একটি জিনিস সত্যি সত্যি কোথাও থাকা সম্ভব নয়। যে কারণে তা থাকা সম্ভব নয় সেই একই কারণে পিথাগোরাস ও তাঁর পরবর্তী

গ্রীক গণিতবিদের কাছে শূন্য (০), ঋণাত্মক সংখ্যা (যেমন -৩) এগুলো একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিলনা। তাঁরা যে গণিতের জিনিসের অস্থিত্বে বিশ্বাস করতেন। অথচ গণিতে শূন্য আছে, ঋণাত্বক সংখ্যা আছে। কাজেই প্লেটোনিজম সম্ভব নয়। এই সব নানা কারণে গণিতের প্লেটোনিজম সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, সব গণিতবিদের কাছেও নয়। তাঁরা নানা ভাবে এর বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তার সব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একটিই, প্লেটোনিজমকে বাতিল করা; যাতে বাস্তবতার বাইরে, স্থান ও কালের বাইরে, গণিতের জিনিসের অদ্ভুত বিমূর্ত ওই অস্থিত্বকে মানতে না হয়। গণিতের জিনিস একেবারে অস্থিত্ববিহীন হলেই এটি সম্ভব হবে; এদের কোন রকম অস্থিত্বই আসলে নেই, একে মানুষ নিজে নিজে বানিয়ে আলোচনায় এনেছে, অর্থাৎ উদ্ভাবন করেছে; আবিষ্কার করেনি।

অর্থহীন খেলা:

প্লেটোনিজমের বিপরীতে গণিতের জিনিসগুলোর বিকল্প যেসব ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রধান একটিতে বলা হয় গণিত একটি অর্থহীন গুটি চালার খেলার মত (বোর্ড গেইম), আর গণিতের জিনিসগুলো হলো ওই খেলার নিয়মগুলো— সবই গণিতবিদের নিজের উদ্ভাবন। এমনি কত নানা বোর্ড গেইম বা গুটি খেলা আমরা খেলেই থাকি— লুডু, দাবা, মনোপলি, স্ক্র্যাবল ইত্যাদি কত কি! এই সব খেলার নিজস্ব নিয়মকানুন রয়েছে যা অতীতে কেউ না কেউ তৈরি করে গেছেন, আমরা সে নিয়মে খেলে যাচ্ছি। হ্যাঁ এসবে বোর্ড, গুটি ইত্যাদির মত কিছু জিনিস থাকে বটে কিন্তু আসলে ওই ধরাছোঁয়ার জিনিসগুলোর কোন অর্থ নেই— ওগুলো কিছু চিহ্নের মত মাত্র। ওই চেহারার বা ওই অবয়বের গুটি হতে হবে তা নয়, বরং তারা শুধু কিছু অস্থিত্বহীন জিনিসের প্রতিনিধিত্ব করছে; খেলার নিয়মটাই শুধু এর মধ্যে আছে, আর কিছুই নেই। সেরকম গণিতের জিনিসগুলোও কিছু চিহ্নমাত্র— সেগুলোর কোন অস্থিত্ব নেই। গণিতকে এভাবে দেখাটাকে বলা হয় ফর্মালিজম, কারণ এই মত অনুযায়ী কিছু ফর্মাল (আনুষ্ঠানিক) নিয়মই এর সর্বস্ব; এর জিনিসের কোন অস্থিত্ব নেই। শুধু আনুষ্ঠানিকতার মত কিছু 'ফরম' নিয়েই এর গড়ে ওঠা । এভাবে গণিত গড়ে ওঠার সঙ্গে এক ভাবে ভাষা গড়ে ওঠার তুলনা করা চলে। ভাষাও চিহ্নের দ্বারা গড়া, তার নিয়ম কানুনও ভাষার ব্যবহারকারী মানুষের দ্বারা গড়ে তোলা, যেমন ভাবে গণিতের নিয়ম কানুনও গণিতবিদরা সৃষ্টি করে চলেছেন। গণিতের নিয়ম এভাবে সৃষ্টি হয়েছে বটে কিন্তু সেই নিয়ম নিজে কোন নিয়ম অনুসরণ করে তৈরি হয়নি। তাই বলে যেমন ইচ্ছা তেমন মনগড়া ভাবেও গণিতের নিয়ম সৃষ্টি হয়নি। একেবারে শুরুতে যে গণিতের নিয়মের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, তার থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে বাকি নিয়ম এসেছে।

স্কুলের সব গণিত সবার কাছে একই— দুনিয়ার সব মানুষের কাছেই। এসব একই ভাবে পরিচিত এবং সবার কাছে একই ফল দেয়। সব মানুষের মস্তিষ্ক এমনি একই যুক্তির নিয়মে বাঁধা। উচ্চতর গণিত যাঁরা শেখেন তাঁদের কাছেও তার নিয়মগুলোও একই ভাবে পরিচিত, একই ফল দেয়। এসব মনগড়া হতে পারে না।

গণিতের সৃষ্টিকারীরা গণিতের নিয়মগুলোকে একটু একটু করে গড়ে তুলেছেন। এ নিয়ম যেই খাতে প্রবাহিত হয়েছে তা এসেছে মানুষের মস্তিষ্কে বিবর্তিত যুক্তিবোধ থেকে এবং মানুষের জৈবিক ও ভৌত পরিবেশ থেকে, যা মনগড়া হবার সুযোগ ছিলনা, এক এক জনের জন্য এক এক রকম হবারও কোন সুযোগ ছিলনা। এই গণিত একেবারেই মানবিক, এবং মানুষের উদ্ভাবনের সৃষ্টি— বাইরের কোন অস্তিত্বের আবিস্কার নয়। তাই অন্য গ্রহের অন্য কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর কাছে এটি স্বাভাবিক মনে নাও হতে পারে। গণিতের প্রকৃতি সম্পর্কে ফর্মালিজম প্লেটোনিজমের একটি বড় প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিগণিত।

গণিতবিদ হিলবার্ট এই ফর্মালিজমের একজন প্রবক্তা। এই ব্যাপারে তাঁর প্রুফ থিওরি একটি বড় অবদান হিসেবে স্বীকৃত। গণিতের থিওরেমগুলোর একেবারে আটঘাঁট বাঁধা 'প্রুফ' বা প্রমাণ করতে পারার মধ্যে রয়েছে গণিতের একটি বড় অনন্যতা। একের পর এক থিওরেমগুলো এভাবে প্রমাণ করতে পারাটি পুরো গণিতে একটি সুসঙ্গতি এনে দেয়। গণিতের জন্য নিজের ভেতর নিজের এই সুসঙ্গতিটি খুব প্রয়োজন— এটি খেলার নিয়মেরই সুসঙ্গতি। এটি যে একটি অর্থহীন খেলামাত্র এই কারণে সুসঙ্গতির এই মূল্যবান সৌকর্যের কোন হানি হয়না; গণিতের এই অপরিহার্য সম্পদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি তাতে ঘটেনা।

হিলবার্টের দৃষ্টিতে গণিত হলো কড়াকড়ি ভাবে প্রমাণের ওপর গড়ে ওঠা একটি শৃঙ্খলা। বিজ্ঞানেও সব কিছু এতটা কড়াকড়ি যুক্তি প্রমাণে খাড়া হয়না, অনেক কিছুই অভিজ্ঞতা অথবা অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু গণিতে তা হবার যো নেই— এখানে যুক্তির প্রমাণ ছাড়া অন্য কোন কথা নেই। তবে সবকিছুর শুরুতে কিছু ধরে নিতে হয়— সেগুলো স্বতসিদ্ধ। ওই কিছুর ওপর ভিত্তি করে প্রমাণের মাধ্যমে বাকি গণিত গড়ে ওঠে। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে এই ধারা আমরা স্কুলেই দেখেছি। ইউক্লিড ও অন্যান্য গ্রীক জ্যামিতিবিদরা স্বতসিদ্ধের যে মানে করেছেন সেই মানে অনুযায়ীই শুধু স্বতসিদ্ধগুলো সত্যি হয়। যেমন একটি স্বতসিদ্ধ হলো দুটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে শুধু একটিই সরল রেখা টানা যাবে। ইউক্লিডরা বিন্দু, রেখা ইত্যাদির যে মানে ধরে নিয়েছেন তাতে এই স্বতসিদ্ধটি সত্য। অন্যরকম মানে

আরোপ করলে হয়তো এটি মিথ্যা হতো। স্বতসিদ্ধটি আসলেই সত্য কিনা এই নিয়ে গণিতের কোন মাথাব্যথা নেই। গণিত যা নিশ্চিত করতে চায় তা হলো স্বতসিদ্ধ সত্য হলে থিওরেমটিও সত্য হবে, কারণ প্রমাণটি অকাট্য— এটিই গণিতের জন্য যথেষ্ট।

এদিক থেকেই এটি অর্থহীন খেলা— কী চিহ্নের সঙ্গে কী অর্থ আরোপ করা হলো ওই 'ফরমের' কাছে তাতে কিছু আসে যায় না। এখানে ফর্মালিজমটিই আসল কথা। গাণিতিক থিওরেমের জিনিস কী, বিষয় কী, এসব প্রশ্ন অবান্তর; এর কোন জিনিস নেই, বিষয় নেই। এখানে খেলাটি কোন 'কিছু' সম্পর্কে কিছু বল্‌ছেনা, বল্‌ছে শুধু নিরর্থক ফরম সম্পর্কে; খেলার নিয়ম ও চালটিই শুধু এতে আছে। যৌক্তিক ভাবে শুধু ফরমটিকে তাকে ঠিক রাখতে হয়, কোন 'জিনিসের' বোঝা তাকে বইতে হয়না। এজন্যই শুধু ফরম ঠিক রেখে এটি নিজের সত্য হওয়াটিকে ষোল আনাই নিশ্চিত করতে পারে। হিলবার্ট প্রমুখ ফর্মালিস্টরা গণিতকে এভাবেই দেখেন।

অবশ্য আমরা যখন অংক শিখি তখন সব সময় গণিতকে শুধু ফরম হিসেবে দেখিনা— কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি। এটি আমাদের অভ্যাস বা মনোভঙ্গির কারণে করি, তাই আমাদের গণিত-অভিজ্ঞতার সঙ্গে ফর্মালিজমকে মেলানো একটু কষ্টকর। যোগ-বিয়োগ করার সময় বা উৎপাদক নির্ণয় করার সময় সাধারণ সংখ্যাগুলোকে এক রকম 'জিনিস' হিসেবেই আমাদের মাথায় রাখি। জ্যামিতিতে পিথাগোরাসের থিওরেম শেখার সময় আমাদের মাথায় থাকে সমকোণী ত্রিভুজ, যার একটি কোণ সমকোণ অর্থাৎ ৯০ ডিগ্রি— ইত্যাদি। এসব মাথায় না রেখে আমরা ব্যাপারটি বুঝতে পারিনা। এজন্য আমরা যখন অংক করি গণিতের প্লেটোনিজমকে অনুসরণ করে তার জিনিসগুলোর এক রকম সর্বকালীন অস্থিত্ব মনে রেখে করি; যদিও ফর্মালিজমের মতানুযায়ী সেটি ঠিক নয়। ইউক্লিড নিজেও জ্যামিতির মধ্যে ওসব জিনিসের অস্থিত্ব মাথায় রেখেছিলেন— কারণ তিনি স্বতসিদ্ধকে ফর্মালিজমের কথা মতো অর্থহীন ফরম হিসেবে নেন্‌নি, বরং স্পষ্টত প্রমাণিত সত্য হিসেবে নিয়েছেন। অথচ ফর্মালিজম স্বতসিদ্ধকে যে কোন অর্থে ধরে নেয়ার কথা বলছে।

অবশ্য গণিতবিদদের কাছে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়েছে অনেক পরে। ইউক্লিডের মূলনীতিগুলো থেকে (পস্টুলেট) ইউক্লিডীয় জ্যামিতি যেমন সৃষ্ট হয়েছে তেমনি সেই নীতিগুলোরই একটির ভিন্নতর ব্যাখ্যা থেকে পরবর্তীকালে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি খাড়া করা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে ইউক্লিডের ওই মূলনীতি একই সঙ্গে সত্য ও মিথ্যা। আসলে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন এখানে ওঠেইনা— যা ওঠে তা হলো সুসঙ্গতির প্রশ্ন— এখানে যার অভাব নেই।

অন্তর্দৃষ্টি থেকে শুরু করে গড়ে ওঠা:

আমরা দেখলাম গণিতের প্লেটোনিজমের বিকল্প হিসেবে এর জিনিসগুলোকে অন্যভাবে দেখার একটি উপায় হলো ফর্মালিজম— একে অর্থহীন খেলা মনে করা। কিন্তু অনেকটা একই রকমের অন্য বেশ কিছু ব্যাখ্যাও প্রস্তাবিত হয়েছে— যেগুলোর পেছনেও প্রচুর যুক্তি রয়েছে। এমনি একটি হচ্ছে গণিতকে গণিতবিদের অন্তর্দৃষ্টির থেকে শুরু হয়েছে মনে করা। এটি ধরে নেয়া যে এই অন্তর্দৃষ্টিই একদিন ১,২,৩,৪ এই স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোকে গণিতের একেবারে মৌলিক উপাদান হিসেবে সৃষ্টি করেছিলো— সেগুলোকে অন্য কিছু থেকে আনার প্রয়োজন হয়নি। গণনার কাজে, নানা বস্তুকে একের পর এক সাজানোর কাজে ব্যবহার করতে গিয়েই এই স্বাভাবিক সংখ্যা গণিতবিদের অন্তর্দৃষ্টিতে এসেছিলো।

এর পর ওই মৌলিক উপাদান সংখ্যাগুলো থেকে যুক্তির ডানা মেলেছে— একই ভাবে মানুষের অন্তর্দৃষ্টিতেই, এর ওপর ধাপে ধাপে পুরো গণিত গড়ে উঠেছে। গণিতের জিনিসকে এই চোখে দেখলে মস্তিষ্কের অন্তর্দৃষ্টিকে গুরুত্ব দিতে হয়— অর্থাৎ 'ইনট্যুইশনকে'। একই সঙ্গে ওই ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা, নির্মিত হওয়াকেও গুরুত্ব দিতে হয়— অর্থাৎ কন্‌স্ট্রাকশনকে। তাই গণিতের জিনিসকে এভাবে দেখাকে ইনটুউশিনিজমও বলা হয়, আবার কন্‌স্ট্রাকশনিজমও বলা হয়। এর মতে গণিত আগে কোথাও ছিলনা, অন্তর্দৃষ্টি থেকে নির্মিত হয়েছে। ওই নির্মাণ ঘটেছে কোন কোন মানুষের (গণিতবিদের) মস্তিষ্কে সৃষ্ট অন্তর্দৃষ্টি অনুসরণ করে— যার মধ্যে প্রয়োজন হয়েছে শুধু পরস্পর সুসঙ্গতির, আর কিছু নয়। যেহেতু সব মানুষের মস্তিষ্ক একই ভাবে বিবর্তিত হয়েছে তাই অন্তর্দৃষ্টি এক গণিতবিদের মস্তিষ্কে ঘটলেও তা অন্যের চিন্তায় আনাটি কঠিন হয়নি; সবাই ওই নির্মাণে একই রকম যুক্তি, একই রকম সঙ্গতি দেখতে পেয়েছেন; সবার অংক একই রকম হয়েছে। এসব দিক থেকে ইনট্যুইশিনিজমটি ফর্মালিজমের থেকে খুব ভিন্ন কিছু নয়। উভয়ের মতেই গণিত মানুষের উদ্ভাবন, মানুষের যুক্তি-ভাবনার বাইরে গণিতের জিনিসের কোন অস্তিত্ব নেই।

তবে ফর্মালিজম এবং ইনটুইশিনিজমের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। ফর্মালিজম আটঘাঁট বাঁধা প্রমাণের ওপর গণিতকে একটি খেলার নিয়মের মত খাড়া করে। কিন্তু তার শুরুটা হয় 'ধরে নেয়া' স্বতসিদ্ধের ওপর। ইনট্যুইশিনিজমের নির্মাণটিও যুক্তি-প্রমাণ ধরেই এগোয়। কিন্তু তার শুরু হয় গাণিতিক অন্তর্দৃষ্টি থেকে, স্বাভাবিক সংখ্যার অন্তর্দৃষ্টিটিই যার মধ্যে প্রথম এসেছে। অন্তর্দৃষ্টি থেকে গণিতকে গড়তে গিয়ে গণিতবিদরা যদি প্রতি ধাপের প্রমাণগুলো অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে খুঁজে নাও পান তবুও তাঁদেরকে গণিতের পরের ধাপে, বা পরের বক্তব্যে যেতে হয়। সে জন্য ইনটুইশিনিজমকে সব সময় সাধারণ লজিকের ওপর নির্ভর করলে চলেনা— আলাদা রকমের লজিক

অনুসরণ করতে হয়। এক বক্তব্য সত্য হলে পরের বক্তব্যটি সত্য কিনা তা নির্ধারণ করাটি সাধারণ লজিকের কাজ। এই নতুন লজিককে তা করতে হয়না, কারণ গণিতে সত্য-মিথ্যার ব্যাপার নেই, শুধু সুসঙ্গতি থাকা না থাকার ব্যাপার আছে। সাধারণ লজিকের কোন কোন দিককে অগ্রাহ্য করে বলে দার্শনিক দিক থেকে অনেকের আপত্তি আছে ইনট্যুইশিনিজমের প্রতি।

কিন্তু আরো অন্য আপত্তিও আছে ইনটুইশিনিজমের বক্তব্য সম্পর্কে। ইনট্যুইশিনিজম গণিতের জিনিসকে মস্তিষ্কের সৃষ্টি মনে করে অর্থাৎ তা মানুষের মনগড়া। কিন্তু গণিতের আধুনিকতম যে ভিত্তি স্বীকৃত হয়েছে সেই সেট থিওরির গোড়া পত্তনই হয় অসীম সেট দিয়ে— স্বাভাবিক সংখ্যার সেটটিই তো একটি অসীম সেট। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক তো অসীমকে ধারণ করতে পারে না। মস্তিষ্ক শুধু সসীম কিছুকেই ভাবতে পারে, অসীম কিছু নয়— অসীমের ধারণের জায়গা মস্তিষ্কে নেই। সব কিছুর গোড়ায় যে মৌলিক অসীম সেট তাকে যদি ধারণ করতে না পারে তা হলে পুরো গণিত মস্তিষ্কের অন্তর্দৃষ্টিতে আসবে কী ভাবে? এর উত্তরে ইনট্যুইশিনিস্টরা বলে থাকেন অসীম সংখ্যা হয়তো মস্তিষ্কে থাকতে পারে না, কিন্তু অসীমের ধারণাতো থাকতেই পারে। এমন অসম্ভব আরো নানা ধারণা তো আমাদের মাথায় থাকতে দেখা যায় যেমন পঙ্খীরাজ ঘোড়ার মত অসম্ভব প্রাণীর। তবে ওই কথাতে ইনটুইশিনিজমের অসীম সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়না। গণিতের থিওরেমগুলো নানা রকম অসীমের কথা বলে— যেমন অসীম সংখ্যার। পাটিগণিতে ১ নামক একটি সংখ্যার ধারণা রয়েছে যা মাথায় থাকতে হয়। ২ নামক আরেকটি ধারণা রয়েছে, তারপর ৩ নামক আরেকটি ধারণা রয়েছে যা ১ ও ২ এর ধারণা থেকে আলাদা ভাবে আলাদা জায়গায় থাকতে হয়। এরকম অসীম সংখ্যক সংখ্যার প্রত্যেকটির ধারণা মস্তিষ্কে আলাদা ভাবে না থাকলে সেখানে অসীম সংখ্যার ধারণা আছে বলা যাবেনা। কিন্তু এরকম অসীম জায়গাতো মস্তিষ্কে নেই— কাজেই অসীমের ধারণা সেখানে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। তাই তার ভিত্তিতে গণিত মস্তিষ্কে নির্মিত হয়েছে এ ধারণার পথে এটি একটি অন্তরায়। গণিতের জিনিসগুলোকে অন্তর্দৃষ্টি ভিত্তিক নির্মাণ হিসেবে যে ইনট্যুইশিনিজম বা কনস্ট্রাক্টিভিজম দেখতে চায় তাতে এ ধরণের কিছু বিপত্তি রয়ে গেছে বৈ কি।

শ্রেফ গল্প-উপন্যাসের মত:

গণিতের জিনিসের ব্যাখ্যায় সেগুলোর অদ্ভুত একরকম অস্থিত্ব আছে, গণিতবিদরা সেগুলো আবিষ্কার করেন— প্লেটোনিজমের এই অবৈজ্ঞানিক চিন্তার বিপরীতে গণিত মানুষের নিজের উদ্ভাবন এমন চিন্তার দুটি চেষ্টা আমরা দেখলাম। কিন্তু এই শেষোক্ত মতবাদগুলোর সুদিন বলতে গেলে বিংশ

শতাব্দীর প্রথম দিকেই শেষ হয়ে গেছে যখন বিখ্যাত সব গণিতবিদের হাত ধরে ফরমালিজম এবং ইনট্যুইশিনিজম তুঙ্গে উঠেছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে এগুলোর মধ্যে নানা বিপত্তি দেখা যাওয়ার অনুরূপ আর একটি বিকল্প মতবাদ এখন বেশি সমর্থন পাচ্ছে— যার নাম ফিক্শনালিজম। সাদামাটা ভাবে এর মানে গণিতের জিনিসগুলোকে ফিক্শন বা কল্পকাহিনী মনে করা— অনেকটা গল্প-উপন্যাসের সমপর্যায়ের! অবশ্য ব্যাপারটা এতটা সোজা-সাপটা নয়— কী অর্থে গণিত কল্পকাহিনী তা যথেষ্ট ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

এই যে স্বাভাবিক সংখ্যা যাদের অসীম সেট— এগুলোকে কি কেউ কখনো লিখে বা বলে শেষ করতে পারবে? লেখা বা বলা শুরু করতে পারবে, কিন্তু ক্রমাগত যতগুলো লিখতে পারবে তার বাইরে থেকে যাবে আবারো অসীম সংখ্যক সংখ্যা। সেখানে ওই সব সংখ্যার অস্থিত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা কী? যদি প্লেটোনিস্ট কাউকে জিজ্ঞাসা করি তিনি বল্‌বেন যেগুলো লিখলাম সেগুলোর অস্তিত্বতো আছেই, আর তার বাইরে আরো অসীম যা আছে সেগুলোও বহাল তবিয়তেই আছে— কোন এক বিমূর্ত স্বাধীন জগতে। কিন্তু আধুনিক প্লেটোনিজম-বিরোধী কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করি তিনি বল্‌বেন ওই যে সংখ্যার কথা বল্‌ছেন এগুলো কল্পকাহিনী মাত্র, স্বপ্নের পরীর মত। কিন্তু তাই বলে ওই গুলোতে আস্থা বা বিজ্ঞানে ও সাধারণ জীবনে ওগুলোর গুরুত্বের ব্যাপারে আস্থা এই শোষোক্ত জনেরও বিন্দুমাত্র কম হবে না। কারণ তিনি এও জানেন যে গণিতের জিনিসগুলো কল্পকাহিনী হলেও তাতে গণিতের কাজ বা ব্যবহার বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়না। গণিতের কাজের জন্য গণিতের জিনিসগুলোর সত্যিকার অস্থিত্বের প্রয়োজন নেই।

গণিতের একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বাক্য নিয়ে ব্যাপারটি আমরা পরীক্ষা করে দেখি। ধরা যাক্ বাক্যটি হলো '৪ একটি জোড় সংখ্যা'। প্লেটোনিস্টদের কাছে ৪ একটি সত্যিকার অস্থিত্ব সম্পন্ন জিনিস। কাজেই তিনি মনে করবেন এই বাক্যটি ৪ নামক জিনিসটির একটি গুণ বর্ণনা করছে; যেমন ভাবে 'আম একটি মিষ্টি ফল' এই বাক্যটি আম নামক জিনিসটির একটি গুণ বর্ণনা করে। তিনি অবশ্য এও জানেন যে আম জিনিসটি বাস্তব হলেও ৪ জিনিসটির বাস্তব অস্থিত্ব নেই, বরং তাঁর মতে একটি অদ্ভুত বিমূর্ত অস্থিত্ব আছে যা স্থানে বা কালে নয়— এর সবকিছু থেকেই যা স্বাধীন। অন্যদিকে ফিকশনালিস্টদের কাছেও বাক্যটি ঠিকই মনোযোগ পাবে। তাঁরা বলবেন বাক্যটি এমন ভাবে রচিত হয়েছে যেন এতে অদ্ভুত একটি বিমূর্ত অস্থিত্ব থাকা ৪ জিনিসটির একটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু আসলে এরকম কোন বিমূর্ত জিনিস বলে কিছু নেই। কাজেই ওই বাক্যটি সত্য নয়। 'রাজপুত্র পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসেছে' এই বাক্যটি যেমন সত্য নয় পঙ্খীরাজ ঘোড়া বলে কিছুর সত্যিকার অস্তিত্বের অভাবে, তেমনি '৪ একটি জোড় সংখ্যা' এই বাক্যটি আসলে সত্য নয় ৪

জিনিসটির সত্যিকার অস্থিত্বের অভাবে। গণিতের কোন থিওরির, কোন বাক্যের জিনিসগুলোর অস্থিত্ব নেই বলে ওই থিওরি এবং ওই বাক্যগুলো আসলে সত্য নয়। এটিই ফিকশনালিজম। এর মানে অবশ্য এই নয় যে গণিত সম্পর্কে আলোচনা মানেই গাল-গল্পের চেয়ে বেশি গুরুত্ব তার নেই। বরং ৪ সম্পর্কে ওই গাণিতিক বাক্যটি সত্য না হলেও গণিতের জগতে ফলপ্রসূ। এমনি ভাবে তার থিওরি ও বাক্যগুলো অস্থিত্বের প্রশ্নে সত্য না হলেও গণিত কিন্তু যথারীতি ফলপ্রসূ। এভাবে সত্য না হওয়াটি গণিতের জন্য খুব পিলে-চমকে দেয়া কোন ব্যাপার নয়, কারণ গণিতের ব্যাখ্যায় এর যে বিকল্পগুলো রয়েছে সেগুলো আরো বেশি পিলে-চমকে দেবার মত। সেটিই এখন আমরা দেখবো।

৪ জিনিসটির যে কোন অস্থিত্ব নেই এ কথা প্লেটোনিজমের বিরোধী অন্যরাও বলেন— ফর্মালিস্টরা, ইনট্যুইশিনিস্টরা সবাই। ওই বাক্যটির ব্যাপারে ফর্মালিস্টরা বরং আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বল্‌বেন বাক্যটি সত্য-মিথ্যা হবার ব্যাপারতো পরের কথা এটি কোন বৈধ বাক্যই নয়। অস্থিত্বহীন কোন কিছুর গুণ এরকম সরাসরি বলার এখতিয়ার কোন বাক্যের নেই। বৈধ হবার জন্য বাক্যটির গঠনটি অন্য রকম হওয়া প্রয়োজন ছিল। যেমন বলা যেতো 'সংখ্যা বলে যদি কিছু থাকতো তাহলে ৪ একটি জোড়-সংখ্যা হতো'। তখন বাক্যটি বৈধ হতো। ফর্মালিস্টরা সহ অনেকে এরকম বল্‌লেও প্লেটোনিস্টরা এর সঙ্গে একমত হবেন না। কারণ তাঁদের মতে সাধারণ মানুষ এবং গণিতবিদরা যখন গণিতের কাজ করেন, যেমন যখন ৪ সংখ্যাটি সম্পর্কে কোন কিছু বলেন, তখন ৪ এর অস্থিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ মনে না রেখেই তা বলেন। কাজেই এধরণের গাণিতিক বাক্যের বৈধতার কোন অভাব নেই। প্লেটোনিস্টদের কাছ থেকে এমন কথাই প্রত্যাশিত। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তাঁদের একেবারে বিপরীত মেরুর ফিক্‌শনালিস্টরাও ঠিক একই কথা বলেন। ৪ এর অস্থিত্ব স্বীকার না করেও কল্পকাহিনীর বাক্য হিসেবে ওই বাক্যটির বৈধতা তাঁরা মেনে নেন। বাক্যটি সত্য কি মিথ্যা সেটি ভিন্ন কথা, এতে থাকা জিনিসের অস্থিত্ব থাকলে সত্য হবে, অস্থিত্ব না থাকলে মিথ্যা হবে; কিন্তু বাক্যটিতে বৈধতার কোন কমতি নেই, যেমন উপন্যাসের বাক্যে বৈধতার কোন কমতি নেই। এখানে একই পক্ষের লোক হয়েও ফর্মালিস্ট আর ফিকশনালিস্টদের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে।

ইনট্যুইশিনিস্টদের দৃষ্টিতে তাকালেও ওই বাক্য নিয়ে সমস্যা আছে। তাঁরা তো গণিতের সব জিনিসকে মস্তিষ্কের অংশ মনে করেন। সেই অর্থে ওই বাক্যটি সঙ্গত হবে যদি তাকে মস্তিষ্কে স্থান দেয়া যায়। ইনট্যুইশিনিস্টরা মনে করেন বাক্যটিকে ঠিকই মস্তিষ্কে স্থান দেয়া যায় এবং সে জন্য গণিতের বাক্য নিয়ে গণিতবিদরা কাজ করতে পারেন। কিন্তু ইনট্যুইশিনিজমে সমস্যা দেখেন এমন অনেকে বলবেন বাক্যটির মধ্যে যে ৪ সংখ্যটি রয়েছে তার জন্য মস্তিষ্কে

একটি জায়গা থাকতে হবে। আর তাই যদি হয় ৪ ছাড়াও অসীম সংখ্যক যে সংখ্যা রয়েছে তাদের জন্যও মস্তিষ্কে আলাদা আলাদা জায়গা থাকতে হবে। যেহেতু সেটি সম্ভব নয়। তাই এ বাক্যটিকেও মস্তিষ্কে ধারণ করা সম্ভব নয়। বোঝা যাচ্ছে যে এই বাক্যটি প্লেটোনিস্টদের কাছে সত্য এবং বৈধ, ফর্মালিস্টদের ও ইনট্যুশিনিস্টদের কাছে অসত্য ও অবৈধ, ফিকশনালিস্টদের কাছে অসত্য কিন্তু অবৈধ নয়।

বিজ্ঞানের সঙ্গে গণিতের দারুণ সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য করে অনেকে এত ঝামেলায় না গিয়ে গণিতকে সোজা বিজ্ঞানের অংশ মনে করেন। তাঁরা জোর চেষ্টা করেন এটি বোঝাতে যে গণিত আসলে প্রকৃতির বাস্তব জিনিসগুলো নিয়েই কাজ করে; কাজেই এর জিনিসগুলোর ব্যাপার এত রকমের অদ্ভুত কসরতের দরকার নেই। যেমন ২+২=৪ এই গাণিতিক বাক্যটিকে তাঁরা বিমূর্ত কিছুতে গড়া মনে করেন না, খেলার চিহ্নে গড়া বলেও মনে করেন না, মস্তিষ্কের অংশে গড়া বলেও মনে করেন না, কল্পকাহিনীতে গড়া বলেও মনে করেননা। তাঁরা বলার চেষ্টা করেন যে বাক্যটিতে শুধু এক জায়গায় রাখা কোন সত্যিকার বস্তুর দুটি স্তূপের কথা বলা হয়েছে যা এরকম আরো দুটো স্তূপের সঙ্গে যোগ করে ৪টি স্তূপ পাওয়া যায় একথা বলা হয়েছে। বস্তুর কথা স্পষ্টভাবে না বল্‌লেও এতে প্রচ্ছন্ন ভাবে ওরকম সত্যিকার ধরাছোঁয়ার বস্তুর কথাই বোঝানো হয়েছে। কাজেই বাক্যটি গণিতের বাক্য হয়েও বিজ্ঞানেরও বাক্য— এর মধ্যে অন্য কোন রহস্য নেই। তবে বোঝাই যায় গণিতের জিনিসকে এভাবে বিজ্ঞানের জিনিস বলে চালানো সহজ নয়। বিজ্ঞানের কথা বলে গণিতের জিনিসের মূল সমস্যাটি এড়ানো যায়না। গণিত ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

একেবারে সাম্প্রতিক কালে এসে গণিতবিদ আর দার্শনিকদের কাছে গণিতের জিনিসগুলোর দুরকমের ব্যাখ্যাই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে— বরাবরের মতো প্রচ্ছন্ন ভাবে হলেও অনেকের মধ্যে প্লেটোনিজমের ধারণাটি কাজ করছে, বাকিদের কাছে ফিক্‌শনালিজমই প্রধান। প্লেটোনিজমের বিরোধী অন্য বিকল্পগুলো ইতোমধ্যে নানা বিপত্তির মধ্যে পড়ায় ধার হারিয়েছে— তার কিছু কিছু আমরা দেখেছি। আমাদের সেই গাণিতিক ব্যাক্যটির নিরিখে এই প্লেটোনিজম আর ফিকশনালিজমকে আবার দেখা যাক। একটি ব্যাপারে উভয়ে একমত। '৪ একটি জোড় সংখ্যা' এই বাক্যটি উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য; যদিও প্লেটোনিস্টরা এটিকে সত্য বাক্য মনে করে, আর ফিকশনালিস্টরা একে কল্পকাহিনীর বাক্য মনে করে। ভাষাগত ব্যাপারে বাক্যটির বিষয়ে উভয়ের কারো আপত্তি নেই। তবে গণিতের জিনিসের বিমূর্ত অস্থিত্বের ব্যাপারে এবং সেই সুবাদে গণিতের বাক্য সত্য হবার ব্যাপারে প্লেটোনিস্টদের মতবাদ যে ধোপে টেকেনা তা আমরা দেখেছি, এতে অনেকেরই স্বতপ্রণোদিত সমর্থন

সত্ত্বেও। কিন্তু ফিকশনালিজমের কথা মত এদেরকে কল্পকাহিনী বলা চলে কিনা, এবং সেরকম বল্‌লে তাতে গণিতের কাজ চলে কিনা সেটি একটু দেখা দরকার।

গণিতকে গল্প-উপন্যাসের মত জিনিসে গড়া মনে করাতে একটি বড় প্রশ্ন যেটি ওঠে তা হলো সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মত একেবারেই বাস্তব প্রকৃতির তত্ত্বের সঙ্গে এগুলো হুবহু মিলে যায় কী ভাবে? বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো নানা ভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এগুলো বাস্তব প্রকৃতির আচরণ সঠিক ভাবে তুলে ধরতে দেখা গেছে। তা হলে এসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত গণিতের জিনিসগুলো কল্পকাহিনী হয় কী করে? যদিও বা প্লেটোনিস্টদের কথা মত গণিতের জিনিসের একরকম বিমূর্ত অস্থিত্ব থাকেও সেগুলোর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না, তাই সেগুলো বিজ্ঞানের বাক্য হয়না। ফিকশনালিজমের মতে গণিতের জিনিসের অস্থিত্বই নেই কাজেই তা নিয়ে বিজ্ঞানের বাক্য হবেনা। আমাদের সামনে বিজ্ঞানের বাক্যের একটি সেট এবং গণিতের বাক্যের একটি সেট পাশাপাশি আলাদা ভাবে রয়েছে— প্রথমটির অস্থিত্ব আছে, কার্যকারণ সম্পর্কও আছে; দ্বিতীয়টিতে বাক্যের উপাদানগুলো কল্পকাহিনী হলেও ভাষার গঠনের কারণে তার এক রকম বাস্তবতা প্রকাশ পায় (আমরা যেভাবে গল্প-উপন্যাসকে বাস্তব ধরে নিয়েই পড়ি)। শুধু এই কারণেই কি নিখাদ বাস্তবভিত্তিক বিজ্ঞানের বাক্যগুলোর সঙ্গে সত্য নয় এমন এই দ্বিতীয় রকম বাক্যগুলোর কাজ কারবার চল্‌তে পারে? চল্‌লে কী ভাবে চলে? এক্ষেত্রে ফিকশনালিস্টদের বক্তব্য হলো সেগুলো নিজে অবাস্তব হয়েও বাস্তব জিনিসের বর্ণনাকে সাহায্য করে— গণিত আমাদের বাস্তবতার দাবীদার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোকে ভাল ভাবে উপস্থাপনের সুযোগ করে দেয়। গণিতের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব না করাতে পারলে এই উপস্থাপন কঠিন হতো।

উদাহরণ স্বরূপ আমাদের সংখ্যা ব্যবস্থাটি কল্পকাহিনী হলেও একটি বাস্তব সিস্টেমের উত্তাপ ব্যবস্থার উপস্থাপনে এটি খুবই সক্ষম একটি পথ করে দেয়। কোন উত্তাপকে '০' কোন উত্তাপকে '১০০', এবং কোন উত্তাপকে ঋণাত্মক সংখ্যা ধরে এটি সম্ভব হয়। অথচ ০, ১০০ বা —১০০ সবই কল্পকাহিনী মাত্র; উপস্থাপনে সক্ষম হবার জন্য এগুলো সত্য হবার কোন প্রয়োজন নেই। বরং বলা যায় সত্য হওয়াটি এক্ষেত্রে কোন কাজে আসে না!

কিন্তু এক্ষেত্রে পার পেলেও ফিকশনালিজমকে আরো একটি কঠিন প্রশ্নের সম্মূখীন হতে হয়, এ প্রশ্ন বিজ্ঞানের বাস্তবতার সঙ্গে গণিতের মেলা না মেলার ব্যাপার নয়, বরং কল্পকাহিনী তৈরির সুযোগ নিয়ে গণিতের নিজের মধ্যেই খামখেয়ালী কোন বক্তব্য দিতে পারা না পারার প্রশ্ন। গণিত যদি গল্পই হবে তবে কেন ২+২=৪ কে আমরা শুদ্ধ মানি, কেন ২+২=৫ কে আমরা অশুদ্ধ বলি? দুটিই তো দু'রকমের গল্প মাত্র। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় গণিতের

কোন বাক্য স্পষ্টত শুদ্ধ, আবার কোন বাক্য স্পষ্টত অশুদ্ধ। তার মানে গণিতে এই দুইকে আলাদা করার কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে, কল্পকাহিনী হলেও এখানে খামখেয়ালী ভাবে কিছু চলেনা। কিন্তু সেটি কী ভাবে? এই ব্যাপারে ফিকশনালিজমের বক্তব্য হলো ২+২=৪ এবং ২+২=৫ এর মধ্যে পার্থক্য হলো সান্টা ক্লজের পোষাক লাল হওয়া অথবা তা সবুজ হওয়ার মত। সান্টা ক্লজের লাল পোষাককেই সবাই সঠিক বলে জানে, সবুজ পোষাককে নয়! অথচ সান্টা ক্লজ নিজেই সত্য কিছু নয়— এটি একটি গল্পের কাল্পনিক চরিত্র। তার আবার সঠিক পোষাক বেঠিক পোষাক হবার মানে কী? না, গল্প হলেও যে গল্পে সবাই অভ্যস্ত হয়েছে তাতে সান্টা ক্লজের পোষাক লাল— কাজেই সেটিই সঠিক। গণিতের ব্যাপারটিও তাই। ফিকশনালিস্টদের মতে ২+২=৪ এবং ২+২=৫ এই কোনটির মধ্যেই কোন সত্যতা নেই একথা ঠিক (সান্টা ক্লজের লাল বা সবুজ পোষাকের মতই)। তবে এই দুইয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে, ২+২=৪ বাক্যটি একটি জানা গল্পের অংশ— গণিতের গল্প। ২+২=৫ বাক্যটি সেই গল্পের অংশ নয়। গণিতের গল্পটি একটি নিয়ম বাঁধা সিস্টেমের (ফর্মাল সিস্টেম) অংশ, যেকথা ফর্মালিজমও বলে থাকে। মানুষের যুক্তির ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এই সিস্টেমটাই সবাই গ্রহণ করেছে যাতে স্বতসিদ্ধ থেকে শুরু করে গণিতের সব কিছু গল্পে এসেছে; যেমন বরফ ঢাকা মেরু অঞ্চল থেকে হরিণে টানা স্লেজ গাড়িতে চড়ে সান্টা ক্লজের সব কিছু গল্পে এসেছে, তার লাল পোষাক সহ।

গল্প হয়েও গণিতে শুদ্ধাশুদ্ধির বিচারটি কেমন করে আসে সেই ব্যাপারে আরো একটি ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যাকাররা গল্পের খাতিরে প্লেটোনিজমের বলা গণিতের জিনিসগুলোর অস্থিত্ব আপাতত মেনে নেন। আর এদের অস্থিত্ব সত্য হলে যা যা সঠিক হতো, এবং যা যা বেঠিক হতো সেগুলোকেও সেভাবেই মেনে নেন। এভাবে অস্থিত্ব আসলে না মেনেও মানার মত করেই ফিকশনালিস্টরা তাঁদের গল্পকে অর্থাৎ গণিতকে সাজান। ওখানে তাঁদেরকে তাই ২+২=৪ কে ২+২=৫ থেকে আলাদা করে শুদ্ধ ভাবে নিতে কোন অসুবিধা হয়না। এ যেন গল্পের সুয়োরাণী সত্যি সত্যি নেই জেনেও, যদি সত্যি তিনি থাকতেন তা হলে তিনি কী রকম দয়ালু হতেন, দুয়োরাণীর মত নিষ্ঠুর হতেন না তার সব কিছু মেনে নেয়া। এভাবে প্লেটোনিস্টদের মত গণিতের জিনিসের অস্থিত্বে বিশ্বাস না করেও ফিকশনালিস্টরা নিজেদের গণিতের গল্পে অস্থিত্ববাদীদের সব সঠিক ও বেঠিক ফলাফলের পার্থক্য ঠিকই করতে পারেন।

গণিত কী কী ভাবে গল্প-উপন্যাসের মত তা নিয়ে ফিকশনালিস্টদের নিজেদের মধ্যেও কিছু কিছু মতপার্থক্য আছে। যেই গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে আমরা নিত্য পরিচিত সে যে গণিতের মত নয় তা তো সবাই মানবেন। গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে গণিতের তুলনা তাই বিশেষ বিশেষ ব্যাপারকে বোঝাবার

জন্যই। একটি বিষয়ে গণিত যে মোটেই সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের মত নয় সেটি স্পষ্ট। গণিতের সংখ্যা ইত্যাদির কোন সত্যিকার অস্থিত্ব আছে কিনা তার ওপর বাস্তবিক কোন ফল নির্ভর করেনা। অন্তত প্লেটোনিস্টদের বাইরে কেউ মনে করেননা যে এই অস্থিত্বের প্রশ্নটির কোন বাস্তব কার্যকারিতা আছে। বিজ্ঞানের কাজে বা সাধারণ জীবনের কাজে আসার ক্ষেত্রে গণিতের সাফল্য ওই অস্থিত্ব থাকা বা না থাকার ওপর নির্ভর করেনা। কিন্তু আমাদের গল্প-উপন্যাসে ব্যবহৃত দেশ-কাল-পাত্র এসব সত্যিই বাস্তবে আছে কি নেই সে প্রশ্ন মোটেই অবান্তর নয়, এটি গল্প-উপন্যাসের ফলাফলকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে। গল্পটি কি সত্যিকারের দেশ ও মানুষের সম্পর্কে, না রূপকথার কোন আজগুবি চরিত্র সম্পর্কে সেটি জানাটি খুবই জরুরি। কাজেই সব ব্যাপারে গণিত যে গল্প-উপন্যাসের মত নয় তা বলাই বাহুল্য।

ইনট্যুইশিনিজম এবং ফিকশনালিজম উভয়ে গণিতকে উদ্ভাবিত মনে করলেও এই দুইয়ের তফাত সহজে করা যায়। ফিকশনালিজমের কাছে গণিতের জিনিস একেবারেই কল্পকাহিনী হলেও ইনট্যুইশিনিজম অন্তত একে মস্তিষ্কের ভেতর এক ভাবে খুঁজে পাওয়ার কথা স্বীকার করে— সেই সুবাদে এর এক রকম সত্যতা মেনে নেয়। কিন্তু ফর্মালিজম আর ফিকশনালিজমের মধ্যে পার্থক্য কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? উভয়েই তো মনে করে গণিতের জিনিস অসত্য, অস্থিত্বহীন। তবে লক্ষ্যণীয় যে ফর্মালিজম এসবের অস্থিত্ব, অর্থ, সত্যতা সব কিছু অস্বীকার করেও এদেরকে চিহ্নের মত ধরে নিয়েও, চোখের সামনে এসব আছে বলে এক রকম ভাণ করে; আমরা যেভাবে বোর্ড, গুটি ইত্যাদিকে চিহ্ন হিসেবে নিয়েও বাস্তবে একটি খেলা চল্‌ছে বলে ভাণ করি। এমন ভাবে ভাণ করি যেন আমরা দাবার গুটির চাল দিয়ে সত্যি সত্যি এক রাজ্য জয় করছি। ফর্মালিস্টরা এটি করেন বটে, কিন্তু ফিকশনালিস্টরা এই ভাণটুকুও করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। তাঁরা সরাসরি গণিতের জিনিসকে কল্পকাহিনীই মনে করেন। তাঁদের এই চাঁছাছোলা স্বীকারেক্তিই ফিকশনালিস্টদেরকে সাম্প্রতিক গণিতের সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাকারের মর্যাদা দিয়েছে।

গণিত: সৌকর্যময় এক অদৃশ্য দালান

এ দালানের ভিত্:

অল্প কিছু স্বতসিদ্ধের ওপর গড়ে ওঠা জ্ঞানের এক বহু-মহলা নির্মাণ— গণিতের এই পুরো ব্যাপারটিকে এক অদৃশ্য দালান রূপে কল্পনা করা যায়। অদৃশ্য হলেও এ দালানের সৌকর্য, তার অলিগলির প্যাটার্ন এবং তার বহুতরো ব্যবহার এগুলো সবার কাছে একেবারেই ধ্রুব এবং নিশ্চিত । অবশ্য একটু আগেই আমরা দেখেছি দালানটির প্রকৃতি, এমনকি কোন্ অর্থে দালানটি রয়েছে

সে সব নিয়ে মোটেই ঐক্যমত্য নেই। একদল বলেন আমরা দেখি আর না দেখি, দালানটি বরাবরই তার সকল সম্পূর্ণতা নিয়ে ছিল এবং আছে। আমরা একে একটু একটু করে আবিষ্কার করছি। অন্যদল বলে এই দালানের পুরো ব্যাপারটি আমাদের নিজের উদ্ভাবিত একটি কল্পকাহিনী মাত্র। কোন দলই অবশ্য এমন কথা বলেনা যে দালানটি অনর্থক ওখানে রয়েছে, এটি তার কাজ করেনা। কারণ সেটি বলার উপায় নেই।

সব দালানের মত সবার আগে গণিতরূপী এই দালানেরও প্রয়োজন তার ভিত্ (ফাউন্ডেশন)। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক গণিতবিদরা এই ভিতের সন্ধানে কাজ করেছেন। আমাদের পরিচিত ইউক্লিডের জ্যামিতির মধ্যেই এই সেই চেষ্টাটি দেখতে পাই। তাতে ভিত্টি হলো ইউক্লিডের স্বতসিদ্ধগুলো— যেগুলো প্রমাণ না করেই স্পষ্ট সত্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে। বাকি পুরো জ্যামিতিটি, থিওরেমের পর থিওরেম মূলত এই ভিতের ওপরেই গড়ে তোলা হয়েছে। একটি থিওরেমের প্রমাণের ভার গিয়ে পড়েছে এর আগে প্রমাণিত অন্য থিওরেমের ওপর। পুরো সেই দালান এভাবে গড়ে ওঠেছে। শুধু জ্যামিতি কেন, গণিতের সব শাখাই এভাবে কিছু স্বতসিদ্ধের ওপর গড়ে ওঠেছে।

গ্রীকদের কাছে পুরো গণিতের ভিত্ হিসেবে নেবার জন্য দুটি বিকল্প ভিত্ ছিল— একটি হলো পাটিগণিতের ভিত্, অন্যটি জ্যামিতির ভিত্। আসলে গণিতের ভিত্ হিসেবে এই দুইয়ের যে বিতর্ক, তা তাঁদের ওই সময়ের আর একটি দার্শনিক বিতর্কের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ওই বিতর্কের একদিকে ছিল ডেমোক্রিটাসের এটমিক থিওরি— যা বলে সব বস্তু অতি ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অবিভাজ্য এটমের তৈরি; আর অন্যদিকে ছিল তার বিপরীতে ছিল সব কিছু একটানা ও নিরবিচ্ছিন্ন এমন ধারণা। পাটিগণিত যে সব বিচ্ছিন্ন স্বাভাবিক সংখ্যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সেগুলো এটমের সঙ্গে তুলনীয়, আর জ্যামিতি যে সব নিরবিচ্ছিন্ন বিন্দুতে গড়া রেখার সৃষ্টি তা নিরবিচ্ছিন্নতার দর্শনের সঙ্গে তুলনীয়। পাটিগণিতে গোণার ব্যাপার আছে, জ্যামিতিতে তা নেই।

শুরুতে পিথাগোরাস ও তাঁর অনুসারীদের সংখ্যাকেই জগত মনে করার দর্শনের কারণে তাঁরা পাটিগণিতকেই গণিতের ভিত্ মনে করতেন। পিথাগোরীয়ানদের কাছে সবই ছিল সংখ্যার গুণে গুণান্বিত; এমন কি জ্যামিতিও সংখ্যার সৃষ্টি। এক বিন্দু সৃষ্টি করে জ্যামিতিক বিন্দু, দুই বিন্দু সৃষ্টি করে সরল রেখা, এক সরল রেখায় নয় এমন তিন বিন্দু ত্রিভুজ, এবং এক সরল রেখায় বা এক তলে নয় এমন চার বিন্দু সৃষ্টি করে টেট্রাহেড্রনের মত ঘন আয়তন। সঙ্গীতের সুরের মধ্যেও তাঁরা সংখ্যার সরল অনুপাত দেখতে পেয়েছেন। তাঁদের মতের বিস্তৃতি ঘটিয়ে প্লেটো এবং তাঁর অনুসারীরা গণিতের সরল ঘন আয়তনগুলোকে সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অমূলদ বা অযৌক্তিক সংখ্যা, অসীম সংখ্যা ইত্যাদিতে সৃষ্ট বিপত্তির

কারণে গ্রীকরা পরে গণিতের ভিত্ হিসেবে জ্যামিতির দিকেই ঝুঁকেছিলেন। পাটিগণিতের এই অনিয়ম তাঁদেরকে মর্মাহত করেছিলো বলেই এটি ঘটেছিলো। এ পর্যন্ত তাঁরা যে কোন স্বাভাবিক সংখ্যার ভগ্নাংশকে দুটি জ্যামিতিক সরল রেখার দৈর্ঘের অনুপাত হিসেবে প্রকাশ করতে পারছিলেন। জ্যামিতি ও পাটিগণিত উভয়ের ভিতের মধ্যে একটি সুন্দর ঐক্য ছিল। কিন্তু এর মত অমূলদ সংখ্যা এসে এমন অযৌক্তিক কিছু সামনে আনলো যার জ্যামিতিক অস্থিত্ব থাকলেও সংখ্যার স্বাভাবিকতায় তার স্থান নেই— তাকে কোন দুই সংখ্যার বা দুই রেখার অনুপাত হিসেবে প্রকাশ করা যায় না। ওদিক জেনোর প্যারাডক্সগুলো অসীম সংখ্যার ধারণা এমন ভাবে এনেছিলো যে তাতে পরিবর্তনের বা গতির যুক্তি অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। সেই থেকে শুরু হয়ে হাজার বছর ধরে গণিতের ভিত্ হিসেবে জ্যামিতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব চলে এসেছে।

একেবারে আধুনিক সময়ে এসেই শুধু গণিতের এই ভিত্ খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সত্যিকার পরিবর্তন ঘটেছে। গণিতবিদ হিলবার্টকে, এবং তাঁর সঙ্গে ফ্রেগে, ক্যান্টর, গোয়েডেল প্রমুখকে বলা যায় আধুনিক গণিতের ভিত্ খুঁজে পাওয়ার রূপকার। হিলবার্ট এ সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন তুল্লেন যা গ্রীক গণিতবিদরা এক রকম এড়িয়েই গিয়েছিলেন। প্রথম প্রশ্নটি হলো সব গাণিতিক বাক্যকেই কি হয় স্বতসিদ্ধ হতে হবে, নইলে থিওরেম হতে হবে? এর বাইরে কি গাণিতিক বাক্য সম্ভব নয়? হিলবার্ট দেখালেন ওই দুইরের বাইরেও গাণিতিক বাক্য হতে পারে। হিলবার্টের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল একটি গাণিতিক বাক্য আদৌ একটি থিওরেম হতে পারে কি পারে না একে যান্ত্রিক ভাবে পরীক্ষা করে তার একটি হ্যাঁ বা না উত্তর পাওয়া যায় কিনা। গ্রীকরা তা সম্ভব মনে করলেও হিলবার্টের উত্তর হলো তা সম্ভব নয়। এই দুটি প্রশ্নের নতুন উত্তর গণিতের চিরাচরিত ভিতকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে তাকাবার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলো।

সংখ্যার সেটগুলো যে অসীম তার প্রকৃতি ক্যান্টরের হাতে নতুন মানে পেলো তিনি দেখলেন ১,২,৩..... ইত্যাদি স্বাভাবিক সংখার সেট যেমন অসীম; তেমনি ঋণাত্মক ও ধনাত্মক সব পূর্ণ সংখ্যা এবং সব ভগ্নাংশ নিয়ে মূলদ সংখ্যার যে সেট তাও অসীম; এবং মজার ব্যাপার হলো এই দুই অসীম সেটই পরস্পর সমান। প্রথম দৃষ্টিতে সে রকম মোটেই মনে হয়না। কিন্তু এই দুই অসীম সেটের প্রথমটির এক একটি ইলিমেন্টকে দ্বিতীয়টির এক একটি ইলিমেন্টের বিপরীতে একের সঙ্গে এক সম্পর্কে স্থাপন করে তিনি দুটি সেটের এই সমতা প্রমাণ করেছেন। একই ভাবে তিনি প্রমাণ করলেন মূলদ অমূলদ সব সংখ্যা অর্থাৎ সব 'প্রকৃত সংখ্যার' যে অসীম সেট সেটি আগের দুটি অসীম সেটের চেয়ে বড়। সেই সঙ্গে ক্যান্টর ও অন্যান্যরা দেখালেন সেট থিওরিই

হলো গণিতের আসল ভাষা। গণিতের ভিতে মূল যে উপাদান সেই সংখ্যাকেই সেটের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এই সেটের মধ্যেই রয়ে গেছে গণিতের আসল ভিত।

কোন ইলিমেন্ট নেই এমন যেই সেট সেটি হবে শূন্য সেট। এটি শূন্যের ধারণার সূচক। এই শূন্য সেটকেই এক মাত্র ইলিমেন্ট করে আমরা আর একটি সেট তৈরি করতে পারি; সেটি হবে সেটের সেট, যার একটি মাত্র ইলিমেন্ট একটি সেট (শূন্য সেট)। ১ সংখ্যাটি ধারণা এই সেট থেকেই এসেছে। এখন শূন্য সেট এবং এই ১ সূচক সেট এই দুটি সেটকে ইলিমেন্ট করে আর একটি সেট রচিত হতে পারে, সেটি হবে ২ সংখ্যাটি সূচক। এই শেষোক্ত সেটটিও আগের দুটি সহ মোট তিনটি সেটকে ইলিমেন্ট করে আসে ৩ সূচক সেটটি। এমনি ভাবে ৪,৫,৬ করে অসীম পর্যন্ত সব সংখ্যার সূচক সেট আমরা পাব। এর সব সেটই হবে শুধু সেটের সেট— অন্য কোন রকম ইলিমেন্ট এর কোথাও নেই। এই সেটই তাই সব সংখ্যার এবং তাই গণিতের আসল ভিত্তি।

সেট থিওরিতে দুটি সেটের মধ্যে (সেটি যা কিছুর সেটই হোক না কেন) পাটিগণিতের মত যোগ বিয়োগ প্রক্রিয়াগুলো একটু অন্য ভাবে করা হয়। এ সবের মূলে আছে সেই প্রাচীন গ্রীকদের উদ্ভাবিত লজিকের মত প্রক্রিয়া। এই লজিক সব চেয়ে ভাল দেখা যায় কম্পিউটারের ক্ষেত্রে— যেখানে লজিকের যুক্তির কোন নড়চড় হবার কোন সুযোগ নেই, কারণ কম্পিউটার কাজই করে তার বিদ্যুৎ বর্তনীর অনুসরণ করা লজিকের সাহায্যে। লজিককে গাণিতিক যুক্তিতে প্রকাশ করেছিলেন জর্জ বুল নামক গণিতবিদ (বুলিয়ান এলজেব্রায়)। বলা যায় জর্জ বুল লজিককে গণিতে পরিণত করেছিলেন। ফ্রেগে, বার্ট্রান্ড রাসেল ও অন্যান্যরা এর ঠিক বিপরীত কাজটি করেছেন— তাঁরা গণিতকে লজিকে পরিণত করেছেন।

সেট থিওরিতে দুটি সেটের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যে লজিক কী ভাবে আসে কিছুটা দেখা যাক। দুটি সেটের কন্‌জাংশন বা সংযোজন বলতে যা বোঝায় তার ফল হলো আর একটি সেট যাতে আগের দুটার সব ইলিমেন্ট অন্তর্ভূক্ত। এ যেন লজিকের দুটি বক্তব্যের সব উপাদানকে একত্র করে দেখা। সেটের পাটিগণিতে দুটি সেটের মাঝখানে AND (এবং) চিহ্নটি ব্যবহার করে এটি বোঝানো হয়। একই ভাবে দুটি সেটের ডিস্‌জাংশন বা বিয়োজনের ফল দাঁড়ায় দুটি সেটেই আছে এমন ইলিমেন্ট নিয়ে একটি সেট। লজিকের ভাষায় দুই বক্তব্যে একইভাবে আছে সেই বক্তব্য। দুটি সেটের মাঝখানে OR (অথবা) চিহ্ন দিয়ে এটি বোঝানো হয়। লজিকে একটি বক্তব্য দিয়ে তার উল্‌টো বক্তব্যকে নেগেশন বা বিপরীত বলা হয়। সেট থিওরিতে এটি একটি সেটের NOT (না) রূপ হিসেবে নেয়া হয়। AND, OR, NOT ছাড়াও আরো এরকম সম্পর্ক লজিকে ও সেট থিওরিতে রয়েছে। লজিকের জ্ঞান সেই

এরিস্টোটলের লজিক চর্চার মতই প্রাচীন হলেও লজিকের সঙ্গে গণিতের এই অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্কটি খুঁজে পাওয়া গেছে আধুনিক কালে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথমত ফ্রেগের অবদানে।

এই ফ্রেগেই গণিতের জিনিসগুলোকে সত্যিকার অস্থিত্ব সম্পন্ন জিনিস হিসেবে না দেখে বরং তাকে কিছু সম্পর্কের নিয়ম বা খেলার নিয়মের মত ফর্মালিজম হিসেবে দেখার প্রস্তাব করেছিলেন। এই নিয়ম লজিক মেনে চলে। আরো পরে বার্ট্রান্ড রাসেল ও হোয়াইটহেড তাঁদের 'গণিতের নীতি' নামক অত্যন্ত আটঘাঁট বাঁধা পরিশ্রমসাপেক্ষ গ্রন্থে পুরো গণিতকে একেবারে চুলচেরা লজিকের আকারে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। এর জন্য তাঁরা গণিতের মধ্যে লজিকে ব্যবহৃত চিহ্নগুলোও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাসেল নিজেই এই প্রচেষ্টায় একটি বড় রকমের বাধার কথা স্বীকার করেছেন। অন্য গণিতবিদরা গণিতে নতুন কিছু স্বতসিদ্ধ এনে এই বাধারও অতিক্রম করার চেষ্টা করতে পেরেছেন। এভাবে গণিতকে নিখাদ লজিক হিসেবে দাঁড় করাবার মূল লক্ষ্যটিকে গণিতবিদরা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। একথা সত্যি যে গণিতরূপী ওই অদৃশ্য দালানের ভিত্‌টি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। এমন অপূর্ব সৌকর্যময় যে দালান তার ভিতের সন্ধানটি যুগে যুগে মানুষকে ভাবাবে এটিই তো স্বাভাবিক।

প্রমাণই এই সৌকর্যের প্রাণঃ

গণিতের সুন্দর সৃষ্টি হলো তার থিওরেমগুলো। গণিতের কোন বক্তব্যের পেছনে যখন প্রমাণ দেয়া যায়, তার সেই প্রমাণ যখন গণিতের বোদ্ধা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তখন এটি একটি থিওরেম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই থিওরেমগুলোই হলো সেই গণিতরূপী অদৃশ্য দালানের কক্ষ, অলিন্দ, অলিগলি— যাদের নিয়ে এই অপূর্ব সৃষ্টি। এই থিওরেমগুলো তাদের নিজস্ব সৌন্দর্যের জন্য গণিতের ছাত্র এবং বোদ্ধার কাছে যে সুন্দর জগতটি তৈরি করে তার আবেদন যে কোন মহৎ শিল্পকর্মের মতো। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো এর নির্ভুলতা ও অনিবার্যতা। প্রমাণ সেই ব্যাপারটিই নিশ্চিত করে। এই মহৎ শিল্পকর্ম যা নিজেই নিজের সৌন্দর্যে যথেষ্ট মনোমুগ্ধকর— তার অনেকখানিই আবার অদ্ভুত ভাবে বিজ্ঞানসহ প্রায়োগিক সব কাজে খাপে খাপে মিলে দারুণ সহায়ক হয়ে ওঠে।

প্রমাণের মধ্যে যুক্তি দিয়ে দেখানো হয় যে থিওরেমটি সঠিক, এবং সর্বদা ও সব পরিস্থিতিতেই তা সঠিক। এর জন্য কয়েকটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কয়েকটি বিভিন্ন উদাহরণ নিয়ে তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একে সঠিক প্রমাণ করলেই চলেনা— কারণ যতটাই করিনা কেন তার বাইরে আরো উদাহরণ থেকে যাবে। বরং যৌক্তিক বিশ্লেষণে এমনভাবে দেখাতে হবে যে সম্ভাব্য সব পরিস্থিতি ও সব

উদাহরণের জন্য এটি সঠিক হতে বাধ্য। এই কাজে ইতোমধ্যে প্রমাণিত থিওরেমগুলোও ব্যবহার করা যায়। আমরা স্কুলের জ্যামিতিতে স্বতাসিদ্ধ থেকে শুরু করে একের পর এক উপপাদ্যগুলো (থিওরেম) প্রমাণ করে সেটি দেখেছি। একই মূল প্রক্রিয়া গণিতের অন্য সব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এর মধ্যে অবশ্য এও আমরা দেখেছি যে প্রমাণ সব সময় একেবারে কট্টর লজিকের যুক্তির ভাষায় করা হয়না— গণিতের বোদ্ধাদেরকে আশ্বস্ত করার মত সাধারণ যুক্তির ভাষায়ও এটি করা হয়— যেমন জ্যামিতিকে একটি ত্রিভুজকে আরেকটির ওপর আপতিত করে সর্বসম প্রমাণ করা। অবশ্য এরকম অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণের কাজ চলে গেলেও কড়াকড়ি দৃষ্টিতে দেখলে অনেক গণিতবিদ একে যথেষ্ট প্রমাণ মনে করবেন না। তাঁর কাছে গণিতের প্রমাণ হলো আনুষ্ঠানিক প্রমাণ (ফর্মাল প্রুফ)— যেটি লজিকের ভাষায় তার চিহ্নগুলোর সঠিক বিশুদ্ধতায় করতে হয়। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক প্রমাণ সচরাচর করা হয়না এই বিশ্বাসে যে সাধারণ ভাষার প্রচলিত যেকোন প্রমাণকে যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করে ওই রকম আনুষ্ঠানিক প্রমাণে পরিণত করা যাবে।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে প্রমাণের এমন একটি রাস্তা বের হয়েছে যেখানে আনুষ্ঠানিক প্রমাণই শুধু করা যায়, এবং তা না করে উপায়ও নেই। এটি হচ্ছে কম্পিউটারের সাহায্যে গাণিতিক থিওরেম প্রমাণ করা। কম্পিউটারকে আনুষ্ঠানিক প্রমাণের পথেই যেতে হয় কারণ কম্পিউটার নিজেও এই 'আনুষ্ঠানিক লজিকের' নিয়মেই কাজ করে। কিন্তু সমস্যা হলো মানুষের তৈরি করা প্রোগ্রামের ভিত্তিতে কম্পিউটার যখন এই লজিকের প্রমাণের কাজটি করতে থাকে সেই কাজের মধ্যবর্তী প্রত্যেকটি স্তর কিন্তু মানুষ অনুসরণ করতে পারে না, চেক্ করে দেখতে পারে না। এ কারণে অনেক গণিতবিদ কম্পিউটারের থিওরেম প্রমাণকে প্রমাণ বলে স্বীকৃতি দিতে চাননা— কারণ এর মধ্যে তাঁর প্রবেশাধিকার নেই।

সৃজনশীল একজন গণিতবিদ গণিতে কোন নতুন বক্তব্যের কথা যখন চিন্তা করেন, তখন একই সঙ্গে তার প্রমাণের কথাও চিন্তা করেন। প্রমাণসহ প্রকাশ করতে পারলেই তিনি একটি নতুন থিওরেম সৃষ্টির কৃতিত্ব পারেন। অবশ্য প্রমাণ খুঁজে পাওয়ার আগেই তিনি সেই গাণিতিক বক্তব্য বা সূত্রটিকে আন্দাজ করতে পারেন, অনেক সময় তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে সেটি ধরা দিতে পারে। ওই আন্দাজ করা অনুমানটি (কন্‌জেকচার) অন্য কোন থিওরেম থেকে যৌক্তিক ভাবে তাঁর কাছে ধরা দিতে পারে, কিংবা পৃথক পৃথক অনেকগুলো উদাহরণে এটি সঠিক হতে দেখে এর সত্যতা সম্পর্কে তিনি প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারেন। সব সময় এর প্রমাণ সহজে খুঁজে পাওয়া যায়না। স্পষ্টত সত্য এরকম গাণিতিক সত্য প্রমাণের অভাবে বহুদিন অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে। এর একটি বিখ্যাত উদাহরণ হলো 'ফার্মার শেষ থিওরেম' নামে পরিচিত

থিওরেমটি। গণিতবিদ ফার্মা ১৬৩৭ সালে এমনি একটি অনুমানের ভিত্তিতে একটি গাণিতিক সম্পর্ক প্রস্তাব করেছিলেন। এটি বলে $a^n+b^n=c^n$ এই সম্পর্কটি ২ এর থেকে বড় n এর যে কোন মান নিয়ে কখনো সত্য হবে না। পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে ফার্মা ঠিক অনুমানই করেছেন। n এর মান ১ দিলে এটি অনায়াসে অসংখ্য ক্ষেত্রে হতে পারে। n এর মান ২ নিলে পিথাগোরাসের থিওরেমের মধ্যেই সম্পর্কটি সত্য হতে দেখা যায়। কিন্তু n এর মান ৩ বা তার বেশি নিলে একটি ক্ষেত্রেও তা সত্য হতে দেখা যায়না। কিন্তু সেই সময় থেকে সাড়ে তিনশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে বহু গণিতবিদ অনেক চেষ্টা করেও এটি প্রমাণ করতে পারেননি। অবশেষে ১৯৯৪ সালে এন্ড্রু ওয়াইন্‌স এর প্রমাণ দিতে সক্ষম হন।

সাধারণত সরাসরি লজিকের প্রয়োগে থিওরেম প্রমাণ করা হয়; অর্থাৎ এই বক্তব্যটি সত্য হলে যৌক্তিক ভাবে ওই বক্তব্যটিও সত্য হবে— এমনি ধারায়। এর একটি খুব সহজ উদাহরণ নেয়া যাক। যে সূত্রটি আমরা প্রমাণের চেষ্টা করবো তা হলো "ঠিক পরপর রয়েছে এমন দুটি সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি বিজোড় সংখ্যা হবে"। যেমন ৩ আর ৪ পরপর এই দুটি সংখ্যার যোগফল ৭ একটি বিজোড় সংখ্যা। এবার তার প্রমাণটি দেখা যাক। ধরা যাক a ও b পর পর দুটি সংখ্যা। তা হলে b কে লেখা যায় a+1 এই রূপে। b এর এই রূপটি ব্যবহার করলে সংখ্যা দুটির যোগফল হবে $a+b=a+a+1=2a+1$। যেহেতু যে কোন সংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যাটিকে অবশ্যই জোড় সংখ্যা হতে হয় 2a একটি জোড় সংখ্যা। এর সঙ্গে 1 যোগ করলে তাকে অবশ্যই বিজোড় সংখ্যা হতে হবে। কাজেই a ও b পরপর এই দুটি সংখ্যার যোগফল সব সময় বিজোড় হবে। যেহেতু a ও b হিসেবে পর পর যে কোন দুটি সংখ্যাকে নির্বাচন সম্ভব, কাজেই প্রমাণটি সর্বত্র প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় আর এক ধরণের প্রমাণ গোড়া থেকেই গণিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাতে প্রমাণ করার বক্তব্যটিকে প্রথমে মিথ্যা বলে ধরে নিয়ে এগুতে হয়, এবং দেখানো হয় যে তার ফলে এর মধ্যে বক্তব্যটির ভেতরেই একটি সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয়। ফলে বক্তব্যটি মিথ্যা হতে পারে না, অতএব এটি সত্য। এ ভাবে প্রমাণ করা হয় বলে প্রমাণের এই উপায়টিকে বলা হয় কনট্রাডিক্‌শন বা সাংঘর্ষিক। এরও একটি সহজ উদাহরণ নেয়া যাক। যে বক্তব্যটি প্রমাণ করতে হবে তা হলো "যদি n^2 জোড় সংখ্যা হয় তবে n একটি জোড় সংখ্যা হবে"। প্রমাণ করার খাতিরে আপাতত ধরে নিই যে n একটি জোড় সংখ্যা নয়। কিন্তু যে কোন সংখ্যার দ্বিগুণটি একটি জোড় সংখ্যা হওয়াতে যে কোন সংখ্যা k এর দ্বিগুণ 2k একটি জোড় সংখ্যা। 2k+1 তারপরের সংখ্যাটি হওয়াতে সেটি একটি বিজোড় সংখ্যা। যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি n একটি বিজোড় সংখ্যা সেটিকে 2k+1 এই রূপে লেখা যেতে পারে।

তা হলে n^2 হবে $n^2=(2k+1)^2$। ডানদিকের অংশের ওপর এ্যালজেব্রার প্রমাণিত সুপরিচিত সূত্রের প্রয়োগ করে ও তাকে একটু সাজিয়ে লেখা যায় $n^2=2(2k^2+2k)+1$ এই রূপে— যা কিনা একটি সংখ্যার দ্বিগুণের থেকে 1 বেশি। এর মানে এটি একটি জোড় সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যা এবং সেজন্য বিজোড়। কিন্তু প্রমাণ করার জন্য আমাদের মূল বক্তব্যে n^2 কে একটি জোড় সংখ্যা হিসেবেই নেয়া হয়েছে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে n কে বিজোড় সংখ্যা ধরে নিলে মূল বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই n কে বিজোড় ধরে নেয়া যায়না। তাকে জোড় সংখ্যাই হতে হবে। এভাবে সাংঘর্ষিক দেখানোর মাধ্যমে মূল বক্তব্যটি প্রমাণিত হলো।

উপরের দুই ধরণের প্রমাণই প্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু প্রমাণের আরো একটি ধরণ রয়েছে যা আধুনিক গণিতেই শুধু ব্যবহৃত হয়েছে। এতে লজিকের সাধারণ পদ্ধতি থেকে বের হয়ে গিয়ে ইনডাকশনের সহায়তা নেয়া হয়। ইনডাকশন মানেইতো নানা বিশেষ ক্ষেত্রে সত্য হতে দেখে সাধারণ ভাবে সত্য ধরে নেয়া। কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে এটি সব ক্ষেত্রে সত্য হবে তেমনটিই প্রমাণ করতে হয়। এজন্য একেবারে গোড়ার ক্ষেত্রে এটি যে সত্য তা দেখাবার পর ইতস্তত যে কোন ক্ষেত্র বেছে নিলেই তাও যে সত্য হবে সেটি দেখাতে হয়। যেহেতু ইতস্তত যে কোন ক্ষেত্রেই সত্য হচ্ছে তাই এটি সব ক্ষেত্রে সত্য হবে। এরও একটি সহজ উদাহরণ নেয়া যাক।

প্রমাণ করতে হবে যে "1,2,3 ইত্যাদি পরপর সংখ্যাকে n সংখ্যাটি পর্যন্ত যোগ করলে যোগফল হবে $\frac{n(n+1)}{2}$ । অংকের ভাষায় লিখলে প্রমাণ করার বক্তব্যটি হলো: $1+2+3+\text{----------}+n=\frac{n(n+1)}{2}$

প্রথমে একবারে গোড়ার ক্ষেত্রে দেখি এটি সঠিক কিনা, অর্থাৎ একেবারে শুধু n=1 কে নিয়ে। সেক্ষেত্রে বক্তব্যটি দাঁড়াবে $1=\frac{1(1+1)}{2}$। দেখা যায় n=1 এর জন্য বক্তব্যটি সত্য। এবার n কে ইতস্তত যে কোন সংখ্যায় নিয়ে দেখা যেতে পারে বক্তব্যটি সত্য কিনা। সেটিই হবে ইনডাকশন। ইতস্তত নেবার স্বার্থে n=k, এবং n=k+1 এই দুটি ক্ষেত্র নির্বাচিত করি— যেখানে k যে কোন সংখ্যা হতে পারে। n=k এর জন্য বক্তব্যটি হবে: $1+2+3+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}$। এর সঙ্গে পরের সংখ্যাটি অর্থাৎ k+1 যোগ করলে পাই $\frac{k(k+1)}{2}+k+1=(k+1)\ (\frac{k}{2}+1)$। n=k+1 এর জন্য বক্তব্যটি হবে: $1+2+3+.....+k+k+1=\frac{(k+1)(k+1+1)}{2}$ $=(k+1)\ (\frac{k}{2}+1)$। দুই ভাবেই k+1 পর্যন্ত যোগ করে একই ফল পাওয়া

যাওয়াতে বক্তব্যের সত্যতা k ও k+1 পর্যন্ত প্রমাণিত হলো। কিন্তু যেহেতু k যে কোন সংখ্যা হতে পারে, কাজেই যে কোন সংখ্যা পর্যন্তই সাধারণ ভাবে বক্তব্যটি প্রমাণিত হলো। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আগের দুটি লজিকের সাহায্যে প্রমাণের থেকে এই প্রমাণটি একেবারেই ভিন্ন। ইনডাকশনের মাধ্যমে প্রমাণের পদ্ধতি গাণিতিক প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক ক্ষেত্র খুলে দিয়েছে।

প্রমাণের আধুনিকতম সুযোগ এসেছে কম্পিউটার থেকে। কম্পিউটার ইতোমধ্যেই নানা গাণিতিক থিওরেম প্রমাণে সহায়তা করেছে। অবশ্য এ জন্য গণিতবিদকেও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কম্পিউটারের জন্য প্রোগ্রামটি তৈরি করে মূল নির্দেশনা দিতে হয়, যাতে কম্পিউটার অতি দ্রুত অসংখ্য অংক কষার মাধ্যমে প্রমাণটিকে খাড়া করতে পারে। কিন্তু এরকম প্রোগ্রাম তৈরিও অত্যন্ত দুরূহ কাজ, তাই আজ অবধি অল্প কিছু ক্ষেত্রেই অন্য ভাবে প্রমাণ না দিতে পারা থিওরেমগুলোর জন্য কম্পিউটার প্রমাণ সম্ভব হয়েছে। এরকম একটি বিখ্যাত উদাহরণ হলো কম্পিউটারের সাহায্যে 'চার-রঙ থিওরেম' প্রমাণ। ১৮৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের ম্যাপে বিভিন্ন কাউন্টির এলাকাগুলোকে আলাদা আলাদা রঙে রাঙানোর সময় ফ্রান্সিস গুথরিক লক্ষ্য করেন যে ন্যূনতম চারটি রঙ ব্যবহার করলে যে কোন ম্যাপের নানা অঞ্চলগুলো এমন ভাবে রঙ করা সম্ভব যাতে কোন দুটি সংলগ্ন অঞ্চলের কোথাও রঙ এক হবে না, তবে কোথাও যদি শুধু একটি বিন্দুতে একটি অঞ্চল তার পাশের অঞ্চলকে স্পর্শ করে তবে শুধু বিন্দুটিতে সংলগ্ন একাধিক অঞ্চলে একই রঙ হতে পারে। এটিই চার-রঙ থিওরেম হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলো। সব সময় এর সত্যতা পাওয়া গেলেও এর গাণিতিক অনিবার্যতা দীর্ঘ সময়েও প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৯৭৬ সালে আপ্পেল ও হাকেন কম্পিউটারের সাহায্যে এটি প্রমাণ করেছেন।

প্রমাণের জন্য যে কম্পিউটার প্রোগ্রামটি তৈরি হয়েছিলো তা মোটের ওপর এই ধারায়। থিওরেমটি যদি ভুল হয় তা হলে অন্তত একটি ম্যাপ থাকবে যেখানে ন্যূনতম ৫টি রঙ এই একই শর্তে প্রয়োজন হবে। সেটি হবে থিওরেমের বিপরীত একটি উদাহরণ। প্রমাণটিতে দেখানো হয়েছে এরকম কোন বিপরীত-উদাহরণ থাকা সম্ভব নয়। এটি করতে গিয়ে কম্পিউটারের সাহায্যে প্রথমে দেখানো হয়েছে ১৯৩৬ রকমের ম্যাপের একটি সেটের কোনটিই এরকম বিপরীত-উদাহরণ হতে পারে না। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে এটিও দেখানো হয়েছে যে যদি কোন রকম কোন ম্যাপের মধ্যে এরকম বিপরীত-উদাহরণ থাকে তা হলে সেই ম্যাপের একটি অংশ অন্তত ওই ১৯৩৬টি ম্যাপের কোন না কোনটির সঙ্গে মিলতে বাধ্য। কাজেই সিদ্ধান্ত হলো বিপরীত উদাহরণ হতে হলে কোন ম্যাপকে এই ১৯৩৬টির ভেতরে থাকতে হবে— অথচ দেখানো হয়ে গেছে যে ওর ভেতর সেরকম কিছু নেই। কাজেই

সাংঘর্ষিক হবার যুক্তিতে চার-রঙ থিওরেমের বিপরীত-উদাহরণ বলতে কিছু নেই। এখানে কম্পিউটারের প্রয়োজনটি হলো এই কারণে যে কম্পিউটার ছাড়া এ কাজগুলো করতে হলে অসম্ভব রকমের দীর্ঘ অংক কষা প্রয়োজন হতো; একমাত্র কম্পিউটারের পক্ষেই তা সঙ্গত সময়ে সম্ভব।

আগেই বলেছি অনেকে কম্পিউটারের প্রমাণকে ঠিক প্রমাণ বলতে রাজি নন্। কারণ আনুষ্ঠানিক প্রমাণে গণিতবিদ নিজে প্রত্যেকটি কাজকে যাচাই করতে চান্ যা কম্পিউটারের কাজে সম্ভব নয়। নিজের মস্তিষ্কে না করতে পারলে কোন প্রমাণই যেন সঙ্গত হয়না। কেউ কেউ বলেন কম্পিউটার তো দ্রুত অংক কষার সুযোগ নিচ্ছে— ঠিক 'প্রমাণ' করছেনা। অন্যরা বলেন প্রোগ্রামার যে আল্‌গরিদম ব্যবহার করেছেন সেটিরই বা প্রমাণ কোথায়? আবার কম্পিউটার প্রমাণের বিরোধী অন্যরা বলেন গণিতবিদের নিজের প্রমাণে যে গাণিতিক 'সৌন্দর্য' থাকে, যে অন্তর্দৃষ্টি থাকে, কম্পিউটারে সেটি কোথায়? এসব বিতর্ক থেকে একটি জিনিস খুব স্পষ্ট— প্রমাণকে গণিতবিদ অত্যন্ত আপন ও পবিত্র জিনিস মনে করেন, যেন প্রমাণই গণিতের প্রাণ। গণিতকে মনগড়া খেলার নিয়ম, গল্প-উপন্যাসের সমরূপী— যাই বলিনা কেন গণিত যেভাবে সুন্দর সরল ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক পদে পদে প্রমাণের সৌকর্য দিয়ে খুবই সর্বজনীন খুবই নিখুঁত একটি জগত তৈরি করেছে তা ছাড়া আমাদের চলেনা। বিজ্ঞানই বলি, আমাদের সাধারণ জীবনই বলি, গাণিতিক সমাধানই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান। অথচ এসব ব্যবহারিক প্রয়োগ গণিতের উপরি পাওয়া, গণিত নিজের মধ্যে নিজেই বিভোর থাকে যেন অন্যকিছুর সাহায্য বা সাহচর্য তার দরকার নেই।

প্রকৃতির নিয়ম কেন গণিতে পাওয়া যায়

গণিতে-বিজ্ঞানে মাখামাখি

গণিত থেকে বিজ্ঞানের তত্ত্ব:

বিজ্ঞানের নিয়মগুলো গণিতের ভাষায় প্রকাশিত হওয়া একেবারে সচরাচর ব্যাপার। গত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি গণিতের জিনিসগুলো কোন বাস্তব জিনিস নিয়ে নয়, বরং এগুলো নানা রকম সম্পর্ক নিয়ে। কাজেই বিজ্ঞানের বাস্তব জিনিসগুলোর মধ্যে নিয়মের সম্পর্কগুলোকে সম্ভবমত গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা যেতেই পারে; আর সেটি বেশ যুৎসই হয়। শুধু তেমনটিই যদি হতো তা হলে গণিতকে বলা যেতো বিজ্ঞানের একটি যুৎসই হাতিয়ার, অথবা যুৎসই ভাষা। কিন্তু গণিতে-বিজ্ঞানে মাখামাখিটা তার চেয়ে অনেক বেশি। আশ্চর্যের বিষয় হলো অনেক ক্ষেত্রে গণিতই বিজ্ঞানকে হাত ধরে একটি তত্ত্বের দিকে নিয়ে গেছে।

এই ব্যাপারটি আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়া থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি। গত তিনশ' বছর ধরে এতে যে চমকপ্রদ অগ্রগতি সেই চিরায়ত পদার্থবিদ্যার ভিত্‌টি রচনা করে দিয়েছিলেন নিউটন তাঁর গতির নিয়ম আর মহাকর্ষের নিয়ম আবিষ্কার করে। এই দুইয়ের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সকল গতিকে ঘড়ির কাঁটার মত নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে গণিত আর বিজ্ঞানের এই বিশেষ সম্পর্কের ফলে। নিউটনের আগে কেপলার সূক্ষ্ম আকাশ-পর্যবেক্ষণ তথ্য থেকে সৌরজগতের একটি মডেল দাঁড় করিয়েছিলেন, যা তাঁর তিনটি নিয়ম হিসেবে পরিচিত ছিল (কেপলারের নিয়ম)। প্রথম নিয়মে গ্রহগুলো উপবৃত্তাকার কক্ষ পথে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে, এবং সূর্য রয়েছে এসব উপবৃত্তের একটি ফোকাসে। দ্বিতীয় নিয়মে সূর্য ও একটি গ্রহের সংযোগকারী সরলরেখাটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপবৃত্তের ভেতরের যতখানি জায়গাকে কুড়িয়ে যায় তার আয়তন পরিক্রমণের সব পর্যায়ে সমান থাকে। তৃতীয় নিয়মে সূর্য থেকে এক একটি গ্রহের দূরত্বের ঘন শক্তি (কিউব) ও ওই গ্রহটির পরিক্রমণ কালের বর্গ শক্তির (স্কোয়ার) অনুপাত সব গ্রহের জন্য সমান। পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্যগুলোকে নানা ভাবে সাজিয়ে দেখে দেখে পাওয়া গেছে এই সব নিয়ম আর এই মডেল। এর থেকে জানা যাচ্ছে সব গ্রহের অবস্থান আর সেগুলোর গতির আচরণ; কিন্তু কেন এই রকম গতিবিধি

সে প্রশ্নের উত্তর সেখানে নেই। সেই উত্তর দিতে পেরেছেন নিউটন, আর সেখানে অনেক কথা এসেছে গণিতের কাছ থেকে। এ উত্তরে বড় ভূমিকা রেখেছে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব যা এসেছে গণিতের সহায়তায় ব্যস্তবর্গ নিয়ম (ইনভার্স স্কোয়ার ল') থেকে। ব্যস্তবর্গ নিয়ম নিজে আবার এসেছে নিউটনেরই আরো মৌলিক আবিষ্কার গতির তিন নিয়ম থেকে। গতির নিয়মও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে প্রকৃতির ওপর এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে গণিতের সমন্বয়ে। শুধু গণিত নিউটনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটাতে পারতোনা, কেপলারের ওই শুধু প্রকৃতির পর্যবেক্ষণও তা ঘটাতে পারতোনা। উভয়ের মাখামাখিই এই অভূতপূর্ব সাফল্য ঘটাতে পেরেছে। গণিতের জিনিস বাস্তবের কিছু না হলেও এই বাস্তবের উদ্ঘাটনে গণিতের এতখানি ভূমিকা আশ্চর্যজনক।

আরো সাম্প্রতিক পদার্থবিদ্যায় এসে এই ভূমিকা আরো আশ্চর্যজনক ভাবে বেড়েছে। গণিতবিদরা গণিতের অভিনব সব শাখা খুব সৌকর্যের সঙ্গে গড়ে তুল্ছেন নেহাৎ আপন আনন্দে— কোন বাস্তব কাজে প্রয়োজন হবে বলে নয়। এগুলো তাঁদের মস্তিষ্কেরই সৃষ্টি; এতে গণিতে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে, বহুদিন পর্যন্ত তার অতিরিক্ত অন্য কিছু হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এসে এই নতুন গণিতই বিজ্ঞানের কোন তত্ত্বকে প্রকৃতির কোন না কোন রহস্য উদ্ঘাটনের সুযোগ করে দিয়েছে— যেন তার সৃষ্টিকারী গণিতবিদের অজান্তেই এই গণিত ওই বাইরের প্রকৃতির সেই রহস্যের চাবিকাঠি নিজের মধ্যে ধারণ করছিলো। এর কিছু উদাহরণ নেয়া যাক্।

পরিবর্তনহীন গতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কারের পর তরুণ আইনস্টাইন বল্, ত্বরণ ইত্যাদিকেও তাঁর আপেক্ষিকতার চিন্তার মধ্যে আনার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের সন্ধানে। এক্ষেত্রে এসে তাঁকে মহাকর্ষ নিয়েও নতুন ভাবে ভাবতে হয়েছে; নিউটনের কালজয়ী সেই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে কিছু বিরল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সঠিক ফলাফল দিতে ব্যর্থ হচ্ছিলো, তাছাড়া এর মৌলিক চিন্তাতেও বড় অসঙ্গতি ছিলো। এই সবকিছু নিয়ে তাঁর মাথায় স্থান-কালের প্রকৃতি নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কিছু ধারণা দানা বাঁধছিলো। তিনি বুঝতে পারছিলেন স্থান-কালের জ্যামিতিটি এতদিন যা ভাবা হয়েছিলো সে রকম নয়— এর 'আকৃতি' ভরের উপস্থিতির কারণে বিকৃত হতে পারে। আইডিয়াগুলো এত নতুন যে, তাঁর জানা গণিত দিয়ে এগুলোকে আইনস্টাইন সূক্ষ্মভাবে প্রস্ফুটিত করতে পারছিলেননা। এসময় তাঁর এক প্রাক্তন সহপাঠী তাঁকে গণিতের কিছু নতুন শাখার সন্ধান দেন। ছাত্র অবস্থায় এগুলো আইনস্টাইনের মনোযোগ এড়িয়ে গিয়েছেলো, কিন্তু তাঁর গণিত প্রেমিক সহপাঠীটির মনোযোগ এড়ায়নি। এগুলো হলো টেন্সর ক্যালকুলাস এবং ম্যাট্রিক্স এ্যালজেব্রা। গণিতের কিছু চমকপ্রদ সৌকর্য সৃষ্টি করে কিছু কিছু গণিতবিদের কাছে আকর্ষণীয় প্রমাণিত হলেও এর বাইরে

এগুলোর তেমন কোন পরিচিতি বা ব্যবহার ছিলনা। এই গণিত আয়ত্ব করার পর আইনস্টাইনের মনে হলো স্থান-কালের যে গুণাগুণগুলো প্রকাশের জন্য তিনি বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ করছেন, এ গণিত যেন ঠিক সে কাজটি করার জন্যই তৈরি হয়েছে।

বিশেষ করে টেন্সর ক্যালকুলাসের কার্যকারিতায় তিনি মুগ্ধ হলেন। নিজের ভাসা ভাসা অনুমানকে একেবারে সুসংবদ্ধ গণিতিক রূপ দেবার সুযোগ আইনস্টাইনের নতুন তত্ত্বের দুয়ার খুলে দিল। এমনিতেই টেন্সর ক্যালকুলাসের গাণিতিক সৌন্দর্য উচ্চ মানের; আর এখানে ভরের উপস্থিতিতে স্থান-কালের আকৃতির বিকৃতিগুলোর প্রকাশে এ যেন খাপের খাপ উপযুক্ত হিসেবে উপস্থিত হলো। ওই সূক্ষ্ম পরিবর্তনশীলতাগুলো যেন টেন্সর ক্যালকুলাসের ভাষায় কথা বলে উঠ্লো। আইনস্টাইন পরে বলেছেন, তাঁর বিশ্বাস এই গণিতের সন্ধান যদি তিনি আগে পেতেন, তাহলে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তাঁর আট বছর সময় লাগতোনা।

আরো বেশি পরিচিত কিছু গণিতের উদাহরণ নেয়া যাক। সবার স্কুল-কলেজে পড়া ইমাজিনারি নাম্বারের (কাল্পনিক সংখ্যা) কথা স্মরণ করা যাক। গণিতবিদরা সব সময় জানতেন যে ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলের কোন মানে হয়না, কারণ ধনাত্মক হোক কি ঋণাত্মক হোক যে কোন সংখ্যার বর্গ নিলেই তা ধনাত্মকই শুধু হবে। যেমন ২ এর বর্গ যেমন ৪, (২×২=৪), তেমনি -২ এর বর্গও ৪ (-২×-২=৪)। কাজেই ৪ এর বর্গমূল ২ এবং -২ উভয়েই। -৪ এর বর্গমূল বের করতে যাওয়া নিরর্থক, যেহেতু কোন কিছুরই বর্গ -৪ হয় না। তারপরও কোন কোন গণিতবিদ এই নিরর্থক জিনিস নিয়ে কাজ করেছেন —ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে তাঁরা গণিতে স্থান দিয়েছেন যেমন $\sqrt{-1}$ কে। অর্থপূর্ণ সংখ্যার মত এই অর্থহীন সংখ্যাগুলোকে নিয়ে তাঁরা যে অংক তৈরি করলেন তাতে $\sqrt{-1}$ এই সংখ্যাটির জন্য একটি চিহ্ন ব্যবহার করলেন i ইমাজিনারি নাম্বার কথাটির আদ্যাক্ষর; গণিতের অর্থের দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটিই যে এক রকম অসম্ভব বা কাল্পনিক। কিন্তু একে নিয়ে অংক ঠিকই করা গেলো যেমন $i^2=-1$। নেহাৎ গাণিতিক আনন্দ ও সম্পূর্ণতার খাতিরেই তাঁরা প্রকৃত (রিয়াল) অংকের সঙ্গে মিলিয়ে এই অংকও করে গেছেন; এই মিলিত অংককে বলেছেন কমপ্লেক্স নাম্বার (জটিল সংখ্যা)। কিন্তু যখনই ওই মিলিত অংক দিয়ে বাস্তব কোন কিছু বোঝাতে গেছেন তখনই ফলাফলকে প্রকৃত ও কাল্পনিক এই দুই অংশে ভাগ করেন। প্রকৃত অংশটিকে যথারীতি বাস্তব ক্ষেত্রে তার কাজ করতে দেন কিন্তু ওই কাল্পনিক অংশটি বাদ দিয়ে দেন। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত অবশ্য সমস্ত হিসেব নিকেশের গণিতে ওই কাল্পনিক অংশ যথারীতি তার ভূমিকা পালন করে যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে কাল্পনিক সংখ্যা অর্থাৎ i এর এই গাণিতিক ভূমিকা খুবই চমকপ্রদ ভাবে সহায়ক হতে পারে। যেমন e এই চিহ্ন দ্বারা সূচিত এক্সপোনেশিয়াল নামের অদ্ভুত গুণ সম্পন্ন একটি সংখ্যার কথা বলা যাক। এটি আরো বেশ কিছু সংখ্যার মত নির্দিষ্ট কোন দশমিক স্থানে প্রকাশ করা যায়না, দশমিক বিন্দুর পর একের পর এক ইতস্তত সংখ্যা দিয়ে এর প্রকাশ অসীম ভাবে চলতেই থাকে। x কে যে কোন সাধারণ সংখ্যা মনে করলে— এবং ix কে এই e এর মাথায় পাওয়ার (শক্তি) হিসেবে বসিয়ে দিলে, e^{ix} এই রাশিটি দেখা যায় নানা গাণিতিক গুণে গুণান্বিত; আর সেগুলো বাস্তব সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও খুবই কার্যকর। উদাহরণ স্বরূপ পদার্থবিদ্যার অসংখ্য তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে যে ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশনে তার অনেকগুলোর সমাধানে e^{ix} এর এসব গুণ দারুণ কাজে আসে। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও বাস্তব কাজে সমাধানে শেষ পর্যন্ত শুধু প্রকৃত অংশকেই রাখা হয়, কাল্পনিক অংশকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়।

নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় আরো একটি বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের রূপে যা বিশেষ করে ইলেকট্রন, এটম, অণু ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্র কণিকার প্রকৃতি ও গতিবিধি বর্ণনায় এখন অপরিহার্য। পদার্থবিদ্যা, কেমিস্ট্রি ইত্যাদির অনেকখানি এসব কণিকার ওপর নির্ভরশীল হওয়াতে আজকের বিজ্ঞানের মৌলিক বিবরণ আসে কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে। এতে ওসব কণিকাকে একই সঙ্গে তরঙ্গ হিসেবেও দেখতে হয় যে তরঙ্গ নিজে একটি গাণিতিক রূপ ধারণ করে। এই গণিত তার অবস্থান, বেগ ইত্যাদি একমাত্র নানা সম্ভাবনার আকারেই দেখতে দেয় কোন সুনির্দিষ্ট মান হিসেবে নয়। সম্ভাবনায় গড়া এই তত্ত্ব কণিকার এক একটি বিশেষ অবস্থাকে কী ভাবে নির্ণয় করবে তা বলে দেয় এই তরঙ্গ নিয়ে এক ধরণের ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন (সমীকরণ)। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই সমীকরণে কাল্পনিক সংখ্যা i অবশ্যম্ভাবী ভাবে থাকে এবং এর সমাধানে এই i সহ কাল্পনিক অংশটি এসে যায়। কিন্তু আগে যা বলা হয়েছে সেইমত চূড়ান্ত বাস্তব ফলাফল থেকে প্রকৃত সংখ্যার অংশ রেখে কাল্পনিক সংখ্যার অংশ বাদ দেয়ার কোন উপায় এখানে নেই। কারণ ওই কাল্পনিক সংখ্যা পদার্থের কোয়ান্টাম ধর্মেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। আগের মত কাল্পনিক সংখ্যাকে এখানে নেহাত গাণিতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছেনা যে কাজ সারলে তাকে বাদ দিয়ে দেয়া যাবে, এখানে তা সমাধানের বাস্তবতার অংশ। এটি বিস্ময়কর ব্যাপার। যেই ইমাজিনারি নাম্বারকে গণিতে আনাই হয়েছিলো নেহাত গাণিতিক ঔৎসুক্য চরিতার্থ করার জন্য, গণিতেই যার অস্থিত্বটি অস্বাভাবিক— সেটিই কীভাবে প্রকৃতির আধুনিকতম ব্যাখ্যা তার কোয়ান্টাম ধর্মের অংশ হয়ে বাস্তবতার বিবরণীতে অপরিহার্য হয়েছে। যদি গণিতবিদরা কৌতূহলের বশে নিরর্থক

জেনেও i কে গণিতে না আনতেন তাহলে কোয়ান্টাম তত্ত্ব কীভাবে প্রকাশিত হতো? আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল আধুনিক ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার বিজ্ঞানের মত অতি অর্থপূর্ণ বাস্তবতাগুলো কোথা থেকে আসতো?

পদার্থবিদ্যা যতই এগুচ্ছে গণিত ততই বেশি বেশি করে এর পাইলটের সীটে বসছে। গণিতবিদরা তাঁদের গাণিতিক খেয়ালে যা সৃষ্টি করেছেন তা এখানে এমনভাবে কাজে লেগে যাচ্ছে যে অনেক সময় বাস্তব পরীক্ষায় প্রমাণিত হবার আগেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এক রকম প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাচ্ছে। গণিত এতটা নিখুঁত ভাবে প্রকৃতির নিয়মের আগাম বার্তা দিয়ে যাচ্ছে যে বিজ্ঞানীরা দিব্যি তাঁদের বিজ্ঞান চর্চায় ওই গণিত-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোকে ব্যবহার করছেন। তাঁরা ভুলেই যান যে এখনো সঠিক অর্থে এগুলোকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া হয়নি; তা সত্ত্বেও তাঁরা একে কার্যক্ষেত্র বাস্তবের মতই মনে করতে থাকেন। গণিতের ওপর বিজ্ঞানীর আস্থা এতই ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমরা দেখেছি গণিতবিদরা ক্রমাগত নতুন নতুন গণিতের সৌকর্য আপন খেয়ালে সৃষ্টি করে গেছেন, আর বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ নিজেদের তত্ত্বের ব্যবহারের জন্য সেগুলোর মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ গণিত বাছাই করে নিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ এর মধ্যে নিজেদের তত্ত্বের আসল চাবিকাঠিও খুঁজে পেয়েছেন। তবে যত গণিত গণিতবিদরা সৃষ্টি করেছেন তার সবই যে বিজ্ঞানে কাজে লেগেছে তা নয়। গণিতের অনেক অংশ এখনো রয়ে গেছে যা শুধু গণিতের খাতিরেই গুরুত্বপূর্ণ, অন্য কোন কারণে নয়। আর এই কারণে শুধু গণিতবিদরাই এবং গণিতের সমজদাররা এগুলোর মর্ম বোঝেন; এবং তাঁদের কাছেই এগুলো আদর পায়। কিন্তু যা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অনিবার্য ভাবে হবে— তাদের সংখ্যায়, মানে, গুণে সেগুলোও গণিতের গর্ব। গণিত থেকে বিজ্ঞান এই পথই সাধারণত এরা অনুসরণ করেছে— বেশির ভাগই সৃষ্টি হয়েছে বিশুদ্ধ গণিত হিসেবে, পরে বিজ্ঞানের কাজে লেগে তার ক্ষমতার দারুণ নিদর্শন রেখেছে। কিন্তু তার ব্যতিক্রমও আছে, যেখানে বিজ্ঞানের প্রয়োজনেই কোন গণিত সৃষ্টি হয়েছে; তারপর বিজ্ঞানে তো বটেই গণিতে এবং অন্যত্রও তার জয় জয়কার পড়েছে। এমন ব্যতিক্রমের একটি বিখ্যাত উদাহরণ হলো নিউটনের ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস উদ্ভাবন।

প্রধানত গ্যালিলিওর অবদানে গতির অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু সঠিক ধারণা গোড়া থেকেই নিউটন পেয়ে গিয়েছিলেন- যেমন জড়তার (ইনারশিয়া) নীতি, পড়ন্ত বস্তুর ত্বরণ ইত্যাদি। এগুলো ছিল মোটা দাগের হিসাব; এতে নিউটনের মন ভরেনি। তিনি চাচ্ছিলেন এমন কিছু মূল নিয়ম আবিষ্কার করতে যার থেকে পৃথিবীর মধ্যে ও মহাকাশের সর্বত্র সকল কিছুর গতি বের করে ফেলা যাবে অংক করে। কিন্তু এটি সম্পন্ন করার মত উপযুক্ত গণিত তো তাঁর কাছে নেই। এর জন্য যে কোন একটি মুহূর্তে ওই গতিশীল বস্তুটির তাৎক্ষণিক বেগটি নির্ণয়

করার কৌশল জানা প্রয়োজন। কৌশলটি এমন হতে হবে যেন সময়ের সঙ্গে ওই গতির সাধারণ সম্পর্ক থেকেই এর যে কোন মুহূর্তের তাৎক্ষণিক বেগ বের করা সম্ভব হবে। কোন একটি বিশেষ সময়ের ব্যবধানে যে গড় বেগ হয় তা আমরা ওই সময়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অতিক্রান্ত দূরত্বকে সময়টি দিয়ে ভাগ দিয়ে জানতে পারি। কিন্তু একটি মুহূর্তের ভেতর সময়ের ব্যবধান যেমন প্রায় শূন্য, তেমনি অতিক্রান্ত দূরত্বও প্রায় শূন্য। শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে তো গণিতে তার কোন মানে হয়না। ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস উদ্ভাবন করে নিউটন এটিই সম্ভব করলেন যাতে ওই মুহূর্তের বেগ নির্ণয় করা যায়।

এর কৌশলটি হলো শুরুতে সময়ের ব্যবধানটি মূহূর্ত হিসেবে না নিয়ে একটু দীর্ঘ সময়েই নেয়া— যাতে গড় বেগ বের করতে কোন অসুবিধা না হয়। এর পর সময়টিকে ক্রমাগত ছোট করার কল্পনা করলে ছোট থেকে ছোটতর হতে হতে এক সময় সেটি মুহূর্তের কাছাকাছি চলে আসবে। দীর্ঘতর সময় ধরে বস্তুটির গতি প্রকাশ করার জন্য অতিক্রান্ত স্থানটি অতিক্রান্ত সময়ের ওপর নির্ভর করার যে এ্যালজেব্রায় প্রকাশিত ফাংশান তার থেকেই পাওয়া যাবে মুহূর্তের খুব কাছাকাছি ওই অতি ক্ষুদ্র সময়ে বস্তুটি অতি ক্ষুদ্র কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করবে। এখন এই শেষেরটিকে ওই ক্ষুদ্র সময় দিয়ে ভাগ করলেই মুহূর্তটিতে তাৎক্ষণিক বেগ পাওয়া যায়। এই ভাগের কোন অংশই শূন্য ছিলনা, কিন্তু শূন্যের থেকে খুব বেশি আলাদা তাও বলা যাবেনা। এটিই ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস— যার প্রয়োগে গতি সম্পর্কে সব কিছু পাওয়া যায়। দূরত্বকে ভাগ দিয়ে যেমন বেগ পাওয়া গেছে, মুহূর্তে মুহূর্তে বেগের পরিবর্তন ঘটলে সেই পরিবর্তনের হার অর্থাৎ ত্বরণও একই কৌশলে পাওয়া যাবে। আসলে শুধু বস্তুর গতি কেন যেখানেই পরিবর্তন আর পরিবর্তনের হার আছে সেখানেই ডিফারেনশেয়ান ক্যালকুলাসের প্রয়োগ সোনা ফলায়— যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অথবা জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার। নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় গণিত উদ্ভাবন করে নিউটন বিশ্ব-প্রকৃতির সকল গতির সব কথা উদ্ঘাটন করে গিয়েছিলেন। অবশ্য সমসাময়িক আর একজন গণিতবিদ লাইবনিৎস একই সময় স্বাধীনভাবে প্রায় একই রকম ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস উদ্ভাবন করেছিলেন।

গণিতের জিনিসের যত্রতত্র গমন:

গত শতাব্দীর বিখ্যাত পদার্থবিদ অয়জিন ভিগনারের কথিত একটি ঘটনা দিয়ে বিষয়টির অবতারণা করা যাক। স্কুলের সহপাঠী দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে অনেক দিন পর, যখন দু'জন কর্মক্ষেত্রে দুই ভিন্ন দিকে চলে গেছে। একজন হয়েছে সংখ্যাতত্ত্ববিদ, অন্য বন্ধু স্কুলের পর আর গণিতের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখেনি। প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে বোঝাচ্ছিল যে কীভাবে কোন দেশের জনসংখ্যায়

বিভিন্ন উচ্চতার মানুষের সংখ্যা একটি ঘন্টার আকৃতির মত দেখতে লেখচিত্র (গ্রাফ) দিয়ে বোঝানো যায়। মাঝারি উচ্চতার মানুষের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি— গ্রাফের মধ্যভাগে উঁচু হয়ে দেখাচ্ছে, খুব কম উচ্চতার মানুষের সংখ্যা অতি কম আবার অস্বাভাবিক লম্বা মানুষের সংখ্যাও অতি কম। গণিত ভুলে যাওয়া বন্ধুটি মনে করছিলো অন্য জন তার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছে জনসংখ্যার মত এতোটা জটিল বিস্তৃত তথ্য এমন সুন্দর নিখুঁত আকৃতির একটি গ্রাফের নিয়ম মেনে চলবে একথা কি বিশ্বাসযোগ্য! তার অবিশ্বাস চরমে উঠলো যখন দেখলো এই গ্রাফের গাণিতিক প্রকাশে গ্রীক অক্ষর 'পাই' (π) রয়েছে— এবং সংখ্যাতত্ত্ববিদ বন্ধু বল্‌লো এটি স্কুলে পড়া সেই 'পাই' যা কিনা বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত। বৃত্তের গুণাগুণের সঙ্গে জনসংখ্যার কী সম্পর্ক? বন্ধু কি তাকে এতই বোকা মনে করে যে যা তা বলে পার পাবে? ভিগনারের মতে এই যে জনসংখ্যার গ্রাফে 'পাই' দেখে অবাক হওয়া এতে মোটেই বন্ধুটির অজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছেনা, বরং গণিতে বুঁদ হয়ে না থাকা যে কোন সাধারণ মানুষেরই এতে অবাক হবার কথা। 'পাই' নামক যে সংখ্যাকে বৃত্তের বিশেষ অনুপাত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে তাকে গণিতে আনা হয়েছে সেটি কিন্তু বৃত্তের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি— গণিতের ভেতর অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় চলে গেছে। কেমন করে গেল তা যারা স্কুলে কলেজে নিত্য সে সব গণিত করছে তারাও জানেনা। ফরমুলার নিয়ম হিসেবে জানলেও তাদের পক্ষেও এর সূক্ষ্ম হদিশ করা সম্ভব হয়না— সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক। একমাত্র গণিতবিদই 'পাই' এর মত গণিতের জিনিসের সেই সূক্ষ্ম যাতায়তের পথঘাট বুঝতে পারেন। আর শুধু 'পাই' নয় গণিতের অনেক কিছুরই এরকম যত্রতত্র অদ্ভুত গমনাগমন রয়েছে।

পাইয়ের কথাই যদি বলি বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাত ধারণকারী পাই যে শুধু জনসংখ্যার বা অনুরূপ নানা জিনিসের বন্টনে গিয়ে হাজির হয়েছে তা নয়, গণিতের আরো বহু অদ্ভুত জায়গায় তার যাতায়ত রয়েছে— আর সেই সুবাদে নানা বাস্তব সমস্যার গাণিতিক সমাধানে তার পটুত্ব টের পাওয়া যায়, যার সঙ্গে আপাতত বৃত্তের কোন সম্পর্ক দেখা যায়না। যেমন কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা (প্রবাবিলিটি) নির্ণয় করার যে গণিত, পাই সেখানে গিয়ে দেখা দেয়। বাস্তব ক্ষেত্রে সেটি যে হয়, হাতেনাতে তার একটি খুব সরল উদাহরণ নেয়া যাক্। যেমন টেবিলে বিছানো একটি কাগজের ওপর দুটি সমান্তরাল সরল রেখা টেনে নিই। এখন রেখা দুটির পরস্পর দূরত্বের সমান দীর্ঘ একটি সূঁচ নিয়ে তা লুডুর দান ফেলার মত ওই রেখা দুটির ওপর ইতস্তত নেড়ে চেড়ে ফেলতে থাকি। সূঁচটি হয় ওই রেখা দুটির কোনটিকে ছেদ করে পড়বে, অথবা কোনটিকে ছেদ না করে উভয়ের মাঝখানে পড়বে। আমরা জানতে চাই এই দুইটির কোন্‌টি হবার সম্ভাবনা কত। গণিতের সম্ভাবনার হিসেব বলে যে কোন

একটি রেখাকে ছেদ করে সূঁচটি পড়ার সম্ভাবনা $\frac{2}{\bar{\Lambda}}\%$, অর্থাৎ $\bar{\Lambda}$ এর আসন্ন মানটি ব্যবহার করলে সম্ভাবনাটি প্রায় ৬৪%। সত্যি সত্যি তাই হচ্ছে কিনা আমরা পরীক্ষা করে দেখলে নিরাশ হবোনা — ১০০ বার সূঁচ ফেললে এভাবে রেখা ছেদ করার সংখ্যা ৬৪ এর থেকে তেমন ভিন্ন হয়না। চলে যাই আলোর জগতে— এক এক রঙের যে আলোক তরঙ্গ তার ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয়ের জন্য যে গণিত তার মধ্যেই দেখি $\bar{\Lambda}$ । চলে যাই মহাবিশ্বের অভাবনীয় রকম দূরত্বে থাকা সুপারনোভা নামক বিস্ফোরিত তারার ঔজ্জ্বল্য নির্ণয়ের গণিতে— সেখানেও আছে $\bar{\Lambda}$। অবাক হবার বাকি আর কিছু থাকে?

এর আগে আমরা দেখেছি i অর্থাৎ $\sqrt{-1}$, এবং e এর মত পরস্পর সম্পর্কহীন অদ্ভুত রকম দুটি সংখ্যা একত্র হয়ে e^{ix} হিসেবে ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন সমাধানের মাধ্যমে বিজ্ঞানে দারুণ অবদান রাখছে। কোথাকার জিনিস কোথায় চলে এলো। গণিতবিদ অয়লার একে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে উদ্ভাবন করেছেন আরো অবাক করা এক সম্পর্ক যাকে বলা হয় গণিতের সুন্দরতম ও আশ্চর্যতম সম্পর্কগুলোর অন্যতম। এটি হলো:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

e^{ix} কে এখানে একটি প্রকৃত রাশি এবং একটি কাল্পনিক রাশিতে বিভক্ত করা হয়েছে, আর উভয়েই এসেছে গণিতের সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক শাখা ত্রিকোণমিতি থেকে। স্কুলের ত্রিকোণমিতি যাঁদের মনে নেই তাঁদেরকে স্মরণ করাতে চাই x কোণটির cosx, sinx ইত্যাদি সমকোণী ত্রিভুজের বিভিন্ন বাহুর অনুপাত। তা হলে e এবং i এই দুই অদ্ভুত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন সংখ্যা ত্রিভুজের জগতে চলে গেল কেমন করে? এটি আমাদের কাছে অবাক বিষয় হলেও গণিতবিদের কাছে নয়। x এর বদলে যদি $\bar{\Lambda}$ ব্যবহার করা হয়, তাহলে বিভিন্ন প্রধান কোণের সাইন ও কোসাইনের মান যাঁরা জানেন তাঁরা চট্ করে বল্‌বেন $e^{i\bar{\Lambda}} = -1$ অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাচ্ছে এই ফলাফলে— পরস্পর সম্পর্কহীন তিনটি সম্পূর্ণ অনিয়মিত সংখ্যা e, i, $\bar{\Lambda}$ এর সমন্বয়ে একেবারেই নিয়মিত গোবেচারা অতি সাধারণ সংখ্যা -1 পেলাম কী ভাবে? এভাবে গণিতের পরতে পরতে আপাতত রহস্যাবৃত এরকম অনেক সম্পর্ক তৈরি হয়ে আছে। এত রকম সম্পর্ক প্রকাশের সুযোগ গণিতে আছে বলেই বাস্তব প্রকৃতির অনেক সম্পর্ককে তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। গণিতের প্রত্যেক অংশের সৃষ্টি করা জিনিসগুলো যদি ওখানেই আবদ্ধ থাকতো, তাদের গতিবিধি যদি গণিতের আরো নানা জায়গায় বিস্তৃত হয়ে সম্পর্কগুলো সৃষ্টি না করতো, তা হলে প্রকৃতির জটিল নানা নিয়মকে ধারণ করার ক্ষেত্রে তার এত কার্যকারিতা থাকতোনা।

তবে মনে রাখতে হবে প্রকৃতির নিয়মগুলো একেবারেই বাইরের বাস্তবতা, অন্যদিকে গণিতের সম্পর্কগুলো এবং তার জিনিসগুলোর যত্রতত্র গমনের ক্ষমতা— তা মানুষের সৃষ্টি করা যুক্তির প্রকাশ মাত্র। এই দুইয়ের মিলে যাওয়াটাই সব চেয়ে বড় রহস্য।

প্রকৃতি কীভাবে গণিতের ভাষায় কথা বলে

এমন কথার কিছু উদাহরণঃ

তিনশ' বছরেরও বেশি সময় আগে গ্যালিলিও বলেছিলেন যে 'প্রকৃতির নিয়মগুলো গণিতের ভাষায় লেখা'। গ্যালিলিওর কথাটি বিজ্ঞানে গণিতের আটপৌরে ব্যবহারকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি। বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যে কোন একটি আনুমানিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সাধারণ যুক্তির ভাষায় যেমন, তেমনি গণিতের যুক্তির ভাষাতেও সেই অনুমানের থেকে বিভিন্ন পরীক্ষণযোগ্য ফলাফল বা ভবিষ্যদ্বাণী নির্ণয় করা হয়। এসব ফলাফলকে বাস্তবে যাচাই করে অনুমানটিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা নেয়া হয়। বিজ্ঞানে গণিতের এমন ব্যবহার হরদম হচ্ছে, তাই তাকে আটপৌরে ব্যবহার বলতে পারি। কিন্তু প্রকৃতির কথা গণিতের ভাষায় লেখা থাকার মানে আরো গভীরের বিষয়। প্রকৃতির যে রকম নিয়ম কানুন বিজ্ঞানী এর আচরণ থেকে আন্দাজ করছেন তা যেন গণিতের ভাষাতেই নিজ থেকে কথা বলছে— কেমন করে জানি প্রকৃতি এই গণিতের কথাবার্তা আগে থেকেই জানে। অথচ গণিত প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, মানুষের সৃষ্টি। বিস্ময়টি এখানেই— আর গ্যালিলিওর কালে এটি যতটা না বিস্ময় উৎপাদন করেছে, এখন প্রকৃতির এমনি ভাবে গণিত হয়ে ওঠাটি তার চেয়ে অনেক বেশি জলজ্যান্ত— বিশেষ করে সর্বাধুনিক পদার্থবিদ্যা তো একেবারেই গণিতময়।

একটি উদাহরণ নেয়া যাক। আজকের পদার্থবিদ্যার সার্বিক যে তাত্ত্বিক কাঠামো তা হলো কোয়ান্টাম তত্ত্ব। প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট সীমিত যে কোন সিস্টেম যদি আমরা নিই সেটিকে বর্ণনা করার একটি কায়দা কোয়ান্টাম তত্ত্বে রয়েছে যা গণিতের ভাষাতেই শুধু সম্ভব। সিস্টেমটি প্রকাশিত হয় এর 'অবস্থা' (স্টেট) দিয়ে। এই অবস্থাগুলো সিস্টেমের আভ্যন্তরীন বিষয়, বাইরে যা প্রকাশিত হয় তা হলো এদের পর্যবেক্ষণযোগ্য (অবজারভেবল) কিছু উদ্ভাসন— যেমন উত্তাপ, বিকিরণ ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি। এখানে গণিত কী ভাবে আসে? কোয়ান্টাম তত্ত্ব যেমন উচ্চ মার্গের তত্ত্ব, উচ্চ মার্গের গণিত দিয়েই তাকে বুঝতে হয়। আমরা সাধারণ স্পেস বা স্থানের সঙ্গে পরিচিত- যা তিন মাত্রার। গণিতবিদ হিলবার্ট এই স্থান জিনিসটিকে একেবারেই উচ্চমার্গীয় এক স্পেসের ধারণায় পরিণত করেছেন যাকে আমরা বলি হিলবার্ট স্পেস। আমাদের পরিচিত সাধারণ ত্রিমাত্রিক স্পেসে একটি বিন্দুর অবস্থান বোঝাতে আমরা

একটি বিশেষ রাশি ব্যবহার করি যা একটি তীরের মত সরলরেখা দিয়ে বোঝানো যায়— তীর যত দীর্ঘ তার মান তত বেশি, আর তীরের দিককে বলি তার দিক। এই বিশেষ রাশিকে বলা হয় ভেক্টর। বেগ, ত্বরণ ইত্যাদিকে একই রকম ভেক্টর দিয়ে আমাদের এই পরিচিত স্পেসে প্রকাশ করা যায়। উচ্চ মার্গীয় গণিতে সাধারণ স্পেস যেমন হিলবার্ট স্পেস হয়ে যায়, সে রকম হিলবার্ট স্পেসে এক রকম উচ্চ মার্গীয় ভেক্টর থাকে। এই ভেক্টর দিয়েই সিস্টেমে সেই অবস্থাগুলো প্রকাশিত হয়। পরিচিত স্পেসের যে ভেক্টর সেগুলোকে পাটিগণিতের মত যোগ-বিয়োগ-গুণ ইত্যাদি করার আলাদা নিয়ম রয়েছে যার প্রত্যেকটিকে বলা যায় একটি 'অপারেশন'। হিলবার্ট স্পেসের ভেক্টরগুলোর ওপর এমনি অপারেশন করে কোয়ান্টাম তত্ত্বের 'অপারেটর' নামক জিনিস। আমরা জানি কোয়ান্টাম তত্ত্ব কোন কিছুর অবস্থা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারে না— শুধু সম্ভাব্য অবস্থাটি দিতে পারে। এই সম্ভাব্যতাটি জানা যায় কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমীকরণ সমাধান করে পাওয়া উপযুক্ত অপারেটরের বিশেষ মান থেকে। বোঝা যায় গণিত এখানে বিজ্ঞানের বা প্রকৃতি-বর্ণনার একেবারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে বসে আছে। গণিতের ভাষায় ছাড়া এই প্রকৃতি কথা বলতে পারে না। আরো আশ্চর্য কথা হলো গণিতের ভাষায় প্রকাশিত হয়ে প্রকৃতির এই হিলবার্ট স্পেসকে কম্প্লেক্স রাশি হতে হয়— যে কমপ্লেক্স রাশি গণিতেই নিরর্থক।

প্রকৃতিকে গণিতের ভাষায় পাওয়ার চূড়ান্ত একটি উদাহরণ স্বরূপ আজকের কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আগে হাজির করা হলো। তবে গ্যালিলিও-নিউটনের সময়ের পদার্থবিদ্যায়ও গণিতের ভাষাটি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। গ্যালিলিওর খুব খসড়া-ধরণের এক্সপেরিমেন্টের ভেতর দিয়েই পড়ন্ত বস্তুর গতির মৌলিক নীতিগুলো ধরা পড়েছিলো। ওপর থেকে ভারি ও হালকা জিনিস এক সঙ্গে ফেলে তিনি যখন সেগুলোর পতন লক্ষ্য করছিলেন বাতাসের বাধার কারণে সেই এক্সপেরিমেন্ট নিখুঁত হবার কোন সুযোগ ছিলনা। কিন্তু তার মধ্য দিয়েও তিনি বুঝতে পারছিলেন যে ভারী ও হালকা সব জিনিস ভর-নির্বিশেষে একই ভাবে নিচের দিকে সমহারে ত্বরণ লাভ করে এবং একই সঙ্গে মাটিতে পৌঁছে। পরে নিউটন এর মধ্যে বিস্তৃততর গণিতকে দেখতে পেয়েছেন যার ফলে পৃথিবীর ছুঁড়ে দেয়া ঢিল থেকে শুরু করে চঁদের পৃথিবী পরিক্রমণ পর্যন্ত সব রকম গতিকে একই সর্বব্যাপ্ত নিয়মের আওতায় আনতে পেরেছিলেন। শুরুতে তাঁর নিজেরই উদ্ভাবিত ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের হিসেবগুলো খুব নিখুঁত ছিলনা। তা ছাড়া এর সঙ্গে পর্যবেক্ষণ থেকে বাস্তব যে তথ্য যোগ করতে হচ্ছিল তাও কিছুটা নড়বড়ে ছিল। ফলে কার্যত সত্যিকার সমস্যাগুলোর সমাধানে ফলাফল ৪% পর্যন্ত এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এসম্পর্কে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গণিতের ভাষ্য সব সময় নিখুঁতই ছিল। যেই মাত্র

ক্যালকুলাসের হিসেব সঠিক হয়েছে, পর্যবেক্ষণ করা পরিমাপগুলো অন্তত এই গণিতের দিক থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ত্রুটিমুক্ত হয়েছে, তখুনি সেই নিঁখুত ভাষ্যটি প্রকাশ পেয়েছে। তখন গণিতের হিসেব আর বাস্তব পর্যবেক্ষণের মধ্যে পার্থক্যটি এক শতাংশের দশ হাজার ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে! সেই নিউটনের আমল থেকে আজ অবধি পদার্থবিদ্যায় এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে প্রকৃতি সম্পর্কে গণিতের ভাষ্য এমনি ধারার সূক্ষ্মতার সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গে মিলে গেছে।

কেউ কেউ একে বেশ স্বাভাবিক মনে করেন এই যুক্তিতে যে গণিতের থিওরেমগুলো যথেষ্ট সরল প্রকৃতির আর এদের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব। কাজেই বিজ্ঞান যখন জটিল প্রকৃতিকে সরল করে দেখে তার মধ্যে গণিতের মতই সহজ সৌকর্যময় কিছু নিয়ম আন্দাজ করেন তখন গণিতের ওই ব্যাপক সম্ভারের মধ্যে কোথাও না কোথাও ঠিক সেই নিয়মের মতই গাণিতিক সম্পর্ক খুঁজে পান— যাতে বিজ্ঞানীর তত্ত্বের নিয়ম আর গণিতের নিয়ম উভয়ে সুন্দর ভাবে মিলে যেতে পারে। কিন্তু সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের সম্পর্কে এমন কথা খাটেনা। এখানে প্রকৃতির যে ধরণের নিয়ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর মধ্যে ধরা পড়ছে এবং তার জন্য যে ধরণের গণিত ব্যবহৃত হচ্ছে গাণিতিক ও দার্শনিক দিক থেকে সেগুলো সরলও নয়, সাধারণভাবে প্রযোজ্যও নয়। কাজেই অন্তত এসব ক্ষেত্রে গণিতের নিয়ম আর প্রকৃতির নিয়ম এত নিখুঁতভাবে মিলে যাওয়াটিকে রহস্যময় না বলে উপায় থাকে না।

সুন্দর গণিতেই প্রকৃতি প্রতিফলিতঃ

আইনস্টাইন মনে করতেন একটি ভাল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অবশ্যই সুন্দর ও সৌকর্যময় হতে হয়। এই সৌন্দর্যের মূল রয়ে গেছে গণিতের মধ্যে। গণিতবিদ যুগে যুগে যে সব অক্ষয় থিওরেম রেখে গেছেন এই সৌন্দর্যই সেগুলোর প্রাণ। কেউ বলতে পারেন এ আবার কী রকম সৌন্দর্য? সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর শিল্পকর্ম এসবের একটি মানে আছে, কিন্তু গণিত সুন্দর কীভাবে হয়? এটি এযুগের একজন বিখ্যাত গণিতবিদ বার্ট্রান্ড রাসেলের লেখা থেকে বোঝার চেষ্টা করি যিনি গণিতবিদ হওয়া ছাড়াও দার্শনিক, লেখক এবং আধুনিক জীবনের একজন বোদ্ধা হিসেবে বিংশ শতাব্দীর সেরা ব্যক্তিত্বগুলোর একজন। তিনি লিখেছেন "গণিতকে যদি সঠিকভাবে দেখা হয় তা হলে বোঝা যায় এটি শুধু সত্যই নয় এটি পরম সুন্দরও বটে। এই সৌন্দর্যের রয়েছে একটি কঠিন শীতল বাহুল্যহীন রূপ— যেমনটি ভাস্কর্যের মধ্যে দেখা যায় তেমন। যে রকম সৌন্দর্য সাধারণত আমাদের দুর্বলতর চেতনাগুলোতে ধরা পড়ে এ সে রকম নয়, চিত্রকলায় বা সঙ্গীতে যে বর্ণাঢ্যতা ওসব শিল্পের কিছু কিছু আকর্ষণের কারণ হয় এ সেরকমও নয়। এতে আছে খুব উচ্চ মার্গের বিশুদ্ধ নিকষ রূপ যা শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ

শিল্পকলাগুলোতে পাওয়া সম্ভব। এর যে সত্যপ্রেমী আনন্দের ভাব, এর যে অনাবিল শিহরণ এটি মানুষকে অতিক্রম করে যায়। গণিতের এই উচ্চ স্থানীয় সৌন্দর্য পরশ মণির মত কাজ করে— যা কবিতার মধ্যেও দেখি।"

আইনষ্টাইন যে গণিতের সৌন্দর্যমণ্ডিত বিজ্ঞানকেই গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞান মনে করবেন সেটিই স্বাভাবিক— কারণ টেন্‌সর ক্যালকুলাসে রচিত তাঁর যে 'ফিল্ড ইকোয়েশন'গুলো আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করেছে সেগুলো গাণিতিক সৌন্দর্যের কিছু সেরা উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। ইতিহাসে পেছনের দিকে গেলে নিউটনের গতিবিদ্যার নিয়মগুলো মহাবিশ্বের সব গতিকে যখন এক নিয়মে ঘড়ির কাঁটার মত সুশৃঙ্খলতায় দাঁড় করিয়েছিলো— সেখানেও গাণিতিক সৌন্দর্য কাজ করেছিলো। নিউটনীয় গতিবিদ্যা তিন শত বছর ধরে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো এবং পরে তার গাণিতিক সৌকর্য এত সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো যে তাকে বলা হতো ক্ল্যাসিকাল বা চিরায়ত গতিবিদ্যা। একেবারে সাম্প্রতিক কালে এসে ইলেকট্রন, এটম ইত্যাদি ক্ষুদ্র বস্তুর গতিতে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এই চিরায়ত তত্ত্বকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে বদলে নিতে হলো। এই পরের তত্ত্বটি আগেরটি থেকে একেবারে বৈপ্লবিক ভাবে আলাদা— আগেরটি যেখানে বস্তুকে কণায় গঠিত মনে করতো সেখানে পরেরটি তার মধ্যে তরঙ্গের রূপ দেখতে পেলো, আবার তরঙ্গের মধ্যেও কণার রূপ দেখতে পেলো। আগেরটি যেখানে সব কণার সুনির্দিষ্ট অবস্থান, বেগ ইত্যাদি বলে দেবার দাবী করতো, পরেরটি সেখানে শুধু ওসবের সম্ভাব্যতা দেবার দাবী করে। এত অমিল সত্ত্বেও উভয় তত্ত্বের গাণিতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কিন্তু অদ্ভুত রকম মিল রইলো, যদিও আধুনিকতর তত্ত্বে এই সৌন্দর্য আরো বিকশিত হয়েছে। এই সৌন্দর্যের একটি অংশ হলো কার্যক্ষেত্রে দারুণ সব অমিল সত্ত্বেও ক্ল্যাসিকাল আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের খুবই বিমূর্ত গাণিতিক অমিলটুকুকে সংক্ষেপে ধারণ করা যায় শুধু একটি জায়গায় এনে— এর রাশিগুলো গুণ করার নিয়মের ক্ষেত্রে ভিন্নতা এনে। ক্ল্যাসিকাল গতিবিদ্যায় সেই গুণ অংকটি কষা হয় আমাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে যেখানে a ও b যদি এরকম রাশি হয় তাহলে $a \times b$ এবং $b \times a$ এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এভাবে গুণ করার সময় কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরের প্রভেদ না থাকাকে বলা হয় কম্যুটেটিভ হওয়া। কোয়ান্টাম তত্ত্বে ব্যাপারটি কিন্তু কম্যুটেটিভ নয়— যেখানে $a \times b$ কিন্তু $a \times b$ এর সমান হয়না, বরং এই দুইয়ের পার্থক্যটি খুবই বড় গুরুত্ব বহন করে।

একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানে গাণিতিক সৌন্দর্যকে গুরুত্ব দেবার ফলে সেখান থেকেই বিজ্ঞানের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার ঘটতে পেরেছে এমন উদাহরণের বড় কৃতিত্ব পদার্থবিদ পল ডিরাকের। তিনিও আইস্টাইনের মত মনে করতেন গাণিতিক সৌন্দর্যকে অনুসরণ করেই বিজ্ঞান বাস্তব প্রকৃতিকে

উদ্ঘাটন করতে পারে। ১৯২৮ সালে ডিরাক আলোর গতির কাছাকাছি বেগে চলমান ইলেকট্রনের জন্য এমন একটি কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক সমীকরণ দিয়েছেন যাতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বকে অঙ্গীভূত করা হয়েছে। এভাবে ইলেকট্রন বা অনুরূপ যে সব ক্ষুদ্র কণিকাকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ীর বর্ণনা করতে হয় তার মধ্যে আপেক্ষিক তত্ত্বের সন্নিবেশ ঘটানোর ফলে পদার্থবিদ্যার এই দুই বৈপ্লবিক তত্ত্বকে এক জায়গায় আনার সুযোগ ঘটেছিলো এবং এজন্য ডিরাক নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু এই সমীকরণ ডিরাকের জন্য একটি সমস্যা ছুঁড়ে দিয়েছিলো— এর একই সঙ্গে দু'রকম সমাধান হতে পারে। একটি সমাধানে ইলেকট্রনকে ধনাত্মক শক্তিতে পাওয়া যায়, অন্যটিতে একে ঋণাত্মক শক্তিতে পাওয়া যায়। এ যেন $x^2=4$ এই সমীকরণের দুটি সমাধান 2 এবং -2 হবার মত। ডিরাক-সমীকরণের এভাবে দুটি সমাধানে গাণিতিক দিক থেকে সমস্যা না থাকলেও বিজ্ঞানের দিক থেকে সমস্যা রয়েছে। কণিকার ধনাত্মক শক্তিটি বোধগম্য, ঋণাত্মকটি নয়। এরকম অদ্ভুত ফলের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা সাধারণত নিজের গাণিতিক তত্ত্ব থেকে পিছিয়ে গিয়ে অন্যভাবে চেষ্টা করেন। ডিরাকও বলেছেন তাঁর জন্য নিরাপদ উপায় হতো তত্ত্বটিকে কিছুটা অন্যভাবে বিবেচনা করে সমীকরণটিকে এমন ভাবে বদলে নেয়া যাতে ঋণাত্মক শক্তির সমাধানটি না আসে। সেটি সম্ভবও ছিল। কিন্তু ডিরাক সে পথে গেলেন না।

ডিরাক দেখলেন ওভাবে পিছিয়ে গেলে যে সমীকরণটি আসে তাতে কম্প্লেক্স রাশি থাকে— যা সমীকরণটির গাণিতিক সৌন্দর্যকে দারুণ ভাবে ব্যাহত করবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সুন্দর গণিতই প্রকৃতিকে সঠিক ভাবে প্রমাণ করবে, অসুন্দর গণিত নয়। তাই তিনি তাঁর মূল সমীকরণে অবিচল থেকে বরং ধরে নিলেন যেন এর ঋণাত্মক শক্তি বিশিষ্ট সমাধানটি মিথ্যে নয় বরং এটি প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করছে। এই বক্তব্যকে তিনি উদ্ঘাটন করলেন এভাবে— ধনাত্মক শক্তির সমাধানটি সাধারণ ইলেকট্রনের জন্য হলেও ঋণাত্মক শক্তির সমাধানটি ইলেকট্রনের জন্য নয় বরং অন্য সব ব্যাপারে ইলেকট্রনের মত হয়েও বৈদ্যুতিক চার্জের দিক থেকে তার বিপরীত একটি কণিকার জন্য। ইলেকট্রনের চার্জের সমান অথচ বিপরীত এমন ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রন-সদৃশ কণিকার জন্য একই গণিতের দৃষ্টিতে তাকালে শক্তিকে ঋণাত্মকই মনে হবে। মুশকিল হলো এমন কোন কণিকার কথা তো আমাদের জানা নেই। তাতে দমে না গিয়ে ডিরাক বল্লেন কোন পরোয়া নেই, এখন জানা নেইতো কী হয়েছে, গণিত যখন বল্ছে তখন তেমন কণিকা থাকতেই হবে, খুঁজলেই পাওয়া যাবে। তাই তিনি স্রেফ গণিতের প্রতিসাম্যের সৌন্দর্যের (সিমেট্রির) ওপর আস্থা রেখে পজিট্রন নামের ধনাত্মক ইলেকট্রন অর্থাৎ এটি ইলেকট্রনের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। পরে একই যুক্তিতে এরকম সব কণিকার

বিপরীত কণিকা থাকবে এমন ভবিষ্যদ্বাণীও চলে এলো— যেমন প্রোটনের বিপরীত এ্যান্টি-প্রোটন, সেটি প্রোটনের মত ধনাত্মক চার্জের না হয়ে তারই সমান ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হবে। এভাবে বিপরীত কণিকা বা প্রতি-কণিকা দিয়ে গড়া প্রতি-এটমের কথাও এসে পড়লো যা সাধারণ বস্তুর মত প্রতি-বস্তু (এ্যান্টি-ম্যাটার) গড়তে পারে। কণিকার সঙ্গে তার প্রতি-কণিকার বা বস্তুর সঙ্গে তার প্রতি-বস্তুর সাক্ষাত হলে উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য এও বোঝা গেল। কিন্তু সব এলো স্রেফ গণিতের সৌন্দর্যের ওপর আস্থা থেকে, এখনো প্রকৃতি থেকে নয়।

ডিরাক পজিট্রনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ১৯২৮ সালে। এর মাত্র চার বছর পর ১৯৩২ সালে ডিরাকের কথিত সেই সব গুণ সম্পন্ন কণিকা পজিট্রন বাস্তবে আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু তাই নয় একে একে অন্যান্য প্রতি-কণিকাগুলোকেও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এবং প্রতি-বস্তুর অস্থিত্ব, কণিকা ও প্রতি-কণিকার সমন্বয়ে উভয়ের ধ্বংস সবই কালক্রমে প্রকৃতিতেই খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সুন্দর গণিত সত্যি কথা বলে— ডিরাকের এমন আস্থা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ভাবে প্রকৃতির এক অভিনব জগতের সন্ধান দিতে পেরেছে। ভাবতে অবাক লাগে যে গণিত সেটি করেছে তা প্রকৃতির কোন অংশ নয়, বরং এসেছে আগাগোড়া মানুষের মস্তিষ্ক থেকে। এতে সেই রহস্যটি আরো ঘনীভূত হয়েছে। যে গণিতকে মানুষ উদ্ভাবন করেছে কারো কারো মতে 'খেলাচ্ছলে', তার ভেতরে প্রকৃতির বাস্তব সত্যগুলো এমনভাবে লুকিয়ে থাকে কেমন করে?

গণিতে-প্রকৃতিতে মিলে যাওয়ার রহস্য

বিস্ময়, শুধু বিস্ময়:

গ্যালিলিও যে গণিতে-প্রকৃতিতে মিলে যাওয়ার ব্যাপারটি ধরতে পেরেছিলেন তা তাঁর বিখ্যাত উক্তি থেকে আমরা জেনেছি— প্রকৃতির গণিতের ভাষায় কথা বলা নিয়ে সেই উক্তি। কিন্তু গ্যালিলিও এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এমন কিছু জানা যায়না। অবশ্য সেই আমলটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু হয়েছে মাত্র। বিস্ময়ের তখনো বেশ বাকি। এরপর বিজ্ঞানের ব্যাপারে গণিতের অবাক করা ভূমিকা ক্রমেই বেড়েছে— বিশেষ করে পদার্থবিদ্যায়। আর সাম্প্রতিকতম পদার্থবিদ্যায় গণিত শুধু বিজ্ঞানের হয়ে কথাই বলছেনা— অনেক ক্ষেত্রে গণিতই যেন প্রকৃতির নিয়মগুলোকে ধারণ করছে।

বিশেষ করে যেসব বিজ্ঞানীর হাতে গণিতের এই ক্ষমতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই বিষয়ে তাঁদের বিস্ময়ের ও হতবাক হবার সীমা ছিলনা। তাঁদের মধ্যে আইনস্টাইনের কথা বলা যায়— যাঁর তত্ত্বে, বিশেষ করে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে গাণিতিক সৌকর্যটি এমন ভাবে প্রকৃতি উদ্ঘাটন করেছে যা অতুলনীয়। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আইনস্টাইন বলেছেন "এখানে এমন একটি ধাঁধাঁ সৃষ্টি হয়ে এসেছে যা যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের বিস্ময় উৎপাদন

করেছে। গণিত কীভাবে বাস্তবের জিনিসগুলোকে একবারে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলে— সেই গণিত যা কিনা মানুষের মনগড়া ফসল, বাইরের অভিজ্ঞতার ওপর যার বিন্দুমাত্র নির্ভরশীলতা নেই। তবে কি মানুষের মনের যুক্তিধারা অভিজ্ঞতার ব্যবহার না করে শুধু কল্পনার মাধ্যমে বাস্তব জিনিসের গুণাগুণের হদিশ পেতে পারে?"

বাস্তবতা-সংস্পর্শ বর্জিত গণিত যে বাস্তবতার দিক-নির্দেশনা দিতে পারে তা আধুনিকতম বিজ্ঞানে শুধু আইনস্টাইনকেই বিস্মিত করেনি, এর আরো অনেক দিকপালকে করেছে। যেমন ভিগনার এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করে তার শিরোনাম করেছেন: "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে গণিতের অযৌক্তিক কার্যকারিতা।" আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বে গণিতের অভাবনীয় কার্যকারিতার একজন বড় সাক্ষী ভিগনার, অথচ তিনিও এই অভাবনীয় কার্যকারিতার পেছনে কোন স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাননি। ভিগনারের মতে অনেকে খুব সরল মনে ব্যাপারটিকে পদার্থবিদদের একটি মানসিক দুর্বলতা মনে করেন। তাঁরা বলেন পদার্থবিদরা প্রকৃতির দুটি ঘটনার মধ্যে কোন রকম জটিল সম্পর্ক দেখলেই এর সুরাহা করার জন্য চট্ করে গণিতের মধ্যে একই ধরণের কোন সম্পর্ক খোঁজ করেন। কিছুটা হলেও গণিতে সেরকম কোন সম্পর্ক খুঁজে পেলে অমনি তাঁরা মনে করেন প্রকৃতির সম্পর্কটি গণিতের এই সম্পর্কটিই অনুসরণ করবে। এর কারণ বিজ্ঞানের চর্চায় গণিত ছাড়া আর কোন যুৎসই ভাষা তাঁদের জানা নেই। কাজেই বিজ্ঞানীদের সীমাবদ্ধতার কারণেই গণিতে-প্রকৃতিতে এরকম মিলগুলো আপাতভাবে দেখা যায়। ভিগনার নিজে অবশ্য মিলগুলোকে এরকম কাকতালীয় বলে মোটেই মনে করেন না। উভয়ের এই মিলটি এতই সূক্ষ্ম এবং এতই সর্বব্যাপ্ত যে তা মোটেই কাকতালীয় হতে পারে না। স্পষ্টত এটি গণিতের একটি সার্বভৌম সক্ষমতা, যাকে বিস্ময়কর বল্‌লে কম বলা হয়। তাই ভিগনার তাঁর উল্লেখিত প্রবন্ধটির ইতি টেনেছেন এভাবে: "পদার্থবিদ্যার নিয়ম আবিষ্কারে গণিতের ভাষার অলৌকিক উপযুক্ততাটি আমাদের জন্য একটি বিরাট আশীর্বাদ হিসেবে এসেছে— যাকে আমরা না ঠিকমত বুঝতে পারি, না এর জন্য নিজকে যোগ্য করে তুলতে পারি। আমরা শুধু এর জন্য নিজেদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি এবং আশা করতে পারি যে ভবিষ্যতে এটি উত্তরোত্তর জ্ঞানের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হবে, ভালমন্দ যেমনিই হোক এটি আমাদের আনন্দকে বাড়াবে এবং সেই সঙ্গে এ নিয়ে হতবাক হবার মাত্রাটিও বাড়িয়ে দেবে।"

বিজ্ঞান-জ্ঞানের উৎস নিয়ে ভাবেন এমন যে কোন চিন্তাবিদের জন্য গণিতে-প্রকৃতিতে মিলে যাওয়ার এই বিষয়টি বিস্ময় উৎপাদন না করে পারে না। তবে তার মানে এই নয় যে এমন বিস্ময়কর জিনিস কীভাবে সম্ভব হয় তা নির্ণয় করার ব্যাপারে তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

বিজ্ঞান যখন প্রকৃতির নিয়ম উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে তখন প্রকৃতিকে দেখে দেখেই তাকে সেটি করতে হয়। কিন্তু গণিতের নিয়মগুলো মানুষের মনেই সৃষ্টি। এই দুই যখন বিস্ময়কর ভাবে মিলে যায় তখন স্বাভাবিক ভাবে মনে হতে পারে তবে কি মানুষের মনের ওপরেই কোন এক ভাবে প্রকৃতির সব অজানা তথ্যের ছাপ রয়েছে? ডিরাক কিন্তু এটি উল্টো ভাবে দেখছেন। গাণিতিক যুক্তি যে প্রকৃতি থেকে পাওয়া তথ্যগুলো নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে তার অর্থ হতে পারে প্রকৃতির নিজেরই এক রকমের গাণিতিক গুণ রয়েছে। ডিরাকের মতে প্রকৃতির এই গাণিতিক গুণ হালকা ভাবে দেখার জিনিস নয়, বরং এর অবস্থিতি প্রকৃতির একেবারে গভীরে। আধুনিক পদার্থবিদ্যায় গণিত কী সূক্ষ্মভাবে কাজ করে তা অনুধাবন করলেই শুধু এই গভীরতাটি টের পাওয়া যায়। বোঝা যাচ্ছে যে কেউ ব্যাপারটিকে দেখছেন মনের ওপর প্রকৃতির ছাপ হিসেবে, আবার অন্যেরা দেখছেন প্রকৃতির ওপরে সেই মনের গড়া গণিতের ছাপ হিসেবে।

গণিতে-প্রকৃতিতে অলক্ষ্যে অভিসারঃ

আগেই বলেছি গণিতে-প্রকৃতিতে অদ্ভুত মিলের জন্য বিজ্ঞানীরা শুধু বিস্মিত হবেন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের কাজে এই আশীর্বাদকে গ্রহণ করবেন, কিন্তু এই মিলের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করবেন না, তা হয়না। এসব বিষয় নিয়ে ভাবেন এমন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-দার্শনিকরা নানা দিক থেকে এর কারণ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ বরং বিস্মিত হওয়াটিকেই বিস্ময়ের চোখে দেখেছেন। তাঁরা বলেন কে বলেছে গণিত একেবারেই প্রকৃতি-সম্পর্কহীন মনগড়া জিনিস? আসলে গণিতে-প্রকৃতিতে অলক্ষ্যে প্রচুর মেলামেশা চলেছে, যার ফলে গণিতের এক একটি দিক একেবারে প্রকৃতি-সংশ্রব ছাড়াই গড়ে ওঠেছে একথা ঠিক নয়। শুরুতে ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বতসিদ্ধগুলো যে প্রকৃতির বাস্তবতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে তা বলাই যায়। কাজেই সেই স্বতসিদ্ধ থেকে যুক্তির ভিত্তিতে হয়েছে যেই পুরো জ্যামিতি— তা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন হয় কী ভাবে? হ্যাঁ একথা সত্য যে পরে গণিতবিদরা ভেবে ভেবে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিও উদ্ভাবন করেছেন এমন ভিন্ন স্বতসিদ্ধ নিয়ে যেগুলো তাঁরা প্রকৃতিতে দেখেননি। তবে ইউক্লিডীয় স্বতসিদ্ধ যা প্রকৃতিতে দেখেছেন সেগুলোই তো তাঁদেরকে কাল্পনিক ভিন্ন ধরণের 'স্থানের' কথা ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পরে আইনস্টাইনের বিকৃত 'স্থানের' বর্ণনায় সেটি প্রকৃতি-ব্যাখ্যায় খাপে খাপে মিলেও গিয়েছিলো। অন্য একটি উদাহরণ নিলে গণিত আমাদের সাধারণ মানুষের চেনা তিন মাত্রার অতিরিক্ত যেকোন সংখ্যক মাত্রা কল্পনা করে দিব্যি তাকে নিয়ে অংক করতে পারে। কিন্তু বাস্তবের তিন মাত্রাই তো গণিতবিদকে বহু মাত্রায় পাখা মেলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাস্তবিক ৩-কিউব না দেখলে গণিতবিদের কাছে কাল্পনিক ৪-কিউব কি ধরা দিতো?

চিন্তা-সূত্রের গোড়াটি প্রকৃতির সংশ্রবে রয়েছে একথা বলেই কিন্তু উল্লিখিত রহস্যটিকে হালকা করে দেখার উপায় নেই। শুধু এই গোড়ার চিন্তা সূত্রই আধুনিক পদার্থবিদ্যার অভিনব সব প্রকৃতি-আচরণ গণিতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দেবে একথা মানা শক্ত। ব্যাপারটিকে অন্য এক ভাবেও দেখা যায়। প্রকৃতি খুব জটিল, বিজ্ঞানী চান একে সরল ভাবে বর্ণনা করতে— সে কাজ সহজে হবার নয়। অন্যদিকে জটিল গণিতকে তার আসন্নরূপে সরল ও সুন্দর গণিতে প্রকাশ করা খুবই সম্ভব কাজ। কাজেই বিজ্ঞানকে নিজের এই সরলীকরণের কাজে গণিতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। গণিত এই ভার সহজে বহন করতে পারে কারণ গণিতের কাজ শুধু সম্পর্ক নিয়ে, যা কোন বিশেষ বাস্তব কিছুর সম্পর্ক নয়। এই সম্পর্কগুলোকে যেমন নানা কাজ নিয়োজিত করা যায় তেমনি মনের মত করে এদের আসন্ন রূপও নেয়া যায়। আর এসব সম্পর্কের বৈচিত্রও মাথা ঘুরে যাবার মত। কাজেই প্রকৃতিতে সরল নিয়ম খোঁজার কাজে রত বিজ্ঞানী যে গণিতের মধ্যে নিজের আরাধ্য সম্পর্কগুলো খুঁজে পাবেন তা আর বিচিত্র কী? উদাহরণ স্বরূপ তিনি যখন শক্তি, ভরবেগ, ইত্যাদির মধ্যে অপরিবর্তনীয়তা অর্থাৎ নিত্যতার (কনজারভেশন) নীতি খুঁজে পেয়েছেন তখন নিউটনের মহাকর্ষের ব্যস্ত-বর্গ গণিতটি তার থেকে স্বাভাবিক ভাবে এসেছে। স্থানটি ইউক্লিডীয় বলেই ওটি বর্গ হয়েছে, অন্য কিছু হয়নি। এর একটি উপমা নেয়া যাক। দালানের নানা অংশ গড়ার কাজে কংক্রীট ঢালাইয়ের সময় ওই অংশের আকৃতি অনুযায়ী বাক্সের মত ছাঁচ বানিয়ে নিতে হয়। সধারণত এটি তৈরি হয় নানা আকার আকৃতির লোহার পাতকে শাটার হিসেবে ব্যবহার করে। যে কোন দালান তৈরির জন্য শাটার আগে থেকে তৈরি থাকে। এদেরকে নানা আকৃতিতে বেঁধে নানা আকৃতির দালান-অংশ নির্মাণ করা যায়। এসব তৈরি শাটারে যেমন বৈচিত্র ও নমনীয়তা থাকে বলেই এটি সম্ভব হয়, তেমনি গাণিতিক সম্পর্কগুলোতেও এসব গুণ আছে বলেই তা প্রকৃতির বিচিত্র নিয়মে পরিণত হতে পারে। এতরকম বিচিত্র সম্পর্ক গণিতে ঢুকলো কী করে? গণিতবিদরাই এ প্রশ্নের ভাল উত্তর দিতে পারবেন— এটি তাঁদের সৃষ্টিশীলতার অংশ।

পুরো ব্যাপারটির মধ্যে দূতিয়ালি করছেন বিজ্ঞানী নিজে। তাঁর পর্যবেক্ষণ ও অনুমান থেকে তিনি প্রকৃতির নিয়মটিও আঁচ করছেন, আবার উপযুক্ত গাণিতিক সম্পর্কটিও খুঁজে নিচ্ছেন। এভাবে গণিতবিদ এবং বিজ্ঞানীর মাধ্যমেই গণিতে আর প্রকৃতিতে একটি গোপন অভিসার চল্‌ছে একথা বলা যায়। গণিতের কাছে এসে প্রকৃতির নিয়ম নমনীয়তা পাচ্ছে। প্রকৃতির নানা পর্যায়ে আলাদা আলাদা অনেক জিনিস রয়েছে যার প্রত্যেকটিকে আলাদা ভাবে চেনা, তার সম্পূর্ণ আলাদা নিয়ম উদ্ঘাটন করা অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃতির উদ্ঘাটন এ জন্যই এত জটিল। প্রকৃতিতে ইলেকট্রন আছে, পাথরের টুকরাও আছে, পৃথিবী আছে, তারা আছে, গ্যালাক্সি আছে— অথচ গণিতে এদের সব

কিছুকে বিন্দু, গোলক এমনি অভিন্ন গণিত দিয়ে প্রকাশ করা যায়। প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানের ধারণা যখন বদলায় তখন বিজ্ঞানের তত্ত্ব বদলে যায়, কিন্তু গণিতের থিওরেম বদলায়না; বড় জোর গণিতের এক থিওরেমের বদলে অন্য থিওরেম কাজে লাগে— কিন্তু কোন থিওরেমই বদলায় না।

ভিগনার বিজ্ঞানের গণিতের কার্যকারিতাকে 'অযৌক্তিক' বা ব্যাখ্যার অতীত বলে উল্লেখ করলেও সবাই ব্যাপারটিকে সেভাবে দেখতে চান্না। পদার্থবিদ্যার অত্যাধুনিক তত্ত্বগুলো আবিষ্কারে বিজ্ঞানী বার বার গণিত আর প্রকৃতির মধ্যে যাওয়া আসা করেছেন। ওই বিস্ময়কর মিলগুলো এই যাওয়া-আসারই ফলশ্রুতি। একই কথা কোন কোন গণিতের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস সৃষ্টির সময় বাস্তব প্রকৃতিতে তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের হার, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদির সঙ্গে, এবং ইনটেগ্র্যাল ক্যালকুলাস সৃষ্টির সময় একটি রেখার দ্বারা আবদ্ধ বাস্তব জায়গার ক্ষেত্রফলের সঙ্গে তার সম্পর্ক মনে রাখতে হয়েছে। এ সময় নিঃসন্দেহে ক্যালকুলাসের সৃষ্টিকার একবার প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন, অন্যবার গণিতের দিকে তাকিয়েছেন, এ ভাবে বার বার। সব ক্ষেত্রে এই যাওয়া আসা এরকম স্পষ্ট না হতে পারে, কিন্তু অলক্ষ্যে হলেও এই 'অভিসার' ঠিকই ঘটেছিলো।

তবে আইনস্টাইন বা ভিগনারের মত অনেকে যে এদের সম্পর্ক নিয়ে রীতিমত হতবাক হয়েছেন তারও কারণ আছে। তাঁদের হাতে গড়া সর্বাধুনিক পদার্থবিদ্যায় প্রকৃতি উদ্ঘাটনে গণিত এমন সব সুগভীর ও সার্বভৌম ভূমিকা পালন করেছে যা গণিতে-বিজ্ঞানে উল্লিখিত সাধারণ যোগাযোগের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়না। এ প্রসঙ্গে $\sqrt{-1}$ এই সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং নিরর্থক গাণিতিক ধারণাটিকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অঙ্গাঙ্গিক অংশ হবার কথা, কিংবা ডিরাক সমীকরণের আপাত নিরর্থক গাণিতিক সমাধানের সূত্র ধরে প্রতি-কণিকার পুরো জগতটাই খুঁজে পাওয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে 'অভিসার' যদি ঘটেও থাকে তা এত গভীর জলের অভিসার যে স্পষ্ট কিছু ধরা পড়ার উপায় নেই। প্রকৃতির একেবারেই গভীরে লুক্কায়িত নিয়ম এত স্পষ্ট ভাবে গণিতের পক্ষে বলে দেয়াটিতে হতবাক হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?

বিজ্ঞানে গণিতের অংশ ও গণিত-বহির্ভূত অংশ:

বিজ্ঞানের যে কোন পরিস্থিতিতে এখান থেকে আর কোথায় গেলে কী ফল পাব তার হিসেব করতে গেলে গণিতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেটি করার জন্য এখন এখানে কী পরিস্থিতি বিরাজ করছে আগে সেটি নিখুঁত ভাবে জানতে হয়— যা গণিতের কাজ নয়, বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ বা পরিমাপের কাজ। এই অংশটিকে বলা হয় 'শুরুর অবস্থা' (ইনিশিয়াল কন্ডিশন)। যেমন নিউটনের গতি সূত্র ও মহাকর্ষ তত্ত্বের গণিত দিয়ে ভবিষ্যতের যে কোন অবস্থান, গতি ইত্যাদি নিখুঁত

ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হলেও এর জন্য আগের যে কোন সময়ের বা 'শুরুর' সময়ের অবস্থান, গতি ইত্যাদি জানতে হবে। এটি ছুঁড়ে দেয়া একটি ঢিলের জন্য যেমন প্রযোজ্য, তেমনি কোন গ্রহের জন্যও প্রযোজ্য। একই ভাবে পদার্থবিদ্যার সব তত্ত্বেরই দুটি অংশ থাকে— একটি গণিতের অংশ, এবং অন্যটি শুরুর অবস্থার অংশ। বিজ্ঞানকে ব্যবহারিক কাজে লাগিয়ে আমরা যখন একটি যন্ত্র তৈরি করি সেক্ষেত্রেও কথাটি সত্য— যন্ত্র এবং প্রকৃতির যান্ত্রিক সিস্টেম উভয়ে তো তুলনীয়। তাই যন্ত্রটি এরপর কী করবে তা গণিত দিয়ে হিসেব করা যায় বটে কিন্তু তার জন্য এর শুরুর অবস্থা পৃথক ভাবে জানা থাকা চাই — এটি একটি মোটর হলে যেমন, একটি নিউক্লিয়ার চুল্লী হলেও তেমন। এর অর্থ প্রকৃতি যতই গণিতের ভাষায় কথা বলুক বিজ্ঞানের এক অংশ কিন্তু থেকে যায় গণিতের কাজের বাইরে প্রকৃতি-পাঠের হাতে, অথবা যন্ত্র বা মেশিনের পাঠের হাতে।

এ দুই অংশ সম্পর্কে ডিরাকের বক্তব্য হলো ব্যাপারটি নিউটনের সময় যত স্পষ্ট ভাবে ছিল একেবারে আধুনিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে ঠিক সেভাবে নেই। নিউটনের পদার্থবিদ্যা ছিল যান্ত্রিক ধরণের তাই তা যন্ত্রের বা মেশিনের সঙ্গে তুলনীয়। এতে গণিতের গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তার মত শুরুর অবস্থা জানার গুরুত্বও সমানে রয়েছে। কিন্তু ডিরাকের মতে আধুনিক পদার্থবিদ্যার কোন কোন অংশে ওই শুরুর অবস্থার অংশটি নেই বল্‌লেই চলে। তাই এর পুরোটাই গণিতের অংশ হতে পারে। এর একটি ভাল উদাহরণ হলো মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কিত বিগ্-ব্যাং তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটি মুহূর্তে হঠাৎ করে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি তখন থেকে ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে। ওই মুহূর্তে মহাবিশ্বের জন্মের মধ্য দিয়ে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই স্থান আর কাল সৃষ্টি হয়েছে— এর আগে স্থান বলে কিছু ছিলনা, কাল বলেও কিছু ছিলনা। এর আগে এই স্থান বা এই কাল কথাটির কোন অর্থই হয়না, কাজেই ওখানে শুরুর অবস্থা বলেও কিছু নেই। মহাজাগতিক এই পুরো প্রক্রিয়াটি শুধু গণিতের সঙ্গেই জড়িত— প্রকৃতি-পাঠ থেকে এর কোন অংশ আসতে হয় না। একথা অবশ্য আধুনিক সব তত্ত্ব সম্পর্কে বলা যায়না— যেমন কোয়ান্টাম তত্ত্বে শুরুর অবস্থা তো রয়েছেই, বরং গণিতের বাইরে আরো বাড়তি কিছু অংশ আছে কোয়ান্টাম উল্লম্ফনের (কোয়ান্টাম জাম্প) মত অনিশ্চিত জিনিসের কারণে। কিন্তু ডিরাকের মতে এটি কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি বড় দুর্বলতা। আধুনিক পদার্থবিদ্যায় বরং ক্রমে বেশি বেশি করে বিগ-ব্যাঙের মত তত্ত্বই থাকছে যা একেবারেই গণিত-সর্বস্ব, গণিতের বাইরে কোন অংশ নেই। এভাবেই ভবিষ্যতে পদার্থবিদ্যার গণিতীকরণ সব অর্থেই সম্পূর্ণতা লাভ করবে। ডিরাকের ভাষায় সেটি হবে গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস ও তাঁর অনুসারীদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন— যাঁরা মনে করতেন এই বিশ্বের সব কিছুর মূলে রয়েছে এক, দুই, তিন ইত্যাদি স্বাভাবিক

সংখ্যা-ব্যবস্থা। এই সংখ্যা-ব্যবস্থা যেহেতু গণিতের ভিত্তি, প্রকারান্তরে তাঁরা বিশ্ব-প্রকৃতিকে শুধু গণিতময় বলেই মনে করেছেন। সেটি ছিল তাঁদের একটি দার্শনিক ভাবনা, কিন্তু আজ তা পদার্থবিদ্যার কঠিন নিরিখে বাস্তব হতে চলেছে।

রহস্যটির পেছনে কি মানব-মস্তিষ্কই নয়:

কেউ কেউ প্রকৃতির নিয়ম গণিতের মুখে শুনে হতবাক হন্‌না, তাঁরা একে বরং স্বাভাবিক মনে করতেই ভালবাসেন। তাঁরা বলেন আমাদের ফুসফুসের মধ্যে যে অসংখ্য রন্ধ্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেলুনের মত আধার রয়েছে তা ঠিক বাইরের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপযুক্ত করে তৈরি। কই তাতে তো আমরা হতবাক হইনা! কারণ আমরা জানি বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যুৎসই করেই আমাদের ফুসফুস তৈরি হয়েছে— নইলে আমরা বেঁচে থাকতামনা। আমাদের অতীত পূর্বসূরী অন্য প্রাণীদের ফুসফুস ছিলনা কারণ তখন বায়ুমণ্ডলে এত অক্সিজেন ছিলনা, ওটি অন্য ভাবে পানি থেকে তাদেরকে নিতে হতো— কারণ তারা তখন জলজ প্রাণী ছিল। সম্ভাব্য নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়ে ফুসফুসটিই এসেছে কারণ ততদিনে বর্তমানের মত বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়ে গিয়েছিলো।

একই ভাবে যে মানব মস্তিষ্ক গণিত সৃষ্টি করছে সেই মস্তিষ্কই প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছে— কাজেই গণিত সৃষ্টি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা মিল্‌লেই তো পারস্পরিক সেই অদ্ভুত সহযোগিতা ফলপ্রসূ, নইলে নয়। বিবর্তন অবশ্য যে মস্তিষ্ক সৃস্টি করেছে তা উচ্চতর গণিতের জন্য করেনি বরং মানব বিবর্তনের সব চেয়ে সংকটময় ও কার্যকর সময়ে শিকার, আত্মরক্ষা, হাতিয়ার তৈরি ইত্যাদির প্রয়োজনেই মস্তিষ্কের সক্ষমতাগুলো গড়েছিলো। কিন্তু সেই সক্ষমতাগুলোর বর্ধিত অংশই বর্তমানের অনেক উচ্চতর কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে— উচ্চতর গণিত সহ। একই ভাবে প্রকৃতিকে একেবারে গভীরে গিয়ে ব্যাখ্যা করার উচ্চতর বিজ্ঞানের সক্ষমতাও এই মস্তিষ্কেই সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানের তত্ত্বের জন্মও হয় মানুষের এই মস্তিষ্কেই। প্রকৃতিকে অভিজ্ঞতায় ধারণ করার পর বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কে তত্ত্বের জন্ম না হলে প্রকৃতির নিয়ম লুকানো ও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় প্রকৃতিতেই থেকে যেতো। প্রকৃতি সম্পর্কে মস্তিষ্কের অনুমানগুলো সূক্ষ্মভাবে এভাবেই গণিত-চিন্তার মধ্যে ঢুকে যাওয়া স্বাভাবিক। সেটি এক মস্তিষ্কে নয়, বরং বহু মস্তিষ্কের সমন্বয়ে যুগে যুগে ধারাবাহিকভাবে ঘটেছে। আমাদের গণিত তাই ক্রমেই আমাদের বিজ্ঞানের মত তথা প্রকৃতির মতো হয়ে ওঠেছে, যেভাবে আমাদের ফুসফুস ক্রমে বায়ুমণ্ডলের মত হয়ে ওঠেছে। হ্যাঁ, বিজ্ঞানের তত্ত্ব যে প্রকৃতির মতো তা বিজ্ঞানীদের একটি দাবী। প্রকৃতি খুবই বাস্তব, বিজ্ঞানীদের দাবী অনুযায়ী বিজ্ঞানের তত্ত্বও বাস্তব। বিজ্ঞানের দাবীকৃত এই বাস্তবতার ধরণ কী তার আলোচনা আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়।

বিজ্ঞানের কথাগুলো কতটা বাস্তব সত্য

বিজ্ঞান কি বাস্তব, নাকি বাস্তব নয়— এই বিতর্ক

বাস্তবতা বোঝার উপায়:

বিজ্ঞানে যেসব কথা বলা হয় তার সবকিছু বাস্তব কি না এমন প্রশ্ন উঠবে কেন? এরকম একটি প্রশ্ন ওঠাইতো অবাক হবার বিষয়— অন্তত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানমনস্কদের কাছে। বিজ্ঞানের বাস্তবতা নিয়ে কোন সংশয় তাঁদের থাকলে তাঁরা তো বিজ্ঞানে আস্থাই রাখতে পারতেননা। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের মধ্যে, এমনকি বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা বেছে বেছে বিজ্ঞানের কোন কোন অংশকে অবাস্তব মনে করেন তাঁদের পছন্দের সঙ্গে মিলছেনা বলে। যেমন শিম্পাঞ্জি আর মানুষের একই পূর্বপুরুষ ছিল বিজ্ঞানের এমন কথা নেহাৎ কল্পনা মাত্র— এভাবেই অনেকে নিজেদেরকে বোঝান। এসব ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ভিন্ন কথা, এগুলো বিজ্ঞানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞান-দার্শনিক যথেষ্ট যুক্তি সহকারে মনে করেন বিজ্ঞান সফল এবং উপযোগী হলেও তার সব কথা ঠিক বাস্তব সত্য নয়। বিজ্ঞানের বাস্তবতায় এই সন্দেহবাদীদের যুক্তিগুলো বিবেচনার দাবী রাখে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের তত্ত্বে এমন অনেক জিনিসের কথা আছে যেগুলো দেখা যায়না, তাই পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য। এগুলোর বাস্তব অস্থিত্ব সম্পর্কে সন্দেহটি তাঁদের প্রবল।

একটি উদাহরণ নেয়া যাক। বিজ্ঞানের তত্ত্বে ইলেকট্রন জিনিসটি খুবই সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের অসংখ্য তত্ত্বে ও তাদের বাস্তব প্রয়োগে নানা ভাবে ইলেকট্রনের ধারণাকে ব্যবহার না করে কোন উপায় নেই। বিজ্ঞানী যখনই ইলেকট্রনের কথা বলেন তখনই এটিকে একটি বাস্তব জিনিস মনে করেই সেকথা বলেন, যে জিনিসের সত্যিকার অস্থিত্ব প্রকৃতিতে রয়েছে। এর নানা গুণ, আচরণ ইত্যাদি বিজ্ঞানের তত্ত্বে যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে বাস্তবেও তেমনটিই মনে করেন। যাঁরা বিজ্ঞানীর কাছে ইলেকট্রনের কথা শোনেন, তাঁরাও একে সে ভাবেই গ্রহণ করেন। অথচ ইলেকট্রন জিনিসটি কেউ কোনদিন দেখেনি, কোন যন্ত্রের মধ্য দিয়েও না। এটি কখনো সরাসরি পর্যবেক্ষণে আসার কথা নয়, তাই এটি বিজ্ঞানের কথিত একটি পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিস। তা সত্ত্বেও এটি সত্যি আছে মনে করার কারণ হলো ইলেকট্রন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর সাফল্য। এসব তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো খুব যুক্তিসঙ্গত ভাবে আসে,

এবং হুবহু ফলে যায়। ইলেকট্রনের বাস্তব অস্থিত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা প্রযুক্তির সব সিস্টেম— যেমন তড়িৎ প্রকৌশল, ইলেকট্রনিক্স, রেডিও যোগাযোগ, কম্পিউটার, সবই একেবারে প্রত্যাশিত ভাবে চমৎকার কাজ করে। ইলেকট্রনের বাস্তব অস্থিত্ব না থাকলে তা কি সম্ভব হতো?

বিজ্ঞানের কথিত অসংখ্য জিনিস এভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে এসেছে। আমাদের সামনের টেবিল-চেয়ারের মত এগুলো দেখা বা ধরাছোঁয়ার জিনিস না হলেও বিজ্ঞানের বহু রকম এক্সপেরিমেন্টে অথবা অন্য বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যসাবুদে এগুলো খুব যুক্তিসঙ্গত ভাবেই পরোক্ষে প্রমাণিত হয়েছে। এগুলোকেও তাই বিজ্ঞানীরা ও অন্যান্যরা কতকটা টেবিল-চেয়ারের মতই বাস্তব বলে মনে করেন। কিন্তু এই বাস্তবতার স্বরূপ সম্পর্কে নানা মত আছে। অধিক সন্দেহবাদীরা তো এদেরকে আদৌ বাস্তব বলেই মনে করেননা। একারণেই 'বিজ্ঞানের বাস্তবতা' (সায়েন্স রিয়ালিজম) নামে পরিচিত এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের তত্ত্বে পর্যবেক্ষণ-যোগ্য এবং পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য এই দু'রকমের জিনিসই থাকে। ধরাছোঁয়ার মধ্যের সব জিনিস পর্যবেক্ষণ-যোগ্য, খালি চোখে দেখা জিনিসও তাই। এর মধ্যে বল, মার্বেল, পেন্ডুলাম ইত্যাদি তো পড়েই, তেমনি একদিকে কাছের ধূলাবালি, ও অন্যদিকে দূরের খালি চোখে দেখা আকাশের জ্যোতিষ্কগুলোও পড়ে। পর্যবেক্ষণ-যোগ্য এসব জিনিসের বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিজ্ঞানীরা অবশ্য শুধু খালি চোখে দেখা জিনিস নয়, যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি দেখা জিনিসগুলোকেও পর্যবেক্ষণ-যোগ্য মনে করেন— যেমন অণুবীক্ষণে দেখা দেহকোষ অথবা শুধু দূরবীক্ষণে দেখা বেশি দূরের তারা, গ্যালাক্সি ইত্যাদিকে। যন্ত্রের জটিলতা একটু বেশি দূর এগোলে কোন কোন সন্দেহবাদী এর ভেতর দিয়ে দেখাকে পর্যবেক্ষণ হিসেবে গণ্য করতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁরা বলেন যন্ত্রের ভূমিকার কারণে এই ভাবে দেখা বস্তুটির অস্থিত্ব সম্পর্কে তা আমাদেরকে সরাসরি নিশ্চিত করতে পারে না। যদিও বিজ্ঞানীরা দেখার যন্ত্র ঠিক কোন্ নীতিতে কাজ করছে এবং কেমন করে প্রকৃত জিনিসটির ইমেজ ফুটিয়ে তুলছে তার বর্ণনার মাধ্যমে সন্দেহবাদীদের এ যুক্তির মোকাবেলা করতে পারেন।

পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য অনেক জিনিসকে অবশ্য যন্ত্রের সাহায্য নিয়েও সরাসরি আমাদের গোচরে আনা সম্ভব হয়না। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোতে এরকম যন্ত্রের সাহায্যেও দেখতে না পাওয়া জিনিসও কম নেই। ইলেকট্রনের মত কণিকাগুলো যেমন এর মধ্যে পড়ে তেমনি এটম, অণু, বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, ডিএনএ, জিন, মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে উত্তেজনা ইত্যাদি আরো কত কিছু। এসব জিনিস সম্পর্কে আমরা জেনেছি শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে; এক্সপেরিমেন্ট বা অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে তত্ত্ব এসবকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত

করেছে। তাই আমরা বিজ্ঞানকে বোঝার সময় পর্যবেক্ষণ-যোগ্য জিনিসের মত এগুলোকেও বাস্তব বলে মনে করি। যদিও এই পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলোর অস্থিত্ব সরাসরি আমাদের মধ্যে কোন চেতনা জন্মায়না, তবু এগুলোর মাধ্যমে বিজ্ঞান যে সাফল্য অর্জন করেছে সেটিই আমাদেরকে এগুলোকে সত্য মানতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে পর্যবেক্ষণ-যোগ্য ও পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসের বাস্তবতায় বিশ্বাস যে এক রকমের নয় সেটি মনে না রেখে উপায় নেই।

সাফল্যের ব্যাপারটি এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত ভাল তত্ত্বগুলো প্রকৃতির যে ব্যাখ্যা দেয়, এবং সেই ব্যাখ্যায় যে সব পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসের অস্থিত্ব ও ভূমিকা অপরিহার্য, সবকিছু মিলেই তত্ত্বগুলো প্রকৃতির আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী করে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী যখন অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতে হুবহু ফলতে দেখি, তখন তত্ত্বের অপরিহার্য সব অংশকে সত্য বলে না মানার কোন উপায় থাকে না। তাছাড়া এরকম পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য এক একটি জিনিস— যেমন এটম, ইলেকট্রন, বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, ডিএনএ'র বেইসক্রম ইত্যাদি যে শুধু একটি তত্ত্বের একটি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতো নয়— সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতির অনেকগুলো ক্ষেত্রে ব্যবহার করে সবখানে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী পাচ্ছি। সবখানেই তাদের পরিচিতি ও চরিত্র একই। এর মানে এদের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের নিজের মধ্যে সুসঙ্গতি রক্ষিত হচ্ছে। যদি কেউ বলে যে আসলে ওই তত্ত্ব সত্যি নয়, ওতে ব্যবহৃত পর্যক্ষেণ-অযোগ্য জিনিসগুলোর অস্থিত্ব নেই, তা হলে এই সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করার একটি উপায়ই থাকে, তা হলো এগুলো সত্য না হওয়া সত্ত্বেও অলৌকিক ভাবে সফল হচ্ছে— বার বার সবখানে এই অলৌকিকতার খেলা দেখাচ্ছে! কোন বিজ্ঞানী বা কোন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি আর যাই হোক অলৌকিকতাকে মেনে নিতে পারেন না।

বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাসের বড় কারণটি আমরা দেখলাম। তবে এই বিশ্বাসেরও নানা ভঙ্গি আছে, যার আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। একে তিনটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে— অস্থিত্বের প্রশ্নে, ভাষার প্রশ্নে এবং জ্ঞানের প্রশ্নে। এক্ষেত্রে অস্থিত্বের প্রশ্নে বিশ্বাসটি হলো এমন বিশ্বাস যে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট বা অন্য সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য এই জিনিসগুলো আছে কি নেই তার ফয়সালা হয়ে যেতে পারে। তবে যাঁরা বিজ্ঞানের বাস্তবতা নিয়ে সন্দিহান (বাস্তবতা-বিরোধী) তাঁরা এভাবে হওয়া ফয়সালাকে সঠিক মনে করেন না। তাঁরা বলেন ওই এক্সপেরিমেন্টের আয়োজনেই তো আগে থেকে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলোর আইডিয়া লুকানো রয়েছে। যেমন কোন এক্সপেরিমেন্টে আমি ইলেকট্রন উদ্ঘাটন-যন্ত্র বসাচ্ছি কেন, ওই উদ্ঘাটন যন্ত্রে কাঁটা নড়লে বা কট্ কট্ আওয়াজ হলে ওখানে ইলেকট্রনের উপস্থিতি জানান্ দিচ্ছে এমন মনে করছি কেন, ওই

ইলেকট্রনের অস্থিত্বে আগে থেকেই বিশ্বাস করে বসে আছি বলেইতো। সর্ষের মধ্যেই তো ভূত— সেই সর্ষে ভূত ছাড়াবে কী করে? অবশ্য এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে তত্ত্ব ভর করার এই যুক্তিটি আমরা আগেই দেখেছি এবং বিজ্ঞানীরা সেটি কী ভাবে খণ্ডন করে তাও দেখেছি।

ভাষার প্রশ্নে বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাসটির স্বরূপ কী? বিজ্ঞান যখন পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য কোন জিনিসকে অন্তর্ভূক্ত করে একটি বাক্য প্রকাশ করে এবং সেই বাক্যটি শুধু অর্থপূর্ণই হয়না বরং প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে সত্য বলেও প্রমাণিত হয় তখন বাক্যে অন্তর্ভূক্ত সব কিছুও সত্য হতে বাধ্য। অন্য ভাবে বল্‌লে বিজ্ঞানের তত্ত্বের বক্তব্য যে ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সেভাবে তা বিশ্বাসযোগ্য হয় সেভাবেই সত্যি সত্যি কাজ করে বলে। কিন্তু বিরোধীরা এখানেও আপত্তি দেন। তাঁদের কথা হলো বিজ্ঞানের বাক্য অর্থপূর্ণ হয় শুধু তার মধ্যে পর্যবেক্ষণ-যোগ্য জিনিসগুলোর কারণে। ওর মধ্যে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য কিছু থাকলে সেগুলোকেও পর্যবেক্ষণ-যোগ্য জিনিসগুলোর বর্ধিত করা অংশ হিসেবেই একটি অর্থ দেয়া হয়, যে কারণে সেগুলো সহ বাক্যটি অর্থপূর্ণ হতে পারে। পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলোর নিজ থেকে কোন অর্থ হয়না, কাজেই এই ভাষাগত বাস্তবতা দেখে তাদেরকে বাস্তব মনে করলে ভুল করা হবে। মনে করা যাক বিজ্ঞানের একটি বাক্যে 'ইলেকট্রন' শব্দটি রয়েছে। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের অংশ হলে এই বাক্যটি স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক অর্থ বহন করে যা প্রমাণিত সত্যও বটে। তাই বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাসী সবাই এই ইলেকট্রন শব্দটি দিয়ে বিজ্ঞান যা যা বোঝায় তার সব কিছুকে বাস্তব সত্য মনে করে, অর্থাৎ ইলেকট্রন বাস্তব জিনিস। অন্যদিকে বিজ্ঞানের বাস্তবতার বিরোধীরা মনে করেন ইলেকট্রন শব্দটির আসলে নিজস্ব কোন অর্থ নেই, পর্যবেক্ষণের অযোগ্য হওয়ার ফলে; যেই কারণে 'পঙ্খীরাজ ঘোড়ার' কোন অর্থ নেই। তারপরও 'রাজকুমার পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন' এমন বাক্য অর্থপূর্ণ। রূপকথায় এটি তাৎপর্যপূর্ণও বটে; কারণ পাখী ও ঘোড়া এই দুই পর্যবেক্ষণ-যোগ্য জিনিসের শব্দার্থকে এর মধ্যে বর্ধিত করে এমন ভাবে দেয়া হয়েছে যেন এর একটি অর্থ হয়। যেই অর্থ তাতে হয় তা কিন্তু আসলে সত্যি নয়। বিজ্ঞানের বাক্যে ইলেকট্রন শব্দটি দেখেও আসলে আমরা তত্ত্বে কথিত ইলেকট্রনের আঘাতে টেলিভিশনের কেথোড রে' টিউবের পর্দায় সৃষ্টি হওয়া আলোর বিন্দু ইত্যাদিকে মনে করি। অর্থাৎ কিনা এটি পর্যবেক্ষণ-যোগ্য আলোর বিন্দু ইত্যাদি থেকে বর্ধিত করা অর্থ, ইলেকট্রনের নিজস্ব অর্থ নয়। তাঁদের মতে ইলেকট্রন পর্দায় সৃষ্ট আলোর বিন্দুর মত পর্যবেক্ষণ-যোগ্য জিনিসের একটি উপমা মাত্র; উপমা কোনদিন বাস্তব হয়না। বোঝা যাচ্ছে বাস্তবতার ভাষাগত ব্যাখ্যা দুই পক্ষ দুই ভাবে দিতে পারে।

জ্ঞানের প্রশ্নেও বিজ্ঞানের বাস্তবতাকে অনেকটা এভাবেই দুই পক্ষ দু'ভাবে দেখে থাকেন। বিজ্ঞান বাস্তবতায় বিশ্বাসীরা এই প্রশ্নেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে স্পষ্ট ভাবে সত্য হিসেবে দেখেন কারণ বিজ্ঞানের পদ্ধতিটিই প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের নিশ্চিত উপায় হিসেবে গড়ে ওঠেছে। বিরোধীরা অবশ্য এতে আপত্তি দিয়ে বলেন ওকথা শুধু পর্যবেক্ষণ-যোগ্য জিনিসগুলোর জন্য প্রযোজ্য, বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে বাস্তবতার গ্যারান্টি হিসেবে নিতে পারা। পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জ্ঞানের যে এলাকা তা শুধু পর্যবেক্ষণ-যোগ্য জিনিসের মাধ্যমেই আলোচনায় আসতে পারে। ওভাবে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসের জ্ঞান কখনো এমন নিশ্চিত কিছু হতে পারে না যার ভিত্তিতে তাকে বাস্তব সত্য বলে মানা যাবে।

বোঝা যাচ্ছে যে বিজ্ঞানের বাস্তবতা যত রকম কারণে বেশ স্বাভাবিক মনে করা হোক না কেন সেগুলোকে কিছু না কিছু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তবে যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করেন এবং যাঁরা সক্রিয়ভাবে বিজ্ঞানের অনুধাবনকারী বা প্রয়োগকারী তাঁরা বিশেষ আরো একটি কারণে বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাস করেন। আমরা যখন এক জায়গার একটি জিনিসকে নিয়ে অন্যত্র কোন একটি কাজ সফল ভাবে করাতে পারি, এবং ওটাকে দিয়ে আরো নানা ক্ষেত্রে আরো নানা কাজ করাতে পারি, তখন যে যা বলুক আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে জিনিসটি একেবারেই বাস্তব। যেমন ধরা যাক আমি আন্দাজ করছি আমার হাতে একটি সাঁড়াশি আছে। তার ধারালো অগ্রভাগ দিয়ে আমি এখানে একটি তারে চাপ দিলাম- তারটি কেটে দু'ভাগ হয়ে গেল। সাঁড়াশিটির ভোতা অংশ দিয়ে দুটি তারকে আলগোছে চেপে ধরে ক্রমে মোচড়ালাম— তার দুটি একটির চারিদিকে অন্যটি পেঁচ খেয়ে গেল। ওই ভোতা অংশ দিয়ে একটি পুরু টিনের পাতকে জোরে চাপ দিলাম— পাতটি ওখানে অনেক পাতলা হয়ে গেলো। তখন কেউ যদি বলে আমার হাতে সাঁড়াশির মত কিছু নেই, সাঁড়াশি বলেই কিছু নেই, আমি কি সে কথা মানবো? তখনো কি আমি শুধু আন্দাজই করবো যে সাঁড়াশির মত কিছু আমার হাতে থাকতেও পারে, নাকি নিশ্চিত হবো যে জলজ্যান্ত একটি বাস্তব সাঁড়াশিই আছে। বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলো দিয়ে বিজ্ঞানীরা সারাক্ষণ এভাবে নানা ক্ষেত্রে কাজ করাচ্ছেন— প্রকৃতির উদ্ঘাটনে, ব্যাখ্যায় এবং বাস্তবিক প্রয়োগে। তাঁরা যখন এগুলো করেন, এবং সর্বত্র করতে সক্ষম হন তখন একে বাস্তব ধরে নেয়া ছাড়া তাঁদের আর কোন গত্যন্তর থাকে না, পর্যবেক্ষণ-যোগ্য জিনিস হলে যেভাবে বাস্তব মনে করতেন, ঠিক সে ভাবে।

বিজ্ঞান থেকেই একটি উদাহরণ দেয়া যাক। তুঁতে একরকম অনচ্ছ নীল কৃস্টাল যা পানিতে গলে যায়। কেমিস্ট্রির তত্ত্ব বলে এটি কপার সালফেট অর্থাৎ এতে তামা আছে, আর সালফার ও অক্সিজেনে গড়া সালফেট আছে।

এসবের কোনটাই ওই কৃস্টালের মধ্যে পর্যবেক্ষণ-যোগ্য নয়। কিন্তু কেমিস্ট্রির ওই তত্ত্ব থেকেই আমরা আরো জানি যে তুঁতের জলীয় দ্রবণে ওই তামা আর সালফেট আলাদা হয়ে যায় তামা ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয়ে এবং সালফেট ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয়ে। দ্রবণটিকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মধ্যে রাখলে, অর্থাৎ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতের দুটি ইলেকট্রোড পরস্পর কিছু ফাঁক রেখে এই দ্রবণে ডোবালে তামা ঋণাত্মকের দিকে এবং সালফেট্ ধনাত্মকের দিকে যাবে। ঋণাত্মক ইলেকট্রোড যদি লোহার তৈরিও হয় এর ওপর তামা দেখা যাবে। এই সব ব্যবস্থা যদি নেয়া হয় এবং তামা যদি দেখা যায়, সেটি তুঁতের মধ্যে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য তামা যে আছে তার বাস্তবতাকেই নিশ্চিত করবে। আবার তুঁতের সেই জলীয় দ্রবণের অন্য একটি অংশ নিয়ে তার সঙ্গে বেরিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ মেশালে তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের পরিচিত পর্যবেক্ষণ-যোগ্য সাদা বেরিয়াম সালফেট গুড়া পাওয়া যাবে, প্রথম দ্রবণের সালফেট দ্বিতীয় দ্রবণের বেরিয়ামের সঙ্গে মিলে। আগেরটির থেকে ভিন্ন এই দ্বিতীয় এক্সপেরিমেন্টে ঠিক তাই পাওয়া গেলো। তুঁতের কৃস্টালে যে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য সালফেট আছে তাও প্রমাণ হলো। এরকম আরো অন্যান্য এক্সপেরিমেন্টেও যে ফল পাওয়া গেল তুঁতের মধ্যে তামা ও সালফেটের বাস্তব অস্থিত্ব না থাকলে তা সম্ভব হতো না। বিজ্ঞানের বাস্তবতার ওপর বিশ্বাস এভাবেই তৈরি হয়। এটি খুব সাদাসিদা উদাহরণ। কিন্তু পজিট্রনের মত একেবারেই অভিনব গুণ সম্পন্ন পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য একটি অতি ক্ষুদ্র কণিকাকে যদি অসংখ্য সংখ্যায় রশ্মির আকারে একটি উপযুক্ত টার্গেটের ওপর ফেলে দেখি যে তত্ত্ব অনুযায়ী পজিট্রনের যে যে প্রতিক্রিয়া ওই টার্গেটের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত ঠিক তাই তাই হচ্ছে তা হলে পজিট্রন জিনিসটা বাস্তব নয় একথা কেমন করে বলবো? যে অর্থে ওই সাঁড়াশিকে অবাস্তব বলতে পারিনি, সেই অর্থেই এখানেও পারবোনা।

বিজ্ঞানের বাস্তবতায় সন্দেহঃ

বিজ্ঞানের বাস্তবতায় কারো কারো যে সন্দেহ আছে তা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি, তাঁদের সন্দেহের পেছনে কিছু কিছু যুক্তির সাক্ষাতও আমরা পেয়েছি। তবে এই সন্দেহের মূল কারণ হলো তাঁরা মনে করেন বিজ্ঞানের সফল হওয়া এবং তার সত্য হওয়া সমার্থক নয়; সত্য না হয়েও সফল হওয়া যায়। তার মানে অবশ্য এও নয় যে তাঁরা বিজ্ঞানের সাফল্যগুলোকে কাকতালীয় ভাবে ঘটে যাওয়া ব্যাপার মনে করেন, বিজ্ঞান যে নায্যভাবে তার সঠিক তত্ত্বের মাধ্যমেই সফল হয় এ কথাও তাঁরা মানেন। তবে সাধারণভাবে তাঁদের অধিকাংশই মনে করেন যে বিজ্ঞানের তত্ত্বের মধ্যে যে সব কথা বলা হয়, বিশেষ করে যে সব পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসের কথা সেগুলো প্রকৃতিকে

ব্যাখ্যা করার এক রকম কৌশল হিসেবেই আনা হয়, এগুলোকে সত্য মনে করার কোন কারণ নেই। কৌশল হিসেবে যদি এগুলো ঠিক মত কাজ করে তা হলে প্রকৃতির ওই ব্যাখ্যা ফলপ্রসূ হয়, বিজ্ঞান সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, এবং সে কারণে প্রয়োগেও সফল হয়। পর্যবেক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে মিলে যাবার মত করেই কৌশলগুলো নির্ধারিত হয়, তাই এগুলো কার্যকর হয়। ম্যাজিশিয়ানের নেয়া কৌশলগুলো যেমন বাস্তবে কার্যকর হয় এও অনেকটা সে রকম, যদিও বিজ্ঞান যে ম্যাজিক নয় এ কথাও তাঁরা মানেন। কার্যকর হওয়ার জন্য ম্যাজিককে যেমন সত্য হতে হয়না, বিজ্ঞানকেও সত্য হতে হয়না। বিজ্ঞানীরা বা বিজ্ঞানমনস্ক অধিকাংশ মানুষ বিজ্ঞানের সাফল্যের এই ব্যাখ্যা যে মেনে নেবেন না, তা বলাই বাহুল্য। তত্ত্বে থাকা কথাগুলোর সত্যিকার অস্থিত্ব আছে বলে নয়, বরং কার্যকর কৌশল দেখাতে পেরেছে বলেই বিজ্ঞান এমন সব দুর্দান্ত কাজ করতে পারছে, প্রকৃতিকে এত ভাবে জয় করতে পারছে— এসব তাঁরা একেবারেই উদ্ভট চিন্তা মনে করবেন।

কিন্তু বিজ্ঞানের বাস্তবতার এই বিরোধীদের হাতে বিজ্ঞানকে ওভাবে দেখার জন্য খুবই মোক্ষম একটি যুক্তি আছে, আর সেটি আসে বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে। এই ইতিহাসে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব ক্রমাগত বদলিয়েছে। একসময় কোন কিছু ব্যাখ্যায় যে তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়েছে, যেই তত্ত্ব তখনকার মত যথেষ্ট সফলও হয়েছে, পরে দেখা গেছে তার জায়গায় অন্য তত্ত্ব এসেছে যা আগেরটির অনেক কিছুকেই নাকচ করে দিয়েছে। অথচ এই নতুন তত্ত্বও যথেষ্ট সফল হয়েছে, বেশি সফল হয়েছে বলেই এটি এসেছে। পরস্পর ভিন্ন এই দুই তত্ত্ব একই সঙ্গে সত্য হয় কী করে? যদি দেখি আগের তত্ত্বের কোন কোন অপরিহার্য পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসকে পরের তত্ত্বে একেবারে বাতিল করা হয়েছে— তাহলে এ জিনিসগুলোর সত্যতা তো থাকতে পারে না। সাফল্যের কারণে এক সময় সত্য ছিল, পরে আর সত্য থাকেনি এমন তো হতে পারে না। হ্যাঁ কৌশল ধরে নিলে দুইই চল্‌তে পারে, প্রথম তত্ত্বটি এক কৌশলে সফল হয়েছিলো, পরেরটি অন্য কৌশলে আরো ভালভাবে সফল হয়েছে। বিজ্ঞানের হুবহু বাস্তবতার বিপক্ষে এটি বেশ যুৎসই যুক্তি।

এক তত্ত্ব গেছে, আরেক তত্ত্ব এসেছে— বিজ্ঞানের ইতিহাস এমন উদাহরণে ভরপূর। আলোক তত্ত্বের কথাটিই নেয়া যাক। নিউটন আলোকে এক রকম কণায় গড়া মনে করতেন এবং তার ভিত্তিতে আলোর প্রায় সব কিছুর সফল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সফল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তরঙ্গ-তত্ত্ব হিসেবে আলোর একটি বিকল্প তত্ত্ব থাকলেও দীর্ঘ সময় সবাই আলোর এই কণা-তত্ত্বকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এ তত্ত্ব পরে পরিত্যক্ত হয়ে আলোর তরঙ্গ-তত্ত্বকে সবাই গ্রহণ করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আলো এক রকম তরঙ্গ। তরঙ্গ-তত্ত্ব আলোর সব কিছুকে আরো সুন্দর ব্যাখ্যা করেছে, তত্ত্ব হিসেবে

অত্যন্ত সফল হয়েছে। ম্যাক্সওয়েল প্রমুখ এই তরঙ্গকে অদৃশ্য অদ্ভুত সব গুণের অধিকারী ইথারের তরঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন— যে ইথার সর্বত্র বিরাজমান। পরে আইনস্টাইন দেখিয়েছেন ওই ইথার বলে কিছু নেই, আলোর তরঙ্গের জন্য কোন মাধ্যম লাগেনা। আর এও আইনস্টাইন ও অন্যান্যরা দেখিয়েছেন আলো তরঙ্গ হলেও একই সঙ্গে কণাও বটে। এক আলোর তত্ত্বে আমরা কতবার পরিবর্তন দেখলাম; আলো কীসে গড়া তার উত্তরে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসের কথা পেলাম এক সময় এটি, এক সময় এটি নয় ওটি, আবার পরবর্তী সময়ে (বর্তমানে) উভয়ে। সত্যিকার অস্থিত্ব থাকলে তো বড়জোর এদের একটিরই তা থাকতে পারে; সন্দেহবাদীরা বলেন আসলে ওদের কোনটিরই অস্থিত্ব নেই।

এরকম উদাহরণ প্রায় সব তত্ত্বের ক্ষেত্রেই আছে। আধুনিক বিজ্ঞানেই তাপকে দীর্ঘদিন মনে করা হতো একটি অদৃশ্য তরলের মত যার নাম দেয়া হয়েছিলো ক্যালোরিক। এই ক্যালোরিক তত্ত্ব দিয়ে তাপের সব আচরণের ব্যাখ্যা করা হতো, সে ব্যাখ্যা বেশ সফলও ছিল। যেমন বেশি উত্তপ্ত জিনিসে ক্যালোরিকের তল উঁচুতে বলে তা অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত জিনিসের সংস্পর্শে এলে তার দিকে প্রবাহিত হয় যতক্ষণ না উভয়ের তল এক বরাবর আসে অর্থাৎ উভয়ে সমান উত্তপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ক্যালোরিক তত্ত্ব টেকেনি কারণ এটি সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এর জায়গায় আসা তাপের গতীয় তত্ত্ব সেটি করতে পেরেছিলো। এই নতুন তত্ত্ব বলে তাপ গতিরই আর এক প্রকাশ— নিজের অণুগুলোর ছোটাছুটি বাড়লেই কোন বস্তুকে বেশি উত্তপ্ত বলা হয়। উভয়েই সফল তত্ত্ব— যদিও পরেরটি অনেক বেশি সফল হয়েছে এবং আগেরটিকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিতে পেরেছে। একই তাপের এই দুটি বর্ণনা তো একই সঙ্গে সত্য পারে না। আমরা আধুনিক কেমিস্ট্রিতে ড্যালটনকে দেখেছি এটমকে মার্বেলের মত নিরেট ধরে নিয়ে এর ভিত্তিতে চমৎকার সফল কেমিস্ট্রি গড়ে তুলতে। কিন্তু আরো সাম্প্রতিক কালে পদার্থবিদরা কিছু সময় পর পর এটমের নতুন মডেল দিয়েছেন। অপরিহার্য দিকগুলোতে তখনকার মত এদের প্রত্যেকটিকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে— একটিকে বলা হয়েছে 'কিসমিস দেয়া পুডিং মডেল', পরেরটিকে 'সৌরজগত মডেল', আর বর্তমানে যেটি প্রতিষ্ঠিত তা হলে কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্মত 'কুয়াশা মডেল'। এগুলো একটি থেকে অন্যটি যথেষ্ট আলাদা। সত্যিকার এটম বাস্তবে বড়জোর এর একটির মত হতে পারে, তা হলে অন্যটিকে যখন সত্য মনে করা হয়েছে তা ভুল ছিল। এটিই বিজ্ঞানের বাস্তবতার বিরোধীদের সব চেয়ে বড় যুক্তি। শুধু তাই নয় তাঁরা এর মধ্যে এক রকম ইনডাকশন দেখতে পান। আগেই দেখেছি ইনডাকশন মানে কোন কিছু বার বার ঘটতে দেখলে তা সব সময় ঘটে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে এমনটি মনে করা। কাজেই আগে তত্ত্ব বদলিয়েছে, এখন

ওগুলো এত নিশ্চিত ও সত্য যে ভবিষ্যতে আর কোনদিন বদলাবেনা; এমনটি হবার উপায় নেই। বিজ্ঞানের তত্ত্ব আগে যখন বার বার বদলিয়েছে ভবিষ্যতেও বদলাবে। ক্যালোরিকের কথা এখন কেউ বলেনা— এটিকে বাস্তব মনে করা দূরে থাক, ইথারের কথাও কেউ বলেনা। কাজেই যেই ইলেকট্রনকে আজ বিজ্ঞানীরা অবধারিত ভাবে প্রকৃতির বাস্তব অংশ মনে করছেন ভবিষ্যতে তার পরিণতি যে কেলোরিক বা ইথারের মত হবেনা, তা কে জানে।

বিজ্ঞানের বাস্তবতার বিরোধীরা এর সঙ্গে আরো কিছু যুক্তি যোগ করেন। প্রায়শ এমন একাধিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় যার প্রত্যেকটি প্রকৃতির কোন ঘটনার ভাল ব্যাখ্যা করতে পারে। ওপরের উদাহরণগুলোতে নিউটনের কালে ও তার পরপর আলোর কণা-তত্ত্ব ও তরঙ্গ-তত্ত্ব উভয়েই এমনটি করছিলো। কিন্তু একই ঘটনার জন্য একই সঙ্গে একাধিক ভিন্ন তত্ত্ব সঠিক হতে পারে না। এরকম ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা তত্ত্বের এমন কিছু গুণের কথা বলেন যেগুলো যে তত্ত্বে বেশি থাকে সেটিকেই সঠিক তত্ত্ব হিসেবে বেছে নেয়া হয়। যেমন অপেক্ষাকৃত সরল ব্যাখ্যা যে তত্ত্ব দেয় তাকে বেছে নেয়া হয়— আলোর ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গ-তত্ত্বকে বেছে নেবার যা অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু সরল হওয়ার গুণকি সত্য হওয়াটি নিশ্চিত করে? বাস্তবতা বিরোধীরা বরং বলেন এমনোতো হতে পারে যে পরস্পর প্রতিযোগী ওই তত্ত্বগুলোর কোনটাই সত্য নয়; ওখানে যে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলোর কথা বলা হয়েছে (যেমন আলোর ক্ষেত্রে কণা, তরঙ্গ ইত্যাদি) এগুলোর কোনটিই বাস্তব নয়; আমরা আসলে কয়েকটি মিথ্যা তত্ত্ব থেকে সব চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা দানকারী তত্ত্বটি বেছে নিচ্ছি!

বিজ্ঞানের বাস্তবতার প্রতি এত বড় যে চ্যালেঞ্জটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে বার বার তত্ত্ব পরিবর্তনের কারণে তৈরি হয়েছে তা বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাসীদের কাছে মোটেই অজানা কিছু নয়। এটি তাঁদেরকেও সংযত করেছে; বিজ্ঞানের বাস্তবতার অর্থ তাঁরা এজন্য এমন ভাবে করে থাকেন যে তত্ত্ব বদলাবার আগে পুরানো তত্ত্বের এক রকম বাস্তবতা থাকে, তত্ত্ব বদলাবার পর নতুন তত্ত্বেরও তা থাকে। এটি সম্ভব, কারণ তাঁরা বিজ্ঞানের জিনিসগুলোর বাস্তব হওয়াটিকে হ্যাঁ বা না রূপে দেখেননা, বরং তাকে বিভিন্ন মাত্রায় বাস্তব হতে দেখেন— তত্ত্বের গুণ অনুযায়ী। অতীতের যে তত্ত্বগুলো পরিপক্ক ছিলনা, সেগুলো তখন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণে তখনকার মত প্রতিষ্ঠিত ছিল, নিজেদের মত করে তারা প্রকৃতির সফল ব্যাখ্যা করেছে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। এসব তারা করতে পেরেছে কারণ সেসব তত্ত্বের কথাগুলো ছিল বাস্তবের কাছাকাছি; ঠিক বাস্তব বলা যাবেনা, তবে বাস্তবের কাছাকাছি। সেরকম একটি তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলো আবিষ্কৃত হবার পর তার বদলে যখন আরো ভাল, আরো সফল একটি নতুন তত্ত্ব আসে তখন নতুন তত্ত্বের কথাগুলো

হয় আগেরটির থেকে বাস্তবের আরো কাছাকাছি। এভাবে নতুনতর তত্ত্বগুলো বাস্তবের আরো কাছে যায়, কিন্তু তারপরও এর ওপর উন্নয়নের সুযোগ থাকে বলে কোনটিকেই হুবহু বাস্তব বলা যায়না। তাতে কোন ক্ষতি নেই, কারণ বিজ্ঞান জিনিসটিই এমন; এটি কখনো ষোল আনা সত্য হবার দাবী করেনা, ক্রমাগত নিজের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রত্যেকবার আরো কাছে গিয়ে সত্যের খুবই কাছাকাছি যেতে পারলেই এটি খুশি। বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞান এই অর্থেই বাস্তব, বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলো এই অর্থেই বাস্তব; এদেরকে বিজ্ঞান পরম সত্য বলে দাবী করেনা। এই আসন্ন বাস্তবতার বলে বলীয়ান হয়েই বিজ্ঞান প্রকৃতিকে জয় করছে; সীমিত সফল তত্ত্ব নিয়ে আগেও জয় করেছে, নতুন নতুন তত্ত্ব ক্রমাগত বেশি বেশি জয় করছে। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া— ক্রমাগত সত্যের আরো কাছে যাওয়া।

এর একটি চমৎকার উদাহরণ হলো প্রায় তিন শ' বছর দুর্দান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে অভূতপূর্ব ভাবে সফল হবার পর নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বকে বদলে দিয়েছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব। পরেরটি আগেরটির কিছু মৌলিক ভুল এড়িয়ে গেছে যেমন মহাকর্ষ দূর থেকে তাৎক্ষণিক কার্যকর হয় এমন মনে করার ভুল। পরেরটি অনেক বেশি উন্নত তত্ত্ব, এবং অনেক বেশি সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য, যেমন আলোর ক্ষেত্রেও— নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বে আলো ভরের দ্বারা আকৃষ্ট হবার কথা ছিলনা। কিন্তু ভর যদি অত্যন্ত বড় না হয় তা হলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব যা যা করতে পারে, নিউটনের তত্ত্ব তার সবই একই রকম নিখুঁত ভাবে করতে পারে। স্পষ্টত সেটি আইনস্টাইনের উন্নততর তত্ত্বের একটি আসন্ন রূপ। নিউটনের তত্ত্বের কথাগুলোর যথেষ্ট বাস্তবতা ছিল। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্ব যে বাস্তবতার আরো বেশি কাছাকাছি তা গত এক শ' বছর ধরে অনেক এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের কাছে নিউটনের ভরের সেই আকর্ষণ ক্ষমতার পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিস প্রকৃতির বাস্তবতার যথেষ্ট কাছাকাছি। আইনস্টাইনের তত্ত্বে থাকা ভরের কারণে স্থান-কালের বিকৃতিটি প্রকৃতির বাস্তবতার আরো কাছাকাছি। প্রথম বাস্তবতার সঙ্গে দ্বিতীয় বাস্তবতার সরাসরি কোন সংঘাত নেই, প্রথমটি দ্বিতীয়টির আসন্ন রূপ মাত্র। অন্তত আধুনিক বিজ্ঞানে বেশিরভাগ তত্ত্বের পরিবর্তনকে এভাবেই দেখা যায়, সেসব তত্ত্বের বাস্তবতাকেও।

অবশ্য আরো পিছিয়ে গেলে বেশ কিছু তত্ত্ব আমরা পাব যেগুলো একেবারেই পরিত্যক্ত হয়েছে, আসন্ন রূপ হিসেবেও এদেরকে বিবেচনা করার উপায় নেই। যেমন টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে আধুনিক সূর্য-কেন্দ্রিক সৌরজগতের তত্ত্বের আসন্ন রূপ বলার কোন উপায় নেই। স্বীকার করতেই হবে টলেমির তত্ত্ব একেবারে ভুলই ছিল, এর স্বচ্ছ স্বর্গীয় গোলক, এপিসাইকেল ইত্যাদিকে তখন বাস্তব সত্য মনে হলেও তা আসলে ছিল

কষ্টকল্পনা। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে আমরা এর বিস্তারিত দেখেছি। কিন্তু চোখে দেখা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এর অনেক কিছু রচিত ছিল বলে, এবং আপেক্ষিক ভাবে তাকালে ওই তত্ত্বে বর্ণিত গতিবিধিগুলো আধুনিক সত্যি তত্ত্বের মত একই ফলাফল দেয় বলে ভুল হয়েও, অবাস্তব হয়েও, টলেমির তত্ত্ব তখনকার মত যথেষ্ট সফল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতো। সে জন্য ওটি হাজার বছর ধরে খুব কাজে এসেছিল একথা ঠিক। কিন্তু সে তত্ত্বের কথাগুলোর বাস্তব সত্যতা ছিলনা, তার জায়গায় আসা বিশ্বের আধুনিক তত্ত্ব অন্তত আসন্ন অর্থে সত্যের কাছাকাছি একথা আমরা বলছি কী ভাবে? এটি বলতে পারার কারণ হলো কোপারনিকাসের সময় থেকে আমরা দেখেছি পুরানো ওই তত্ত্ব প্রকৃতির অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারতোনা যা আধুনিক তত্ত্ব করতে পারে। এরকম প্রায় সব ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারে বলেই আধুনিক তত্ত্বটি সত্যের খুব কাছাকাছি।

বিজ্ঞানের বাস্তবতার বিরোধী দৃশ্যবাদীরা:

বিজ্ঞানকে সফল ও বিশ্বাসযোগ্য করতে একেবারে প্রাচীনকাল থেকে অবদান রেখেছে 'এম্‌পিরিসিজম' নামে পরিচিত মতবাদ, যাকে আমরা সাদামাটা কথায় দৃশ্যবাদ বলতে পারি। এর মানে শুধু ভেবে সিদ্ধান্ত নিলে বিজ্ঞানীর চলেনা, তাঁকে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্লেটোর আইডিয়ালিজমের সঙ্গে তাঁর ছাত্র এরিস্টোটল এই এমপিরিসিজমকে যোগ করেছিলেন। এই দেখার ব্যাপারটি এরিস্টোটলের সময় নেহাৎ চোখে দেখার ব্যাপার থাকলেও বিজ্ঞানের কাছে এই দেখাটি অনেক দূর এগিয়ে গেছে— যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখা, এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ইত্যাদিও তাতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিরোধীদের অনেকে তাঁদের বিরোধিতার যুক্তি হিসেবে এই দেখাকে আবার সরাসরি চোখের দেখার অপরিহার্যতায় নিয়ে গেছেন। এটি করতে গিয়ে বিজ্ঞানের লক্ষ্যকেই তাঁরা নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে বিজ্ঞানের লক্ষ্য প্রকৃতির মধ্যে থাকা পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলোকে উদ্ঘাটন করা নয়, কারণ প্রকৃত অর্থে তা সম্ভব নয়। বরং বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো প্রকৃতির এক একটি দিক নিয়ে আমাদের কাছে 'সরাসরি যথেষ্ট পরিমাণে দেখাতে পারে' এমন তত্ত্ব দেয়া। কাজেই দেখা যায়না এমন জিনিস প্রস্তাব করে সেগুলোর সত্যতা যাচাইটি বিজ্ঞানের কাজ নয়, বরং দেখা যায় এরকম জিনিসের সত্যতাগুলো সর্বাংশে আবিষ্কারের চেষ্টাই তার কাজ। দেখা জিনিসকে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলোকে বিজ্ঞানের কেন্দ্রে স্থাপনের কারণে এই মতবাদকে বলা হয় গঠণমূলক দৃশ্যবাদ (কনস্ট্রাকটিভ এমপিরিসিজম)। আপাতত আমরা এর অনুসারীদেরকে শুধু দৃশ্যবাদীই বলবো। দৃশ্যবাদীরা এই যে বলেন যে 'যথেষ্ট পরিমাণে দেখাতে পারা'— এ

কথাটির মানে কী? এটি বলতে চায় প্রকৃতির মধ্যে দেখার মত যা আছে তার থেকেই প্রকৃতির ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারা— যেই ব্যাখ্যার মধ্যে সুসঙ্গতি থাকবে। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী অবশ্য পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য কোন কোন জিনিসের অবতারণা করতে পারেন— সেটি তাঁর ব্যাখ্যার ভঙ্গির ব্যাপার— সত্যিকার প্রকৃতিতে সেগুলো থাকার যো নেই, কারণ সেগুলো দেখার জিনিসের অন্তর্গত নয়। ওই দেখার জিনিসকে আদ্যোপান্ত উদ্ঘাটনের কারণেই বিজ্ঞানের তত্ত্ব সফল হয়।

দৃশ্যবাদীরা দেখার জিনিসকেই বিজ্ঞানের সর্বস্ব মনে করলেও বিজ্ঞানীরা তা মনে করেননা; বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের অধিকাংশের কাছে এরকম নীতি অচল। তারপরও দৃশ্যবাদীরা এতো বিশুদ্ধভাবে তাঁদের নীতিতে অবিচল থাকতে চান যে যন্ত্রের ভেতর দিয়ে দেখাকেও তাঁরা দেখা বলে স্বীকৃতি দেননা— সব কছু খালি চোখে হতে হবে, সরাসরি হতে হবে— শুধু তা হলেই ওগুলোকে সত্যিকার বাস্তব বলা যাবে, নইলে নয়। উদাহরণ স্বরূপ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মধ্য দিয়ে ভাইরাস দেখা গেলেও তাঁরা ওখানে দেখা ইমেজকে ভাইরাস দেখা বলে স্বীকার করেন না, বরং যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ইমেজ সৃষ্টির সুযোগ নিয়ে ভাইরাল ঘটনা সমূহের ব্যাখ্যার একটি ভঙ্গি মনে করেন- অন্য পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসের অবতারণার মত। কাজেই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা ভাইরাসের কারণে ভাইরাসের বাস্তব অস্থিত্ব মানতে হবে একথা দৃশ্যবাদীরা স্বীকার করেননা। ভাইরাসকে নিয়ে ভাইরাল রোগ, তার টিকা ইত্যাদি সম্পর্কে যে তত্ত্ব রয়েছে তাতেও ভাইরাস নামক অণুজীবকে যে সত্যই থাকতে হবে একথাও তাঁরা স্বীকার করেননা। এর মানে অবশ্য এই নয় যে ভাইরাল রোগ নিয়ন্ত্রণে এই তত্ত্বের যে কৃতিত্ত্ব তা তাঁরা মানেন্না। তাঁদের আপত্তি বিজ্ঞানকে নিয়ে নয়, পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলোর বাস্তবতা নিয়েই তাঁদের যত আপত্তি।

এ আপত্তি যে বিজ্ঞানীদের কাছে ধোপে টেকেনা তা বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞানী যখন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ভাইরাসের ইমেজ দেখেন তখন তিনি নিশ্চিত জানেন যে তিনি ভাইরাসই দেখছেন, অন্য কিছু নয়। কারণ ভাইরাসের গা থেকে ঠিকরে, বিদ্যুৎ-চৌম্বক ইলেকট্রন লেন্সের মধ্যে ফোকাস হয়ে, কীভাবে এই ইমেজ তৈরি হয়েছে এবং আলোতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের চোখে এসেছে তার আদ্যোপান্ত বিজ্ঞানীদের জানা— কারণ সেই ব্যবস্থাটিও তাঁরাই করেছেন। আরো বড় কথা এই ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যখন দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন যন্ত্রের মধ্য দিয়ে একই জিনিসের হুবহু একই ইমেজ দেখা যায়, আর দুই যন্ত্রে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতির মাধ্যমে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় কেন যার যার ক্ষেত্রে এই একই ইমেজ সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ রক্তের প্লেটলেট অতি ক্ষুদ্র জিনিস হওয়াতে তা খালি চোখে দেখা অসম্ভব। কিন্তু খুব

শক্তিশালী সাধারণ আলোক-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে তা দেখা যায়। আবার ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়েও এই প্লেটলেটকে দেখা যায়— উভয় ক্ষেত্রে হুবহু একই চেহারার প্লেটলেট। অথচ আলোক অণুবীক্ষণ এবং এই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের কাজের বৈজ্ঞানিক নীতি একেবারেই আলাদা। একটির ইমেজকে দৃষ্টি বিভ্রম বলে ধরে নিলে হুবহু একই দৃষ্টি বিভ্রম অন্যটির ক্ষেত্রে হওয়ার কার্যত কোন সম্ভাবনা নেই। উভয় ক্ষেত্রে আমরা সত্যি সত্যি রক্তের প্লেটলেটকেই দেখছি, রক্তের মধ্যে যার অস্তিত্ব একেবারেই বাস্তব। বিজ্ঞানী কখনো এই প্লেটলেটকে দৃশ্যবাদীদের কথিত 'ব্যাখ্যার ভঙ্গি' মনে করবেন না। আগে আমরা বিজ্ঞানের বাস্তবতা বিরোধীদেরকে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলোকে বিজ্ঞানের তত্ত্বের এক একটি কৌশল হিসেবে মনে করতে দেখেছি। দৃশ্যবাদীরা একে ব্যাখ্যার ভঙ্গি মনে করছেন। উভয়ের মধ্যে তফাৎ সামান্যই। তাঁদের কেউই এগুলোকে সত্য বলতে নারাজ।

বিজ্ঞানীদের কাজের এই ভিন্নতর যে বর্ণনা দৃশ্যবাদীরা দেন তা আরো ভাল বোঝা যাবে একটি এক্সপেরিমেন্টের উদাহরণ নিয়ে ওটি সম্বন্ধে দৃশ্যবাদীদের মনোভঙ্গিটি দেখলে। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে মার্কিন পদার্থবিদ মিলিক্যান 'তেলের ফোঁটা এক্সপেরিমেন্ট' নামের একটি সহজ সরল কিন্তু চমকপ্রদ এক্সপেরিমেন্ট করে ইলেকট্রনের চার্জ নির্ণয় করেছিলেন— যা কিনা ক্ষুদ্রতম ঋণাত্মক ইলেকট্রিক চার্জ বলে ইতোমধ্যে স্বীকৃত ছিল। এক্সপেরিমেন্টটির পাত্রের কাচের ভেতর দিয়ে দৃশ্যমান এর ভেতরের মাঝে খালি জায়গায় অনেকগুলো ক্ষুদ্র তেলের ফোঁটা ভাসমান রাখা হয়েছিল। এদের এক একটায় ইতস্তত বিভিন্ন পরিমাণ ঋণাত্মক স্থৈতিক বিদ্যুৎ দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তেলের ফোঁটাগুলো পাত্রের ওপরের দিকে থাকা একটি ধনাত্মক প্লেটের সৃষ্টি করা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মধ্যে ছিল বলে ওপরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল আবার নিজেদের ভারের কারণে নিচের দিকে পড়ছিলো। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে এক একটি ফোঁটাকে মাঝখানে স্থির রাখতে ওপরের প্লেটের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রটিকে কত জোরালো করতে হচ্ছে তার পরিমাণ থেকে বিভিন্ন ফোঁটায় থাকা বৈদ্যুতিক চার্জ বেশ সূক্ষ্মভাবেই মাপা সম্ভব হলো। এই সব চার্জের মধ্যে যেই ক্ষুদ্রতম গুণিতক সেটিকেই হতে হবে চার্জের ক্ষুদ্রতম একক অর্থাৎ ইলেকট্রনের চার্জ। এভাবে মিলিক্যান ইলেকট্রনের চার্জ যথেষ্ট নিখুঁতভাবেই নির্ণয় করেছিলেন।

মিলিক্যান নিজে বা অন্য বিজ্ঞানীরা এই এক্সপেরিমেন্টকে যেভাবেই দেখুননা কেন গঠনমূলক দৃশ্যবাদীরা একে দেখেছেন তাঁদের মতবাদের রঙে রাঙিয়ে। তাঁদের মতে মিলিক্যান এক্সপেরিমেন্টেটির মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য ইলেকট্রনকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছিলেন না, বরং তাঁর পরীক্ষা ছিল

পর্যবেক্ষণ-যোগ্য তেলের ফোঁটা নিয়ে — যার থেকে তিনি তাঁর তত্ত্বের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পরিমাপ করছিলেন, এবং কিছু সংখ্যাবাচক মান পেতে চাচ্ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল এর থেকে দেখা যাওয়া জিনিসগুলোকে 'যথেষ্ট দেখা'— সেটি করতে গিয়ে যদি ইলেকট্রনের কথা বলাও হয়, সেটিকে বাস্তব জিনিস মনে করা নিষ্প্রয়োজন।

দৃশ্যবাদীরা এভাবে বিজ্ঞানীদের সাধারণ মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বিজ্ঞানকে ভিন্ন ভাবে দেখছেন কেন, কেনই বা তাঁরা বিজ্ঞানের বাস্তবতাকে অস্বীকার করছেন? এর মূল কারণ হলো তাঁরা প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসকে উদ্ঘাটন করাটিকে অসম্ভব কাজ মনে করেন; এবং এগুলোকে উদ্ঘাটনের মত অসম্ভব দায়িত্ব বহনে বিজ্ঞান অসমর্থ বলে মনে করেন। একই সঙ্গে তাঁরা এও মনে করেন যে বিজ্ঞান যদি প্রকৃতি থেকে যথেষ্ট জিনিস সরাসরি দেখার ব্যবস্থা করে দেয়, এবং সেগুলোর সব পরিমাপ করতে পারে, তা হলেই বিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে এমনিতেই প্রকৃতির যথেষ্ট ব্যাখ্যা আসে। এটিও কম কথা নয়। তাঁদের মতে বিজ্ঞানের সব সাফল্য এভাবেই এসেছে।

স্বাভাবিক ভাবেই দৃশ্যবাদীদের এসব যুক্তিতে যে সব অসঙ্গতি রয়েছে তা বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাসীরা ধরিয়ে দেন। তাঁরা দৃশ্যবাদীদের সব চেয়ে দুর্বল যুক্তি মনে করেন বিজ্ঞানের সাফল্যের কারণ দেখাতে গিয়ে তাঁরা যা বলেন সে কথাকে। বিজ্ঞান সত্য তত্ত্ব দেবার কারণে সফল হয়নি, যুৎসই ভঙ্গিতে প্রকৃতির দেখা ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে পারার কারণে সফল হয়েছে— এটিই দৃশ্যবাদীদের কথা। অথচ সবাই জানে প্রকৃতির কোন ঘটনা সম্পর্কে যতগুলো সম্ভাব্য তত্ত্ব হতে পারে বিজ্ঞান তার মধ্য থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সব চেয়ে ভাল তত্ত্বটিকেই সঠিক মনে করে। ওই সাক্ষ্য-প্রমাণের যুক্তির মধ্যেই থাকে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসগুলো— দৃশ্যবাদীরা যার কোন বৈধতাই স্বীকার করেনা। সমস্যা হলো শুধু ব্যাখ্যার ভঙ্গির কারণে এবং দেখা জিনিসগুলোর থেকে যথেষ্ট তথ্য বের করতে পারার কারণে বিজ্ঞানের তত্ত্ব যা বলে তা সত্য না হয়েও সত্যি সত্যি কেমন করে ফলে যায় তার কোন বোধগম্য প্রক্রিয়া দৃশ্যবাদীরা দেখাতে পারেননা। কাজেই তাঁদের কথার মারপেঁচের মধ্যে তাঁরা যা বলছেন তার শুধু একটিই অর্থ হতে পারে— বিজ্ঞান অলৌকিক ভাবেই সফল হয়ে থাকে। দৃশ্যবাদীরা যতই বলুক যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিজের ব্যাখ্যার ভঙ্গির কারণেই সফল হয়, তাঁরা আসলে বিজ্ঞানকে অলৌকিক বলে প্রতিপন্ন করছেন।

দৃশ্যবাদীদের অন্য একটি অদ্ভুত নীতি হলো শুধু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে কিছু দেখাকেও দেখা না বলে তাকেও পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য বলে মনে করা। একটি উদাহরণ নিলে এই ক্ষেত্রেও তাঁদের যুক্তির দুর্বলতাটি বোঝা যাবে। পুকুরের পাড়ের একটি গাছের প্রতিফলন যদি পুকুরের পানিতে পড়ে

পানিতে ইমেজকে দৃশ্যবাদীরা বাস্তব জিনিসের ইমেজ মনে করেন, কারণ পাড়ের মূল গাছটিকেও তাঁরা আলাদা ভাবে দেখতে পান। তাঁদের কাছে গাছ ও পানিতে তার প্রতিফলন উভয়ে তাই পর্যবেক্ষণ-যোগ্য। কিন্তু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা ভাইরাসের ইমেজকে তাঁরা পর্যবেক্ষণ-যোগ্য জিনিস বলে মনে করেন না এই যুক্তিতে যে তার পাশাপাশি মূল ভাইরাসকে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাসীরা বলেন এই দুটি উদাহরণের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নেই। পানিতে গাছের প্রতিফলনকে সত্য মনে করার কারণ হলো মূল গাছ, এই প্রতিফলন এবং দর্শকের চোখ এইগুলোর মধ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক ধরে নিতে পারা (বিজ্ঞানের ভাষায় প্রতিফলনের নিয়ম)। ঠিক এরকমেরই যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক ভাইরাস রাখা কাচের প্লেট ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ভাইরাসের ইমেজ, ও দর্শকের চোখের মধ্যে রয়েছে। তাহলে গাছের ইমেজ সত্য, ভাইরাসের ইমেজ সত্য নয় এ কথা বলার সুযোগ কোথায়— এক যাত্রায় দুই ফল হবে কেন? বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাসীরা এভাবে দেখাবার চেষ্টা করেন যে দৃশ্যবাদীদের সব কথার মধ্যে এক যাত্রায় দুই ফলের ব্যাপারটি রয়ে গেছে। যখনই খালি চোখে সরাসরি দেখার যোগ্য কিংবা দেখার অযোগ্য কিনা প্রশ্ন ওঠে সেই ক্ষেত্রে তাঁদের বিচারটি কিন্তু খুবই কড়া— একটুও যদি পরোক্ষভাবে দেখতে হয় তাহলে তাকে তাঁরা দেখার যোগ্য বলতে নারাজ। অন্যদিকে সরাসরি দেখার যোগ্য এবং সরাসরি দেখা গেছে এই দুইয়ের মধ্যে তফাত করার ব্যাপারে তাঁরা খুবই অসাবধান। তাই তাঁদের কাছে অণুবীক্ষণে দেখা জিনিস আসল জিনিস নয়। কিন্তু আকাশে খালি চোখে আলোর যে ফুট্‌কিটি দেখা যায় তাকে বিশাল জ্যোতিষ্ক (তারা) হিসেবে গ্রহণ করতে তাঁদের কোন অসুবিধা হয়না। এক্ষেত্রে তাঁদের ঢিলেঢালা যুক্তি হলো যেদিন মানুষ তারার কাছে যেতে পারবে তখন ঠিকই দেখবে যে এটি আলোর ফুটকি মাত্র নয়, বিশাল জ্যোতিষ্ক। সত্যি সত্যি কেউ ওভাবে কাছে না গেলেও, কোনদিন যেতে পারবে কিনা তা না জানলেও, খালি চোখে দেখা ফুট্‌কিটিকে প্রকাণ্ড তারার বাস্তবতা দিতে তাঁরা খুব উদার। নইলে তো জ্যোতির্বিদ্যার পুরো বিজ্ঞানটাকেই তাঁদের অস্বীকার করতে হতো। আসলে সরাসরি দেখার সত্যতা সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব রয়েছে বলেই তাঁদের এই দুই রকম বিচার।

তত্ত্ব যায়, তত্ত্ব আসে, কিন্তু কাঠামো ঠিক থাকে:

এ পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি তাতে বিজ্ঞানের বাস্তবতায় সন্দেহবাদীদের বিপক্ষে সবচেয়ে মোক্ষম সমালোচনা হলো এটি কার্যত বিজ্ঞানের সাফল্যকে অলৌকিক ব্যাপারে পরিণত করে। আর বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাসীদের বিপক্ষে সবচেয়ে মোক্ষম সমালোচনা হলো আগের অনেক তত্ত্ব যেমন বদলে গেছে, তেমনি

ভবিষ্যতে বর্তমানের তত্ত্বগুলোও বদলে যেতে পারে। যে তত্ত্ব বদলে গেছে এবং যেতে পারে, সেগুলোকে প্রকৃতির বাস্তব সত্য কী ভাবে বলা যায়? এই দুই সমালোচনার উভয়কে যদি গুরুত্ব সহকারে নেয়া হয় তা হলে বিজ্ঞানের বাস্তবতায় অবিশ্বাসও করা যায়না, আবার হুবহু বিশ্বাসও করা যায়না।

এই অবস্থার নিরসণের চেষ্টা করেছেন এই বিষয়ের অন্য রকম কিছু ভাবনা। এতে বিজ্ঞানের বাস্তবতা কাকে বলা হবে সেই সংজ্ঞাটিকেই একটু ভিন্ন ভাবে নেয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের তত্ত্বে একটি পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসকে যে ভাবে প্রকাশ করা হয় তাকে সমস্ত খোল্-নলচে সহ প্রকৃতিতে থাকা একটি সুনির্দিষ্ট অটল বাস্তব জিনিস হিসেবে দেখার চিন্তা এতে বাদ দেয়া হয়েছে। আমাদের সামনের একটি টেবিল কিংবা একটি চেয়ারকে যে রকম সুনির্দিষ্ট জিনিস হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসকে সে ভাবে নেয়া উচিত হবেনা বলেই এটি মনে করে। বরং এসবের যে দিকগুলোকে বাস্তব মনে করা সঙ্গত তা হলো এদের মৌলিক কাঠামোগুলো— একটি পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসের কিছু অপরিহার্য গুণে গড়া কাঠামো। পুরো একটি তত্ত্বেরও সব বাহুল্যগুলো বাদ দিয়ে শুধু ওই রকম কাঠামোটির বাস্তবতাই প্রত্যাশা করা উচিত। এজন্য এ ধরণের মতবাদকে বলা হয় কাঠামোগত বাস্তবতার মতবাদ (স্ট্রাকচারাল রিয়ালিজম)। সচরাচর ভাবে বাস্তব অস্থিত্ব বলতে আমরা যা বুঝি তার বদলে এ মতবাদে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শুধু কাঠামোটিরই ওরকম অস্থিত্ব আছে ধরে নিতে হয়।

এর মধ্যে বিশেষভাবে দেখার ব্যাপারটি হলো এই কাঠামো বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছে। একটি উপমা দিলে বোঝার চেষ্টাটি সহজ হবে। আমরা এমন একটি বাড়ির কথা চিন্তা করতে পারি যে বাড়ি কিছুদিন পরপর হাত বদল হয়েছে এবং প্রত্যেকবার নতুন মালিক এসে বাড়িটিকে শুধু নিজের মত করে সাজায় না, শুধু তার ফিনিশিংটি বদলায়না, বরং একে ভেঙ্গেচুরে বদলিয়ে ফেলে। এতসবের মধ্যে প্রত্যেক হস্তান্তরে বজায় থাকে শুধু বাড়ির কাঠামোটি। কাঠামোটি এতই মৌলিক যে এটিকে পরিবর্তন করা যায়না, করলে বাড়িটির কোন বৈশিষ্ট অবশিষ্ট থাকবেনা। ধরা যাক আমরা বাড়িটির সম্পর্কে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়েছি— কিন্তু এটি কিছুদিন পর পর এমন ভাবে বদলানোর সাক্ষ্য-প্রমাণ যে আদৌ কোন বাড়ি ছিল বা আছে কিনা সিদ্ধান্ত নেয়া মুশকিল। আমরা যদি বাড়ির সকল বিস্তারিত অংশ, এর সকল অলঙ্করণ ও ফিনিশিং, এর সকল আসবাব সহ বাড়িটির অস্থিত্ব প্রমাণ করতে চাই তা হলে সমস্যায় পড়বো— কারণ নানা সময়ের নানা রকম বাড়ির সাক্ষ্য আমাদেরকে বিভ্রান্ত করবে। কিন্তু যদি শুধু বাড়িটির মূল কাঠামোটির অস্থিত্ব প্রমাণ করতে চাই, কোন বিভ্রান্তি হবেনা; কারণ বহিরঙ্গে যত পরিবর্তন হোক না কেন সব সময়েই একই কাঠামোর সাক্ষ্য আমরা পেয়েছি। কাজেই খুটিনাটিতে সমৃদ্ধ পুরো

একটি বাড়ির বাস্তবতা খোঁজার প্রয়াস সেখানে ক্রমাগত পরিবর্তনের কারণে ব্যর্থ হতে বাধ্য; উচিত কাজ হবে সকল হস্তান্তরে অপরিবর্তিত থাকা কাঠামোটির বাস্তবতাকেই শুধু মেনে নেয়া।

বিজ্ঞানের হুবহু বাস্তবতার বদলে কাঠামোগত বাস্তবতার মতবাদটিকে প্রস্তাব করার প্রধান কারণ হলো বিজ্ঞানের তত্ত্ব বদলে যাওয়া সত্ত্বেও এর বাস্তবতার বিশ্বাস করার সমস্যাটি। এ সমস্যার সমাধানে বাস্তবতায় বিশ্বাসীরা ক্রমাগত বাস্তবতার আরো বেশি কাছে যাওয়ার কথা বল্‌লেও প্রশ্ন ওঠে এই কাছে যাওয়ার মানে কী। একটি ট্রেন গন্তব্যের কত কাছে গেল তা যেভাবে মাপা যায়, একটি তত্ত্ব সত্যের কত কাছে গেল তা সেভাবে মাপার উপায় কী? তাছাড়া ক্রমাগত সত্যের আরো কাছে যেতে হলে এবং আগের তত্ত্বেও সত্যের কাছে যাবার মত কিছু যদি থেকে থাকে, তাহলে এক তত্ত্ব থেকে অন্য তত্ত্বে যাবার সময় সত্যের কাছের কিছু অংশ নতুন তত্ত্বে স্থানান্তরিত হতে হবে সত্যের থেকে দূরে না গিয়েই। সেই অংশটি কী? এসব প্রশ্নের ভাল উত্তর বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাসীদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছিলনা এমন ধারণা কাঠামোগত বাস্তবতার অনুসারীদের। সেই উত্তর নিজেদের মতবাদে দিতে গিয়েই তাঁরা বলেছেন তত্ত্ব যায়, তত্ত্ব আসে, কিন্তু তার মধ্যে যে অংশটি আগের তত্ত্ব থেকে পরের তত্ত্বে হস্তান্তরিত হয় সেটি হলো তত্ত্বের কাঠামোটি (আমাদের উপমায় বাড়ির কাঠামোর মত)। এই কাঠামোটিই বাস্তবের কাছাকাছি এবং পরবর্তী তত্ত্বে এটিই বাস্তবের আরো কাছাকাছি যায়। তাঁদের মতে ধারাবাহিক ভাবে বিজ্ঞানকে সত্যের ক্রমাগত কাছে নিয়ে যাচ্ছে শুধু এই কাঠামো। এতে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিস হিসেবে বিজ্ঞানী যত সব আসবাব বা খোল্‌নলচের আয়োজন করেছেন সেগুলোকে হুবহু বাস্তব এমনটি প্রমাণের গুরুভার তাঁকে বহন করতে হয়না। শুধু সেগুলোর কাঠামোটিই প্রকৃতিতে বাস্তব— সেটিই বড় কথা, এবং সেটিই বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতায় স্পষ্ট। অন্যদিকে এই তত্ত্ব যে প্রকৃতি সম্পর্কে সব রকমের সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে তাকে অলৌকিক মনে হবার কোন কারণ আর ঘটনা— কারণ তত্ত্বের ভেতরে রয়ে গেছে সেই অবিচল কাঠামো যা প্রকৃতির মধ্যেই বাস্তব ভাবে রয়েছে। বিজ্ঞান সেটিকে আবিষ্কার করেছে বলেই বিজ্ঞান সফল।

কিন্তু মূল প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া গেলোনা— ওই কাঠামোটি কী। কাঠামোগত বাস্তবতার অনুসারীরা বলেন তত্ত্বের মধ্যে বহুরকম 'জিনিসের' কথা বলা হয়— শেষ পর্যন্ত যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু সেই সব জিনিসের মধ্যে যে 'সম্পর্কগুলো' তারাই তত্ত্বের কাঠামো গড়ে তোলে— তারাই গুরুত্বপূর্ণ। এটি বল্‌লে স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে তত্ত্বের গাণিতিক কাঠামোর কথা, অর্থাৎ এর সমীকরণগুলোর কথা। কাঠামোগত বাস্তবতার অনুসারীরাও তাই মনে করেন, সমীকরণগুলোই কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ— এরাই তত্ত্বের

ভেতর সব জিনিসের সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেয়। তাঁরা দেখতে চান যে তত্ত্ব যখন বদলে যায় তখনো এই সমীকরণগুলোর মৌলিক দিকগুলো বজায় থাকে, কারণ এরা বাস্তবিক সত্যের কাছাকাছি। সেই কারণেই তত্ত্ব বদল হয়ে যখন তার সব খোল্‌নলচে বদলে যায় তখনো আগের তত্ত্বটিকে এই নতুন তত্ত্বের একটি আসন্ন রূপ হিসেবে দেখানো যায় এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খুব সফলভাবে প্রয়োগও করা যায়। এভাবে আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বের সমীকরণগুলো আগেকার নিউটনের সমীকরণে পর্যবেশিত করা যায় কম ভর সম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে, এবং তা এখনো চমৎকার কাজ করে। বিজ্ঞানের বাস্তব কাঠামোটি ধারণ করছে বলেই খোল্‌নলচে পাল্‌টে যাবার পরও তত্ত্বের মধ্যে এই ধারাবাহিকতাটি বজায় থাকছে। আগের এক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে নিউটনীয় চিরায়ত যে গতিবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়ে যখন আজকের কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা এসেছে উভয়ের ধারণাতে আকাশ পাতাল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগের চিরায়ত গতিবিদ্যার গাণিতিক কাঠামোর সঙ্গে বর্তমান কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার গাণিতিক কাঠামোর আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে। বড় তফাত শুধু একটি জায়গাতেই আগেরটিতে গুণ করাটি ছিল কম্যুটেটিভ অর্থাৎ $a \times b$ এবং $b \times a$ এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে এটি নন্‌-কম্যুটেটিভ অর্থাৎ a ও b এর ক্রমের পরিবর্তনে ফলাফলে পার্থক্য ঘটে। চিরায়ত ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের কাঠামোতে এই শুধু অমিল। আগের ও পরের তত্ত্বের মধ্যে কাঠামোর ধারাবাহিকতা এখানেও লক্ষ্য করা যায়।

সব সময় কাঠামোকে যে গাণিতিক কাঠামো হতে হবে এমনো কোন কথা নেই। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্বের মূল কাঠামোটি খুব স্পষ্ট। এখানে দৈবক্রমে ইতস্তত মিউটেশনের (পরিবর্তন) ফলে বৈশিষ্টের যে বৈচিত্র কোন জীবদলের মধ্যে সৃষ্টি হয় বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় সুবিধা পাওয়ার মাধ্যমে তার কোন একটি প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হয়, অর্থাৎ বেশি টিকে থাকে। ফলে বংশানুক্রমে সেই বৈশিষ্টই ওই প্রজাতির মধ্যে বেড়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ ইতস্তত দৈব বৈচিত্রের ফলে সবুজ প্রজাপতিদের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙের অল্প কিছু প্রজাপতির জন্ম হয়। সাধারণত গাছপালার সবুজের পটভূমিতে এদের পক্ষে প্রজাপতি খেকো পাখিদের দৃষ্টি এড়িয়ে টিকে থাকতে অসুবিধাজনক বলে এগুলো আর বাড়েনা। কিন্তু দূষণের ফলে কালো হয়ে গেছে এমন বনে দৈবাৎ কালো রঙের জন্ম নেয়া প্রজাপতিগুলো টিকে থাকার বিশেষ সুবিধা পেয়ে যায় শিকারি পাখি তাদেরকে দেখতে পায়না বলে। কালো রঙের প্রজাপতিদের সন্তানরা কালো হবার সম্ভাবনা বেশি বলে বেশি টিকে থাকা এই প্রজাপতিদের কালো বংশধররা বংশানুক্রমে সংখ্যায় ক্রমাগত বেশি হবে- অর্থাৎ কালো রঙটি প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হবে। এই তত্ত্বের মধ্যে কাঠামোটি হলো দৈব পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন। তত্ত্বের মধ্যে

অবশ্য বংশগতির (হেরিডিটি) একটি ভূমিকা আছে— ওই যে কালো প্রজাপতির সন্তানেরও কালো হবার প্রক্রিয়াটি। ডারউইন এর জন্য বংশগতির যে পদ্ধতিটিকে ঠিক মনে করতেন সেটি ছিল সম্পূর্ণ ভুল। পরে মেন্ডেলের নিয়ম, ডিএনএ আবিষ্কার ইত্যাদি থেকে শুদ্ধ প্রক্রিয়াটি এখন বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ভুল বংশগতি প্রক্রিয়া ওর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ডারউইনের তত্ত্ব তখনো বাস্তবের খুব কাছাকাছি ছিল কারণ বংশগতিটি কোন্ প্রক্রিয়ায় হচ্ছে তা মূল তত্ত্বের জন্য খুব জরুরি ছিলনা, অর্থাৎ এর কাঠামোর অংশ ছিলনা। কাঠামোটিই ছিল বাস্তবের কাছাকাছি। ডিএনএ'র মাধ্যমে বংশগতির সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়াতে তত্ত্ব আরো মজবুত হয়েছে, কিন্তু কাঠামোর ধারাবাহিকতাটি আগের মতই আছে।

বোঝাই যাচ্ছে যে কাঠামোগত বাস্তবতা হলো বাস্তবতায় বিশ্বাসী আর বাস্তবতা বিরোধী এই দুইয়ের মধ্যে একটি আপোষ প্রস্তাব। এটি শুধু কাঠামোর বাস্তবতার কথা বলে, পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য পুরো জিনিসগুলোর বাস্তবতার কথা নয়। এ এক ধরণের 'নরম' বাস্তবতা, বিজ্ঞানীরা তাঁদের তত্ত্বের সব জিনিসের যে রকম 'শক্ত' বাস্তবতা দাবী করেন সে রকম নয়। বিজ্ঞানীরা অবশ্য তাঁদের ইলেকট্রনকে পুরাপুরিই বাস্তব মনে করেন বলেই কাজ করতে পারেন, ইলেকট্রনের শুধু কাঠামোটিই বাস্তব বলে নয়। আবার যাঁরা বিজ্ঞানের বাস্তবতায় সন্দিহান এটি তাঁদেরকেও খুশি করেনা, বাস্তবতার একটি অন্য রকম বিকল্প ব্যবস্থা হয়েছে বলে। তারপরও উভয় পক্ষকেই তাদের নিজের বড় সমালোচনা থেকে উদ্ধার পাবার একটি রাস্তা তো এটি বাত্‌লিয়ে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো বিজ্ঞানের বাস্তবতাকে এই ভঙ্গিতেই দেখতে হয়— হুবহু বাস্তবতা নয়, কাঠামোগত বাস্তবতা।

বাস্তবতার কারণে বিজ্ঞান মাত্রই ভৌতমুখী

সব বিজ্ঞানের বস্তুবাদী লক্ষ্য:

বিজ্ঞানের বাস্তবতার আলোচনায় আধুনিক বিজ্ঞানের কতগুলো প্রবণতার বিষয় এসে পড়ে; তার মধ্যে একটি হচ্ছে অন্যান্য সব বিজ্ঞানেরও যথাসম্ভব ভৌত-বিজ্ঞানের মত হয়ে ওঠার প্রবণতা। আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু থেকেই যে সব বিজ্ঞানের চর্চা বেশি হয়েছে, বেশি প্রতিভাকে আকৃষ্ট করেছে সেগুলো ভৌত-বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে— অর্থাৎ বস্তু নিয়ে যে বিজ্ঞানের কাজ। জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, আলকেমির যুগ পার হয়ে কেমিস্ট্রি, ভূ-বিদ্যা এসব ভৌত বিজ্ঞানের দিকে বিজ্ঞানীদের একটি পক্ষপাত শুরু থেকেই ছিল। এর একটি বড় কারণ এগুলোর ব্যাখ্যায় অতীন্দ্রিয় কিছুর প্রয়োজন হয়নি; নেহাত বাস্তবিক ভর, গতি, বল ইত্যাদির মাধ্যমেই এদের মধ্যে সুন্দর শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করা গেছে। অতীতে যে স্বর্গীয় জ্যোতিষ্ক, নিজে গতিমান না হয়ে সব গতির উৎস ইত্যাদি ধারণা এসব ক্ষেত্রে সহজেই ত্যাগ করা সম্ভব হয়েছে। আরো পরে এগুলোকে

এটম, ইলেকট্রন, অন্যান্য মৌলিক কণিকা, চারটি মৌলিক বল্ ইত্যাদির মাধ্যমে একবারেই বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এভাবে গড়া হয়েছে প্রথমে পদার্থবিদ্যাকে তারপর কেমিস্ট্রি প্রভৃতি অন্যান্য ভৌতবিজ্ঞানকেও।

এসবের মধ্যে প্রকৃতির বাস্তবতাকে দেখতে পাওয়া অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ, যেভাবে একটি মার্বেল বা একটি খেলার বলকে দেখতে বা অনুভব করতে পারা যায় অনেকটা সেভাবে। পরে যখন বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের চর্চাকেও যথেষ্ট আধুনিক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হলো এখন ওখানে সব ব্যাখ্যা তত সহজ হলোনা। যেমন প্রাণ আছে এমন কিছু নিয়ে জীব- বিজ্ঞান একই রকম বিশ্লেষণের চেষ্টা করলো তাকে শুরুতেই নিরস্ত হতে হলো। দেখা গেলো জীবদেহের খুঁটিনাটি, তাদের আচরণ ইত্যাদির বর্ণনা দেয়া যায়; কিন্তু কেন তার দেহ এখন প্রাণ-চঞ্চল, কেন কিছু পরে তা প্রাণহীন সে কথাকে ভৌতবিজ্ঞানের মত বিশ্লেষণ করা কঠিন। তখন আত্মার কথা আনতে হয়, প্রাণশক্তির কথা আন্‌তে হয়, যাকে বিশ্লেষণ করার উপায়-উপকরণ নিজেদের কাছে আছে বলে তাঁদের মনে হয়নি। কিন্তু তাই বলে তাঁরা তাঁদের স্বভাবজাত প্রবণতাটি হারাননি— যা কিনা একেও ভৌতবিজ্ঞানের চোখে দেখার প্রবণতা। শেষ পর্যন্ত জীববিজ্ঞানের অনেকখানিই যে কেমিস্ট্রি ও পদার্থবিদ্যার নিরিখে চলে এসেছে, আধুনিকতর ডিএনএ-নির্ভর অণু-জীব-বিজ্ঞান যে সেটিকে ভৌত বিজ্ঞানেরও গভীরে নিয়ে গেছে যেখানে কেমিস্ট্রির সংশ্লেষণের মত জীবন রহস্যকেও সংশ্লেষিত করা যায়— এসব ওই ভৌতমুখী প্রবণতারই ফল। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ কাজ আরো কঠিন হয়েছে। এই সেদিনও মনোবিজ্ঞানকে বাইরের আচরণের ভাসা ভাসা বর্ণনার ওপর কিংবা 'অবচেতন মনের' মত রহস্যজনক ধাঁধার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে! কিন্তু এখন মনোবিজ্ঞানও এগোচ্ছে অন্যদিকে— বলা যায় ভৌত-বিজ্ঞানমুখী প্রবণতার দিকে। শেষ পর্যন্ত এটি এখন মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটার রূপে কেমিস্ট্রির আওতাভুক্ত জিনিসের প্রবাহ কিংবা নিউরোন সিগন্যালের অংশ হিসেবে ইলেকট্রনের প্রবাহে পর্যবেশিত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে; সেগুলোকে রাসায়নিক ওষুধ দিয়ে রীতিমত নিয়ন্ত্রণও করা যাচ্ছে। মনোরোগ বা বিষণ্ণতার মত জিনিসকে বিশ্লেষণ করতে এখন রোগীর বাল্যকালের স্মৃতিতে ফেরৎ যাবার মত অনির্ভরযোগ্য পদ্ধতির ওপর নয় বরং ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং এর মত একেবারে কট্টর ভৌত প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের নিউরোন-জালের মধ্যে জ্বলে ওঠা 'আতশ বাজির' ছবি থেকেই বোঝা সম্ভব হচ্ছে ওখানে কেন কী হয়েছে। অন্যদিকে অণুসদৃশ জিনের বংশগত প্রভাব যে সেখানে বিশাল ভূমিকা রাখছে, তাও হাতে নাতে অনেকটাই ভৌত প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে।

এই যে অন্যান্য বিজ্ঞানেরও ভৌতবিজ্ঞানমুখী স্পষ্ট প্রবণতা একে বলা হয় ফিজিক্যালিজম অর্থাৎ ফিজিক্যাল বা ভৌত হবার প্রবণতা। এর কারণ খুঁজতে

গেলে যেটি প্রথমেই মনে হয় তা হলো রহস্যজনক ধাঁধার স্তর থেকে বের হয়ে এসে এমন কিছুর ওপর নিজের তত্ত্বগুলোকে প্রতিষ্ঠা করা যেগুলো পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য হলেও ভৌত বিজ্ঞানের ইলেকট্রন ইত্যাদির মত যার বাস্তব অস্থিত্বে বিশ্বাস করা যায়। পদার্থবিদ্যায় বা কেমিস্ট্রিতে এই বিশ্বাস যেই যুক্তিতে করা যায় এখানেও সেই যুক্তিগুলো প্রয়োগ করতে পারাতেই এটি সম্ভব হচ্ছে। যদিও আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি বাস্তব অস্থিত্বে ওই বিশ্বাসের মধ্যে অনেকের অনাস্থা আছে, তারপরও এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই পদার্থবিদ্যার মত ভৌতবিজ্ঞান এতটা এগিয়েছে, এখন জীববিজ্ঞানও দারুণ এগোচ্ছে, মনোবিজ্ঞানও একই পথে এগোবেনা কেন?

এই যে ভৌতবিজ্ঞানমুখিতা তার কিছু যৌক্তিক কারণও অবশ্য দেখানো যায়। যেমন কার্য-কারণের অপরিহার্যতার কথাটি ধরা যাক্। আমরা নিশ্চিত বল্‌তে পারি যে কোন ঘটনা তা ভৌত হোক, জৈব হোক, মানসিক হোক- বা অন্য যে কোন রকমই হোকনা কেন তার মধ্যে কোন কার্যাকারণ যদি আদৌ থাকে তা হলে তাতে অবশ্যই একটি ভৌত ঘটনা থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ ঘটনাটি যদি মানসিক ঘটনাও হয়ে থাকে তাও খুব স্বাভাবিক ভাবে কোন না কোন ভৌত ঘটনার জন্ম দেবে। যেমন আমি যদি আমার ডান হাতটি তোলার কথা চিন্তা করি (মানসিক ঘটনা) তা হলে তার ফলশ্রুতি হিসেবে আমার ডান হাতটি উঠবে (ভৌত ঘটনা)। শেষ অবধি একটি ভৌত ঘটনা থাকতেই হবে।

বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যেই ফিজিক্যালিজমের পক্ষে আরেকটি যুক্তি রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখবো বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলো ভৌতবিজ্ঞানকে সামনে রেখেই গড়ে ওঠেছে। কাজেই বিষয়টি যেদিক থেকেই আসুক বিজ্ঞানের তত্ত্বের বৈধ জ্ঞান সেখানে পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা যে পদ্ধতিতে নির্ণিত হবে সেখানে ভৌতবিজ্ঞানের নিরিখগুলোই কাজ করে। হ্যাঁ, অতীতে এই নিরিখের বাইরে কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন মাপকাঠি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন জীব-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অতীতে 'ভাইটালিজম' নামক তত্ত্বে আত্মার ভিত্তিতে জীবকে বিবেচনা করতে হবে এমন কথা ছিল— যা ভৌতবিজ্ঞানের পদ্ধতির নিরিখ থেকে আলাদা ছিল। তেমনি গ্রীক চিকিৎসাবিদ গ্যালেন ধমনী দিয়ে শুধু 'জীবনীশক্তি' প্রবাহিত হয় বলে মনে করতেন (রক্ত প্রবাহের কাজ তিনি শিরার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন)। আধুনিক পদ্ধতির নিরিখে এই স্পিরিট বা জীবনীশক্তির বিচার করাও অসম্ভব। কিন্তু ভাইটালিস্টরা যেমন বস্তুবাদী (ম্যাটেরিয়ালিস্ট) জীববিজ্ঞানের কাছে টেকেনি, গ্যালেনের রক্ত সঞ্চালন তত্ত্বও উইলিয়াম হার্ভের আধুনিক তত্ত্বের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে— এরকম ভৌত-বহির্ভূত তত্ত্ব আজ আর দেখা যায়না। আমরা সব বিজ্ঞানকে বস্তুবাদের দিকে যাবার কথা যখন বল্‌ছি বস্তুর নিজের সংজ্ঞাটি কিন্তু দারুণ ভাবে বদলে গেছে। পদার্থবিদ্যার আজকের ব্যাখ্যায় বস্তুর অর্থ অনেক ব্যাপক। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

দেখিয়েছে যে বস্তু ও শক্তি একই জিনিস— উভয়ে মিলিয়েই বস্তু। অন্যদিকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তু কণিকা সর্বত্রব্যপ্ত সম্ভাবনার তরঙ্গে পর্যবেশিত। কাজেই বস্তুবাদীমুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানগুলো একই ভাবে আধুনিক পদার্থবিদ্যামুখীও হয়েছে।

জীববিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের মত বিষয়ে ভৌতবিজ্ঞানের ভাষাকে টেনে আনা কিন্তু কখনো সমালোচনার উর্দ্ধে ছিলনা। সমালোচকদের একটি বড় বিশ্বাস হলো ভৌত ঘটনার মধ্য দিয়ে 'চেতনার' মত জিনিসকে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি আলাদা শৃঙ্খলায় এমন সব নীতি, এমন সব বিষয় রয়েছে যা ওই বিষয়ের মধ্যেই নিস্পত্তি করতে হয়, তাকে ভৌত ঘটনায় পরিণত করে নয়— এটিই সমালোচকদের মূল বক্তব্য। তাই চেতনাকে জীববিজ্ঞানের নিজস্ব উপায়-উপকরণ দিয়েই বুঝতে হবে, তাকে ভৌত বিজ্ঞানে পরিণত করলে চলবেনা। বক্তব্যটিকে একটি উপমা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যাক্। ধরা যাক্ প্রফেসর লায়লা বেগম নামের একজন মস্তিষ্কবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জীবনে যা কিছু শিখেছেন জন্ম থেকে সব সময় একটি কামরায় আবদ্ধ থেকেই শিখেছেন। ওই কামরায় ছিল শুধু একটি সাদাকালো মনিটরযুক্ত কম্পিউটার। এটি ছাড়া ওই কামরায় কখনো কোন মানুষ বা কোন আসবাব ছিলনা— এমনকি দেয়ালেও কোন রঙীন কিছু ছিলনা। প্রফেসর লায়লা জীবনের সবকিছু শিখেছেন ওই কম্পিউটারে থাকা শিক্ষা-উপকরণ থেকে। পদার্থবিদ্যাসহ ভৌতবিজ্ঞানের সবকিছু এবং মস্তিষ্কবিদ্যায় তাঁর জ্ঞানও এসেছে ওখান থেকেই। ওখানে রঙের চেতনা ছিলনা, অবশেষে একদিন প্রফেসর লায়লা জীবনে প্রথম বার ওই কামরার থেকে বাইরে এসে নানা রঙ দেখলেন। এই প্রথম তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর নিজের মধ্যে রঙের চেতনাটি কী। অন্য কেউ রঙ দেখলে তাঁরও কী রকম চেতনা হবে তাও তিনি প্রথমবার বুঝতে শিখলেন। অথচ ওই কামরায় থাকার সময় ভৌতবিজ্ঞানের সব বিদ্যাই তিনি অর্জন করেছিলেন— পদার্থবিদ্যা, কেমিস্ট্রি ইত্যাদির সকল তত্ত্ব সহ। এর অর্থ হলো ভৌতবিজ্ঞানের বাইরেও, ওসব তত্ত্বের বাইরেও, বিজ্ঞানে এমন জিনিস আছে যা ভিন্নভাবে শিখতে হয়— সব বিষয়কে ভৌতবিজ্ঞানে পরিণত করা সম্ভব নয়।

অবশ্য এই সমালোচনার জবাবও আছে। জানার ব্যাপারটি আসলে দু'রকমের হতে পারে। ওপরের উপমার ক্ষেত্রে বলা যায় প্রথম প্রকারের জানা হলো তথ্য বুঝে নেবার মত। এরকম একটি জানার কথা হতে পারে 'প্রফেসর লায়লা জানেন যে পলাশ ফুলের রঙ লাল'। অন্য রকম জানা হলো করতে জানা। এমন জানার একটি কথা হতে পারে 'প্রফেসর লায়লা জানেন কী ভাবে সাইকেল চালাতে হয়'। ওই কামরায় আবদ্ধ থেকে প্রফেসর লায়লার ক্ষেত্রে প্রথম জানার কথাটি সম্ভব নয়, দ্বিতীয়টি সম্ভব। অথচ এই প্রথম কথাটিও ভৌতবিজ্ঞানেরই একটি কথা; ভৌতবিজ্ঞানে পূর্ণ জ্ঞান আছে এমন যে কেউ

এটি বলতে পারবে। কাজেই স্পষ্টত ভৌতবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান মোটেই সম্পূর্ণ নয়। এটি ছাড়াও প্রফেসর লায়লার পক্ষে ভৌতবিজ্ঞানের নানা তত্ত্বকথা জানা সম্ভব হলেও ওই কামরায় ভৌতবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক কিছুই না থাকার ফলে ওগুলো সম্পর্কে তাঁর বাস্তব জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়নি। কাজেই ওপরের যে যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি ঠিক নয়— ওই কামরায় প্রফেসর লায়লার পক্ষে ভৌতবিজ্ঞানের সব জ্ঞান অর্জন সম্ভব ছিলনা। আসলে ভৌতবিজ্ঞানে তাঁর অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফলেই তাঁকে বাইরে আসার পর রঙের চেতনা শিখতে হয়েছে; যদি সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্ভব হতো তা হলে ভৌতবিজ্ঞান থেকেই তিনি রঙের চেতনাও পেতে পারতেন।

তাছাড়া সব কিছুকে ভৌতবিজ্ঞানে পরিণত করার বিরুদ্ধে আরো একটি সমালোচনা রয়েছে— যা ওই রঙের উদাহরণ থেকে দেখা যাক। লাল রঙ কী এই প্রশ্নের উত্তরে ভৌতবিজ্ঞান বলে যে 'লাল মানে লাল', বক্তা ও শ্রোতা মিলে যাকে লাল বলবে সেটিই লাল। কিন্তু ধরা যাক বক্তা লাল শব্দটি বলে রঙ দেখিয়ে লাল রঙটি বোঝালেন, কিন্তু শ্রোতা সেখানে দেখলেন সাদা রঙ, কারণ তাঁর চোখে তখন গোলাপী আভার চশমা ছিল। কাজেই লাল রঙের চেতনা পেতে ভৌতবিজ্ঞান এক্ষেত্রে যথেষ্ট হচ্ছেনা। কিন্তু আসলে এই সমালোচনারও জবাব আছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে শ্রোতা লাল শুনে সাদা দেখলেও, বক্তা কখনো সাদা বোঝাবার জন্য লাল শব্দটি বলেন না। কাজেই লাল মানে লাল-ভৌতবিজ্ঞানের এভাবে লালের চেতনা সৃষ্টি সবার জন্যই যথেষ্ট। এখানে দেখলাম সমালোচনা সত্ত্বেও কার্য-কারণ মানা যে কোন বিজ্ঞানের ঘটনা শেষ অবধি ভৌত ঘটনায় পর্যবেশিত হওয়ার ব্যাপারটি ঠিকই থাকছে। আর একবার ভৌত ঘটনায় পরিণত হতে পারলে সেখানে পর্যবেক্ষণ-যোগ্য এবং পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য সব রকম জিনিসের বাস্তব অস্থিত্ব মেনে নিতে কোন বাধা থাকে না— ওখানে তো আর আত্মা, জীবনীশক্তি, অবচেতন মন ইত্যাদির মত জিনিস নেই এমনিতেও যাদের অস্থিত্বের কথা বিজ্ঞানে ভাবাও যায়না। কিন্তু ভৌতবিজ্ঞানের জিনিসে পরিণত হতে পারলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

ঘটনার পেছনে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াঃ

আধুনিক বিজ্ঞানের শুরুতে নিউটনের গাণিতিক পদার্থবিদ্যা পুরো বিশ্বকে ঘড়ির কলের মত নিখুঁত শৃঙ্খলার জিনিসে পরিণত করেছিলো সে কথা প্রবাদতুল্য। অবশ্য আজকের দিনে আসতে আসতে পদার্থবিদ্যার যান্ত্রিকতার স্বরূপ অনেকখানি বদলে গেছে— কোয়ান্টাম তত্ত্বের অনিশ্চয়তার নীতি ইত্যাদির কারণে। এসবের কারণে কোয়ান্টাম জগতে সেই নিউটনের যান্ত্রিক বিশ্বের মত সব কিছু হিসেব করে সুনিশ্চিত ভাবে পাওয়া সম্ভব হয়না। কিছু কিছু জিনিস ইতস্তত ভাবে আসে, যেমন তেজস্ক্রিয় রশ্মির বেরিয়ে আসা। ওই চিরায়ত অর্থে

সব কিছু যান্ত্রিক নয়, তবে সব কিছুর মধ্যে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া (মেক্যানিজম) ঠিকই আছে। ফিজিক্যালিজমের যে প্রবণতা তা এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়া খুঁজে পাওয়ার আগ্রহ ও চ্যালেঞ্জটি ভৌতবিজ্ঞানের কাছ থেকে অন্যান্য বিজ্ঞানেও নিয়ে গেছে— যেমন জীববিজ্ঞানে অথবা মনোবিজ্ঞানে। এখন এসব বিজ্ঞানেও শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে চাই কিসের কারণে কোথা দিয়ে কী হয় সেই যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। যান্ত্রিক প্রক্রিয়াও বিজ্ঞানের বাস্তবতাকে অনেকটা অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হয় যে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকা মানে কিন্তু যন্ত্র বা মেশিনের মত কাজ করা নয়। মেশিন মানুষের তৈরি, এর নানা অংশ থাকে; যখন মেশিন চালু তখনো এর কোন অংশ চলছে, কোন অংশ চলছেনা, কোন অংশ হয়তো ভেঙ্গেই রয়েছে এমন হতে পারে। কখনো আবার পুরো মেশিন কিছু সময় না চলে আবার চলতে পারে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এই মেশিনকে অনুসরণ নাও করতে পারে। যেমন জীববিজ্ঞানে জীবের দেহের উদাহরণ নেয়া যাক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কারণে মেশিন না হয়েই আমরা যাকে ভুল করে দেহযন্ত্র বলে ফেলি। এটি বিবর্তনের সৃষ্টি, জীবৎকালে এটি একটানা চল্‌তেই থাকে, সাধারণত সব অংশই চালু থাকে। কাজেই এটি মেশিনের মত নয়।

যন্ত্র না হলেও তাতে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া আছে, এবং তা খুঁজে পাওয়া যাবে এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানীকে উদ্যোগী করে। এভাবে সব কিছু ঘটার মধ্যে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি খোঁজা আসলে তার মধ্যে কার্য-কারণ খোঁজারই মর্মকথা। তবে ভৌত বিজ্ঞানের বাইরে এ কাজটি অপেক্ষাকৃত কঠিন, সেখানকার যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে। ভৌতবিজ্ঞানের সব কিছু যন্ত্রের মত না হলেও তাতে যন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট দেখা যায়— সেটি হলো একটি ঘটনার পর তার ফলে আর একটি ঘটনা ঘটা যা সাধারণত সরল-রৈখিক ভাবে ঘটে। সত্যিকার ক্ষেত্রে সেরকম সরল-রৈখিক নাও যদি হয়, ভৌতবিজ্ঞানীর প্রবণতা হলো তাকে আসন্ন রূপে সরল-রৈখিক সমীকরণে পরিণত করার চেষ্টা করা। বিজ্ঞানের মডেলিঙের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা দেখেছি।

জীববিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরকম সরল-রৈখিক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া দুর্লভ। সেখানে একটির পর একটি ঘটনার সব কিছু বিন্যস্ত নয়, বরং ঘটনার যা আউটপুট তারই একটি অংশ আবার ইনপুটে গিয়ে আগের ঘটনাকে প্রভাবিত করাটাই এখানে নিয়ম— যাকে বলা হয় ফীডব্যাক লুপ। জীবদেহের নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া এমনি ফীডব্যাক লুপে ভর্তি। মনোবিজ্ঞানের আধুনিক রূপ যদি মস্তিষ্কবিদ্যা হয় তাহলে সেখানে তো এই জটিলতা আরো অনেক বেশি। সামগ্রিক ভাবে মস্তিষ্কের আধুনিক তত্ত্ব হলো কম্পিউটেশনাল থিওরি— যাতে মস্তিষ্কের কাজকে সাধারণ একটি কম্পিউটারের মৌলিক কাজের সঙ্গে তুলনা

করা হয় এবং এই দুইয়ের সাদৃশ্যের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু একটি স্তন্যপায়ী জীবের মস্তিষ্কে নিউরোন জাল এবং একটি সাধারণ কম্পিউটারের বর্তনীর মধ্যে তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটি কী ভাবে জটিল, এবং জীববিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি উদ্ঘাটন করা অপেক্ষাকৃত কত কঠিন। আর্টিফিশিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশের জন্য অবশ্য এই উদ্ঘাটন এবং মস্তিষ্কের মতই জটিল কম্পিউটার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

সেটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এক সময় জীববিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বোঝাটি একেবারেই অসম্ভব মনে করা হতো। এর সত্যিকার উদ্ঘাটন শুরু হয়েছে অপেক্ষাকৃত অনেক সাম্প্রতিক কালে প্রধানত ডিএনএ ভিত্তিক অণু-জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে। এখনো জীববিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ শাখার যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উদ্ঘাটনের চেষ্টাটি বড় কথা নয়। যেমন অ্যানাটমির কথা বলা যাক— এতে বিজ্ঞানী দেহের পরতে পরতে ভৌত গঠন দেখেন, নানা অংশের স্থানিক অবস্থানের মধ্যে সম্পর্কগুলো দেখেন— কিন্তু কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া দেখেননা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা টক্সোনমি জীবের শ্রেণীবিভাজনের কাজ করে, এক জীবের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিয়ে কাজ করে, কিন্তু এর মধ্যে কোন মেক্যানিজম বা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া খুঁজতে যায়না। এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উদ্ঘাটন না হওয়ার কারণে জীববিজ্ঞানে অনেক বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এখনো অপেক্ষা করছে। উদাহরণ স্বরূপ ধূমপান ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বাড়ায় অনেকদিন ধরেই এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কোন্ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ধূমপান এই অধিক সম্ভাবনার সৃষ্টি করে সেটি জানতে এখনো বাকি। আর মনোবিজ্ঞানের কথায় যদি আসি মস্তিষ্কে নিউরোন উদ্দীপ্ত হবার যে জটিল আতশবাজি তার নিরিখে আমাদের চিন্তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের কাজ সবে সফল হতে চলেছে। কিছুদিন আগেও মনোবিজ্ঞানকে একটি 'কালো বাক্সের' মত আচরণ করতে হতো যার ভেতরে কোথা দিয়ে কী হচ্ছে যার বোঝার চেষ্টাটুকুও ছিলনা।

এসবের মানে কিন্তু এই নয় যে এসবে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নেই বা তার উদ্ঘাটন অসম্ভব। সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলো কিন্তু মোটেই তা বলেনা। এমনকি ভৌতবিজ্ঞানেও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন ধরা যাক পদার্থবিদ্যায় একটি অত্যন্ত মৌলিক নিয়ম শক্তির নিত্যতা (কনজারভেশন অব এনার্জি)। এটি কেন আছে? এর মধ্যে যান্ত্রিক পদ্ধতিটি কী? এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই— আমরা শুধু জানি নিত্যতার নিয়ম আছে, ভৌত জগতকে এ নিয়ম মানতে হয়। এমন কিছু সীমাবদ্ধতা অন্য বিজ্ঞানেও থাকবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু সবখানে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি উদ্ঘাটন করার ইচ্ছা বিজ্ঞানের প্রবল আকাঙ্খা। আর এই আকাঙ্খাটি এসেছে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য

জিনিসগুলো সহ বিজ্ঞানের সব কিছুর প্রকৃতির মধ্যে বাস্তব অস্থিত্বে আছে এই বিশ্বাসের কারণে। এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানকে প্রেরণা যোগায়। যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কিছু ঘটতে গেলে এর সব উপাদানকে, এর সব 'কলকব্জাকে' সত্য হতে হয়, বাস্তব হতে হয়। এমনকি যে মস্তিষ্ক দিয়ে এসব কথা এখন ভাবছি সেই মস্তিষ্কের বাস্তব গঠন ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া জানার মাধ্যমেই এ চিন্তার স্বরূপটি বুঝতে হবে। সেখানে নিউরোনের উদ্দীপনাকে তাই সত্য বলে জানতে হয়, তার সিগন্যালে যে ইলেকট্রন, যে নিউরোট্রান্সমিটার তাকেও সত্য বলে জানতে হয়, মস্তিষ্কে কোর্টেক্সে নিউরোন জালের যে 'আতশবাজি' তাকে হয়তো মস্তিষ্ক স্ক্যানিঙের নীতি অনুসরণ করে পর্যবেক্ষণ-যোগ্য বলা যাবে, কিন্তু এটি সৃষ্টি করছে যেই পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য চিন্তা-চেতনাকে, তাকেও সত্য বলতে জানতে হয়। এসবের পেছনে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উদ্ঘাটন এভাবেই বিজ্ঞানের বাস্তবতাকে তুলে ধরে।

আগেই দেখেছি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্রই মেশিনের মত নয়, তাহলে খোঁজার সময় একে চিন্‌বো কী ভাবে? যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই কিছু স্পষ্ট উপাদান আছে যার মাধ্যমে তাকে চেনা সহজ হতে পারে। 'ঘটনা' হলো এমনি একটি উপাদান যা যে কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য জরুরি। ঘটনাগুলো প্রক্রিয়াটিকে ধরিয়ে দেয়, কোথায় ঘটা শুরু হলো এবং কোথায় শেষ হয়ে প্রক্রিয়ার একটি ফল বা প্রডাক্ট দিলো তা প্রক্রিয়াটির শুরু ও শেষ চিহ্নিত করে। যেমন একটি উদাহরণ হিসেবে ভাইরাল অসুখ সৃষ্টির জন্য যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটির অনুসন্ধান করা যাক্। এখানে ঘটনাগুলো একের পর এক এমন ভাবে ঘট্‌ছে যার প্রত্যেকটিতে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। ভাইরাস দেহকে আক্রমণ করলো; এগুলো দেহের কোষকে দখল করে তার যন্ত্রপাতিকে নিজের ডিএনএ'র প্রতিলিপি তৈরিতে বাধ্য করলো, এবং সেই অসংখ্য ডিএনএকে কার্যকর করলো; ডিএনএর প্রোটিন তৈরির ক্ষমতাকে (রুগীর নিজের কোষের মধ্যে সেই ক্ষমতা) ব্যবহার করে এরা ওখানে রোগের লক্ষণ সৃষ্টিকারী এনজাইম তৈরি করলো; এনজাইম ওই লক্ষণগুলো সৃষ্টি করলো— এই লক্ষণগুলোই যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটির শেষ উৎপাদিত জিনিস। লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ-যোগ্য, কিন্তু এর আগের ঘটনার অনেক জিনিসই পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য। তবে ঘটনাবলীর পরম্পরতায় যেই যান্ত্রিক প্রক্রিয়া তার প্রমাণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ-যোগ্য জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণ-অযোগ্যগুলোরও বাস্তব অস্থিত্বে বিশ্বাস রাখা যায়। এই যে ঘটনা পরম্পরার কথা বলা হলো আসলে কিন্তু এগুলো দেখা ঘটনাটির অন্তরালে থেকে যাচ্ছে— দেখা ঘটনাটি হলো ভাইরাল রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পাওয়া। এই লক্ষণের মধ্যে একটি হলো দেহের উত্তাপকে বাড়িয়ে ফেলা— জ্বর হওয়া। কিছুদিন পর কিন্তু এই জ্বর থাকে না, তখন দেহের উত্তাপ সব সময় একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে। তখন স্বীকার করতেই

হয় যে দেহের মধ্যে এমন একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া রয়েছে যা বেশ সূক্ষ্মভাবেই উত্তাপকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ধরে রাখে (অনেকটা আমাদের ফ্রিজের থার্মোস্ট্যাটের মতই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়)। এই যে 'সৃষ্টি করা' (এনজাইম), 'অন্তরালে থাকা' (ডিএনএ প্রতিলিপির প্রক্রিয়া), 'ধরে রাখা' (উত্তাপ) এগুলো সব যান্ত্রিকতার ব্যাপার। এই ঘটনাগুলো দেখে এর মধ্যে যান্ত্রিকতার প্রক্রিয়াটিকে আঁচ করতে পারি।

যান্ত্রিকতাকে চেনার আর একটি চিহ্ন হলো এর বিভিন্ন অংশকে আলাদা করতে পারা— যার প্রত্যেকটি অংশের একটি আলাদা স্বাধীন সত্ত্বা থাকে। এই প্রত্যেকটি অংশকে ওই যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটির বাইরে নিয়ে যাওয়া হলেও সেখানে এটি তার স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখতে পারে। বাইরে ভিন্ন জায়গায় তার সত্ত্বা বজায় রেখে কাজ করার মধ্য দিয়ে এই অংশগুলো নিজেদের বাস্তব অস্থিত্বের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসই আলাদা ভাবে বাস্তব। ওপরের উদাহরণে ভাইরাস, দেহকোষ, ডিএনএ প্রতিলিপি করার প্রক্রিয়া, এনজাইম সৃষ্টির প্রক্রিয়া, এনজাইম, রোগের লক্ষণ এগুলো এরকম স্বাধীন সত্ত্বা ও নিজেই পৃথক বাস্তব অস্থিত্ব সম্পন্ন এক একটি অংশ— যা ওই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই অংশ। দেহকোষের বাইরেও ভাইরাস আছে, ভাইরাস আক্রান্তরা ছাড়া অন্যদের দেহকোষও কাজ করে, রোগের লক্ষণ সৃষ্টি ছাড়াও এনজাইম অন্যান্য আরো কাজ করে— ইত্যাদি।

যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আর একটি স্পষ্ট উপাদান হলো কার্য-কারণের উপস্থিতি। যে কোন যান্ত্রিকতা কার্য-কারণের মাধ্যমেই ঘটে থাকে— একেবারে যন্ত্রের মত করে বল্‌লে একটি চাকা ঘোরে বলেই অন্য চাকাটিও ঘোরে। সব যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এটি থাকতে হয় বটে কিন্তু আগেই দেখেছি তা সনাতন যন্ত্রের মত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাই যান্ত্রিক ব্যাপার বলে পরিচিত আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সংঘর্ষ, ঘর্ষণ ইত্যাদির মধ্যে এই কার্য-কারণকে সীমাবদ্ধ রাখার কোন কথা নেই— এটি কোয়ান্টাম উল্লম্ফনের মতো একেবারেই অভিনব ও সম্ভাবনা-নির্ভর কার্য-কারণও হতে পারে।

সব শেষে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আরেকটি উপাদানের কথা ভুলে গেলে চলবেনা— ওই সব ঘটনা, সব অংশ, সব কার্য-কারণকে এক করে শেষ উৎপাদিত জিনিসটি সফল ভাবে বের করে আনার জন্য একটি সার্বিক সংগঠন (অর্গানাইজেশন) এর মধ্যে থাকতে হয়। টাউন হলের ঘড়ির মেশিনটির যিনি যন্ত্র-নির্মাতা তিনিই ঘড়ির মধ্যে এই সংগঠনটিকে নিশ্চিত করেছেন— যাতে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় কাঁটা যায়, ঠিক সময়ে ঘন্টা পড়ে। সৌরজগতের যে 'মেশিন' সেখানে সংগঠন ঠিক করে দিয়েছে গতিবিদ্যার গাণিতিক সুসঙ্গতি। জীববিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে প্রায় সব কিছুর যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার (যদিও মেশিন নয়) সংগঠন ঠিক করে দিয়েছে বিবর্তন। দৈবভাবে ঘটা মিউট্যাশন এবং নিয়ম

মেনে ঘটা প্রাকৃতিক নির্বাচন সেখানে অনিবার্যভাবে চমকপ্রদ সব জৈবজাগতিক ও মনোজাগতিক সংগঠনগুলো সৃষ্টি করেছে।

সব মিলে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যখন আমরা চিন্‌তে পারি, তখন তার মধ্যে সব বৈজ্ঞানিক জিনিসের বাস্তব অস্থিত্ব নিয়ে এক রকম নিঃসন্দেহ থাকতে পারি।

বাস্তবতা ও বস্তুনিষ্ঠতা

সত্যটাই লক্ষ্য, মূল্যবিচার নয়:

কোন ব্যক্তিকে আমরা যদি কোন ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ (অবজেক্টিভ) বর্ণনা দিতে বলি এর অর্থ হলো তিনি তাঁর নিজের বা অন্য কারো ব্যক্তিগত অভিমত বা পছন্দ-অপছন্দের ধার না ধেরে বাইরে সত্যি সত্যি যা ঘটেছে তার হুবহু বর্ণনা দেবেন। তবেই সেটি বস্তুনিষ্ঠ হবে, ব্যক্তিনিষ্ঠ হবেনা। তবে ব্যাপারটি শুধু ব্যক্তির দ্বারা নয়; কোন পরিস্থিতির দ্বারা, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা, বিশেষ সংস্কৃতি, সমাজ, জাতি বা দলের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়াটিও বস্তুনিষ্ঠ হবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যা বস্তুনিষ্ঠ তা বাস্তবে সত্য হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর ব্যক্তির ইচ্ছার ভিত্তিতে মনগড়া কিছু সত্য হবার সম্ভাবনা কম। বিজ্ঞান তার সব কথার বস্তুনিষ্ঠতা দাবী করে, এতই কড়াকড়ি ভাবে বস্তুনিষ্ঠ হবার দাবী করে যে কোন রকম মূল্যবিচার, এমনকি কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ সেই নৈতিকতার মূল্য বিচারও তার বক্তব্যকে প্রভাবিত করেনা বলেই ধারণা। এই কারণেই বিজ্ঞানের কথাকে কোন পক্ষপাতিত্বিহীন সোজাসাপটা নির্ভেজাল সত্য বলে মনে করা হয়। প্রকৃতির কোন রহস্য উদ্ঘাটনের সময় বিজ্ঞান মনে রাখেনা যে এই উদ্ঘাটন আখেরে মঙ্গল বয়ে আন্‌বে, না অমঙ্গল বয়ে আনবে; কারণ এই বিচারের ভার তার নয়, তার কাজ শুধু প্রকৃতির যে ব্যাখ্যা সে দিচ্ছে সেটি সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করা। এমন চাঁছা-ছোলা বস্তুনিষ্ঠতার দাবী করতে পারে বলেই বিজ্ঞান বাস্তবে সত্য হবার দাবীটিও করতে পারে। এই দুটি দাবী একই সূত্রে গাঁথা। তবে বাস্তবিক সত্য হবার দাবীর মত বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার দাবীকেও সমালোচনার কষ্টি পাথরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

বস্তুনিষ্ঠতার দাবীকে সঠিক প্রমাণ করতে হলে বিজ্ঞানকে দুই দিক থেকে বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। বিজ্ঞান যা আমাদেরকে দেয় তাকে বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে, এবং একই সঙ্গে যে পদ্ধতিতে ও প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান এটি আমাদেরকে দিতে পারে তাকেও বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। বিজ্ঞান যা দেয় তার মধ্যে রয়েছে তত্ত্ব, নিয়ম, এক্সপেরিমেন্ট-ফল, পর্যবেক্ষণ-তথ্য ইত্যাদি। নিশ্চিত করতে হবে যেন এগুলো মানুষের পছন্দ-অপছন্দ, মানুষের লক্ষ্য বা আকাঙ্খা, মানুষের অতীত জীবনাভিজ্ঞতা বা বর্তমান সক্ষমতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত না হয়। এটি হবে বিজ্ঞানের ফলাফলের বস্তুনিষ্ঠতা। আর দ্বিতীয়টির অর্থাৎ বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত

বস্তুনিষ্ঠতার জন্য দেখতে হবে যাকে আমরা বৈজ্ঞানিক কাজ বলছি তার প্রত্যেকটি পর্যায় ওরকম সব অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে মুক্ত কিনা। বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে পর্যবেক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্টের পদ্ধতি ঠিক করা পর্যন্ত সবকিছু যেরকম এর আওতায় পড়ে, তেমনি এর যুক্তিধারা, সাক্ষ্য ও অনুসন্ধান, ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদিও এর অন্তর্ভূক্ত। এগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানের অনুসৃত নীতির বাইরে অন্য কোন বিবেচনা কাজ করছে কিনা— যেমন সামাজিক, নৈতিক, ইত্যাদি বিবেচনা অথবা কোন মানুষ বা বিষয়ের প্রতি অনুরাগ-বিরাগ ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের বাস্তবতায় বিশ্বাসের জন্য এই উভয় প্রকার বস্তুনিষ্ঠতা খুবই প্রয়োজন। বিজ্ঞানের সত্যকে তাই ধ্রুব সত্য হতে হবে- স্থান-কাল পাত্র ভেদে তা ভিন্ন হবার সুযোগ নেই। দু'জন মানুষ একটি রঙীন জিনিস দেখে এর রঙ সম্পর্কে একমত নাও হতে পারেন- একজন সবুজ বল্‌লে আরেকজন খয়েরি বলতে পারেন (হয়তো তাঁদের একজন রঙ-কানা হবার কারণে)। কিন্তু তাঁরা দু'জনেই স্পেকট্রোস্কোপে ওই রঙের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ ৫১০ ন্যানোমিটার পেলে রঙটি সম্পর্কে ওই মতান্তর আর থাকে না— এটিই বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতা। এর ফলে বিশ্ব সম্পর্ক জ্ঞানের ভেতর জটিলতা হ্রাস পায়, এ সম্পর্কে একটি ঐক্যমত্যের ব্যাখ্যা সম্ভব হয়। তাছাড়া এর ফলে বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞান যা ভবিষ্যদ্বাণী করবে, যে ক্রিয়াকলাপ করবে, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের যে চেষ্টা করবে তার সবই একটি ধ্রুব সত্যের ভিত্তি থেকে উৎসারিত হবে এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। বিজ্ঞানের আকর্ষণটি এখানেই।

বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতায় কোন বিপত্তি দেখা দিলে এই ধ্রুব সত্য হবার বা তার কথার বাস্তব অস্থিত্ব থাকার ব্যাপারটিও বিপত্তির সম্মুখীন হয়। বস্তুনিষ্ঠতায়, বিশেষ করে পদ্ধতিগত বস্তুনিষ্ঠতায় এমনি একটি বিপত্তি দেখা দিতে পারে যদি পর্যবেক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্টের ওপর তত্ত্ব এসে ভর করে। এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আমরা এই সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করেছি। যে তত্ত্বটিকে এক্সপেরিমেন্টটি সমর্থন যোগাবার কথা সেই এক্সপেরিমন্টের আয়োজনে যদি ওই তত্ত্বটিকে ব্যবহার করা হয় তা হলে আগে থেকেই কাজটি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে, বস্তুনিষ্ঠ থাকে না। এ বিপত্তি এড়াবার উপায় অবশ্য রয়েছে, যা আমরা সেই আলোচনায় দেখেছি।

বস্তুনিষ্ঠতায় আরেকটি বিপত্তি হলো বিজ্ঞান কিন্তু শেষ অবধি ব্যক্তি-বিজ্ঞানীর ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে পাওয়া তথ্য হিসেবেই ধরা দেয়। বিজ্ঞানী যখন পর্যবেক্ষণ করেন, যন্ত্রের পাঠ নেন্ তখন কিন্তু নিজের চোখ ও মস্তিষ্কের সৃষ্ট চেতনাই ব্যবহার করেন। তাই যদি হবে তবে ব্যক্তিনিষ্ঠতা পুরাপুরি এড়ানো যাবে কী ভাবে? এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের বক্তব্য হলো এক্সপেরিমেন্টেই এমন ব্যবস্থা থাকে যে ওই পথে ব্যক্তি-প্রভাব ফলাফলে ঢুকতে পারে না।

বিজ্ঞান মূল্যবিচারের উর্ধ্বে থেকে কাজ করে— এই দাবীটিও সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে থাকে। সামাজিক বা নৈতিক মূল্যবিচার যদি বিজ্ঞানী এড়িয়ে যেতে সক্ষমও হন, বিজ্ঞানের নিজস্ব কিছু মূল্যবিচার রয়েছে যা এক একজন বিজ্ঞানী এক এক ভাবে দেখতে পারেন। এর কারণে বিজ্ঞানী হয়তো তাঁর কাজকে আগাগোড়া বদলে ফেলেন্না, কিন্তু তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের মাঝখানে সব সময় অল্প কিছু ফাঁক থাকে যা অনেক সময় বিজ্ঞানী তাঁর পছন্দের বৈজ্ঞানিক মূল্যবিচার দিয়ে ভরাট করে দেন। যেমন তিনি যখন সরল-রৈখিক নয় বরং যথেষ্ট জটিল-রৈখিক একটি এ্যালজেব্রার সমীকরণ থেকে কোন বিষয়ে প্রকৃতির প্রবণতা বুঝতে চান তখন ওই সমীকরণের থেকে পাওয়া বিন্দুগুলো গ্রাফ পেপারে সন্নিবেশিত করেন। বিন্দুগুলো পরস্পর যোগ করে প্রকৃতির প্রবণতাটি বোঝা যাবে— প্রাপ্ত রেখাটি কোন্মুখী। একাজ করার সময় বিজ্ঞানী যদি সমীকরণের উচ্চ সব পাওয়ারকে তুচ্ছ করে (সেগুলোর অবদান খুব কম) ওই রেখা তৈরি থেকে বাদ দেন এবং বাকিগুলোর মধ্য দিয়ে টানা অনেক সরলতর রেখা পান তাহলে তিনি বিজ্ঞানের কাজে সারল্যের গুণকে প্রাধান্য দিলেন। আর যদি উচ্চতর পাওয়ার নেয়া সহ সব বিন্দুকে গণ্য করেন তাহলে তিনি বরং নির্ভুলতার গুণকে প্রাধান্য দিলেন। এই পার্থক্যটি, এই গুণবিচারটুকু বিজ্ঞানী কখনো একেবারে নির্দোষভাবে করতে পারেন। আবার একই কাজ তিনি কোন নৈতিক, সামাজিক বা ব্যবসায়িক ব্যাপারে তাঁর পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট হয়েও করতে পারেন। শেষের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো এটি বিজ্ঞানের স্বাভাবিক গুণবিচার হিসেবে চালিয়ে দেয়া সম্ভব।

কোন কোন সমালোচকের মতে এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর পক্ষপাতদুষ্ট হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় যদি বিজ্ঞানের কাজের বিষয়টি নেহাৎ নিরপেক্ষ জ্ঞানের বিষয় না হয়ে আমাদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করার মত কোন বিষয় হয়। যেমন ডিএনএতে দুটি জিনের মাঝখানে কী থাকে, গ্যালাক্সির মাঝখানে একটি ব্ল্যাকহোল থাকে কিনা ইত্যাদিই যদি বিবেচ্য বিষয় হয় তাহলে বিজ্ঞানীর পক্ষে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মূল্য বিচার করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু যদি বিষয়টি এমন হয় যে তার ওপর আমাদের পরিবেশগত, স্বাস্থ্যগত, উপার্জনগত ব্যাপারগুলো নির্ভর করে তা হলে পক্ষপাতপূর্ণ মূল্যবিচার থেকে দূরে থাকা কঠিন হয়ে যায়। যেমন বিষয়টি যদি হয় জিন প্রতিস্থাপিত খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা নিয়ে অথবা মঙ্গল গ্রহে তরল পানি আছে কিনা সেই বিষয়ে, তখন এক প্রকার পক্ষপাত চলে আসে বৈকি। প্রথমোক্ত বিষয়গুলো বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে ক্ষেত্রে এবং শেষোক্ত বিষয়গুলো প্রায়োগিক বিজ্ঞনের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যাওয়া স্বাভাবিক।

বিজ্ঞানের ফলাফলের বস্তুনিষ্ঠতা এবং পদ্ধতির বস্তুনিষ্ঠতা উভয়কেই রক্ষা করার জন্য তিনটি দিক থেকে ব্যবস্থা নেয়া দরকার— পক্ষপাতহীনতা,

নিরপেক্ষতা এবং স্বায়ত্তশাসন। পক্ষপাতহীনতা মানে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূল্য ঠিক করতে হবে শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অবদান অনুযায়ী— অর্থাৎ তার নির্ভুলতা, প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে তার ক্ষমতা, আর বাস্তবিক সত্যের কত কাছাকাছি সেটি আছে তার ওপর। কোন অবস্থাতেই এর বাইরের কোন মূল্যবিচারে যেন তত্ত্বের ওপর বাড়তি মুল্য আরোপ না করে, বা তার মূল্য কেড়ে না নিতে পারে।

নিরপেক্ষতা ব্যাপারটি অবশ্য একটু অন্য রকমের । একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিরপেক্ষ হয় তখনই যখন প্রকৃতির এই ব্যাপারটি কী রকম হলে ভাল হয় সেটি নিয়ে তত্ত্বটির কোন মাথাব্যথা না থাকে। তার লক্ষ্য হবে বিশ্বপ্রকৃতি আসলে কী রকম তা বের করা, কী কী রকম হলে ভাল হতো সেটি নির্ণয় করা নয়। আর স্বায়ত্তশাসন হওয়ার মানে হলো বৈজ্ঞানিক নীতি ছাড়া অন্য কোন কিছুর দ্বারা বিজ্ঞানের কাজ নিয়ন্ত্রিত না হওয়া। এই তত্ত্বের পেছনে যে প্রচেষ্টাটি নেয়া হবে, যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, তা নির্ণিত হবে একমাত্র জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে, অন্য কোন লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে নয়। নৈতিক মূল্য, সামাজিক মূল্য, ব্যবসায়িক মূল্য এসব লক্ষ্য যেন তার দিক্ পরিবর্তন করতে না পারে। কার্যক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার জন্য বিজ্ঞানীকে এই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয় এবং সৎসাহসেরও পরিচয় দিতে হয়। বিজ্ঞান চর্চার অর্থের যোগানদাতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের ও লবির চাপ ইত্যাদি এরকম বস্তুনিষ্ঠতায় বাধ সাধতে পারে, তবে এর বিরুদ্ধে একটি বড় রক্ষাকবচ বিজ্ঞানের জগতে আছে, সেটি হলো বিশ্বজোড়া বিজ্ঞানী সমাজের সাবধানী অবলোকন এবং সমালোচনা। এই কারণেই কিছু কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতায় সাধারণত সবাই বিশ্বাস করে।

তবে পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা এবং স্বায়ত্তশাসন এই তিনটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানী বৈধ ভাবেই খানিকটা আপোষ করতে পারেন, এবং তা করেও থাকেন। এমন কিছু মূল্যবিচার আছে যার পরোক্ষ প্রভাব মেনে নিয়েও বিজ্ঞানী তাঁর অপরিহার্য বস্তুনিষ্ঠতায় অটল থাকতে পাবেন। এরকম গ্রহণযোগ্য পরোক্ষ প্রভাবের একটি উদাহরণ হলো যেখানে বিষয়টি জীবন-মরণের সেখানে বিজ্ঞানী একটি বিষকে যত অল্প সাক্ষ্যতে বিষ বলে থাকেন, তত অল্প সাক্ষ্যতে একটি ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্যকে নিরাপদ বল্‌তে রাজি থাকেন না। অর্থাৎ তিনি ভুল হবার যেটুকু সম্ভাবনা তাকে প্রাণ বাঁচানোর দিকেই রাখতে চান্, প্রাণকে ঝুঁকিতে ফেলার দিকে নয়। এখানে তিনি প্রাণ বাঁচানোর যে নৈতিক মুল্যবোধ তার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন, কিন্তু সেই প্রভাব সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে সমতা বজায় না রাখার মত পরোক্ষ প্রভাব মাত্র। এ ধরণের প্রভাব বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতার বা বৈজ্ঞানিক সত্যতার উল্লেখযোগ্য কোন ঘাটতি

ঘটায়না। কিন্তু এই জাতীয় মূল্যবিচারই যখন বিজ্ঞানীকে কৃত্রিম সাক্ষ্য সৃষ্টি করতে কিংবা বৈধ সাক্ষ্যকে গোপন করতে উদ্বুদ্ধ করে তখন সেটি আর পরোক্ষ প্রভাব থাকে না, প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরিণত হয়। এটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। সমস্যা হলো অনেক ক্ষেত্রেই এরকম পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব আলাদা করাটিও মোটেই সহজ হয়না। সব রকম মুল্যবিচারকে এড়াতে পারাটাই বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতা ও বাস্তব সত্যতার জন্য নিরাপদ।

নৈর্ব্যক্তিক হবার উপায়:

বিজ্ঞানের সকল যুক্তি ব্যক্তি-নির্বিশেষে সব বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-বোদ্ধার কাছ একই ভাবে গ্রাহ্য হতে হয়। বিজ্ঞানের তত্ত্ব ব্যক্তির কোন প্রবণতার ওপর নির্ভর করতে পারে না। এই জায়গাটিতে এটি মানুষের অন্য অনেক মহৎ সৃষ্টির থেকে ভিন্ন। সাহিত্য, চারুকলা, সঙ্গীত, দর্শন এমন অনেক সৃষ্টিকর্মে ব্যক্তির ছাপ শুধু স্পষ্ট নয়, এটি প্রত্যাশিতও বটে। কিন্তু বিজ্ঞানের কথা ভিন্ন।

বিজ্ঞানের পক্ষে নৈর্বক্তিক হবার একটি উপায় হলো যথাসম্ভব সব কিছুকে পরিমাপের এবং সংখ্যাবাচকতার আওতাভুক্ত করা। ব্যক্তিকে পরিমাপের সময় মিটারের বা স্কেলের দাগ ইত্যাদি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এ কথা ঠিক। তবে সব পরিমাপকেই সব ব্যক্তির কাছে একই করার প্রয়োজনীয়তায় এতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়। সংখ্যাবচক করার উদ্দেশ্যও একই। দিনের ঠিক দুপুরে আবহাওয়ার উত্তাপ ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে শীতের দেশের মানুষের কাছে তা গরম মনে হতে পারে এবং গরমের দেশের মানুষের কাছে তা ঠান্ডা মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁদের দুজনের কাছেই এটি ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর কিছু নয়। সেভাবেই বিজ্ঞান ব্যক্তি-নির্বিশেষ। কিন্তু সংখ্যাবাচক হলে, আর সংখ্যা হিসেবে সবাই একই ভাবে তাকে দেখলেই কিন্তু সব সমস্যা মিটে গেলোনা। সংখ্যা শেষ পর্যন্ত নেহাৎ সংখ্যা থাকে না, এরকম অনেক সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে এর থেকে একটি গুণগত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। এর মানে কোন না কোন ভাবে বিজ্ঞানে সংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহারটি চলে আসে; সিদ্ধান্তের পেছনে সংখ্যাতাত্ত্বিক সমর্থন আছে কিনা সে প্রশ্ন চলে আসে। তার একটি জলজ্যান্ত ক্ষেত্র হলো আধুনিক বিজ্ঞানে প্রায়শ নানা এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল নির্ণয় করতে হলে সংখ্যাতাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতার নিরিখেই তাকে স্থির করতে হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে (২০১২ সালে) সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় থাকা বিশাল কণিকা ত্বরক যন্ত্র লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের একটি এক্সপেরিমেন্ট সর্বত্র দারুণ হৈচৈ তুলছিলো। ১৯৬০ থেকে শুরু করে কয়েক বছরে তাত্ত্বিকভাবে আবিষ্কারের প্রায় আধা শতক পর হিগ্‌স বোসন নামক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণস্থায়ী কণিকাটি সেই এক্সপেরিমেন্টে উদ্ঘাটিত হয়েছিলো। একেবারে হাতে

নাতে নিশ্চিত করে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কণিকাটি ওখানে যে ক্ষণিকের জন্য দেখা গিয়েছিলো ব্যাপারটি কিন্তু সে রকমের নয়। হিগ্‌স বোসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশাল সংখ্যক তথ্য সম্ভার তখন ওখানকার অনেক কণিকা উদ্ঘাটক যন্ত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছিলো— নানা কণিকার ভাঙ্গা-গড়া নিয়ে। এসবকে সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে বিশ্লেষণ করে এর যা যা হিগ্‌স বোসনের দেখা যাওয়া সম্পর্কিত সাক্ষ্য হতে পারে সেগুলোর সঙ্গে যা যা সে রকম সাক্ষ্যের বিপরীত কথা বলে সেগুলোর তুলনামূলক বিচারে প্রথমোক্ত সাক্ষ্যই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেটি এমন প্রাধান্য যে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে হিগ্‌স বোসনকে দেখা গিয়েছে বলেই ধরে নিতে হয়েছে। ওখানে গবেষণারত কোন বিজ্ঞানী কিছু একটির প্রতি আঙ্গুল নির্দেশ করে বলতে পারবেননা— এই যে এই তো হিগ্‌স বোসনের ইমেজ। এটি শুধু সংখ্যাতাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতাতেই উদ্ঘাটিত। কিন্তু একটি বিষয় খুব স্পষ্ট। এই গ্রহণযোগ্যতা সব বিজ্ঞানীই বুঝে নেবার মত করেই এসেছে, কোন বিশেষ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত থেকে নয়। হিগ্‌স বোসনের উদ্ঘাটন পদার্থবিদ্যার অত্যন্ত মৌলিক বিষয়ের সত্যতার জন্য খুব প্রয়োজনীয় ছিল। এমন জিনিস সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে উদ্ঘাটিত হলেও বস্তুনিষ্ঠতার কারণে এতে কোন সন্দেহ আসেনি।

কিন্তু বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলোকে যখন আলোচনা-সমালোচনার সম্মুখীন করা হয়েছে তখন কেউ কেউ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো বিজ্ঞান-ইতিহাসে যেভাবে এসেছে তাতে সেগুলোকে নৈর্ব্যক্তিক বলে ভাবার উপায় নেই— বরং তার একটি বড় অংশ ব্যক্তিসহ নানা রকম বিভিন্ন প্রভাবের ওপর নির্ভর করেছে এবং কারো কারো মতে এখনো করছে। তাঁরা এভাবে বিজ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ হবার বদলে অনেকটা আপেক্ষিক জিনিস হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে টমাস কূনের স্বাভাবিক বিজ্ঞান ও বৈপ্লবিক বিজ্ঞানের পার্থক্য করার বিষয়টি আমরা দেখেছি। তাঁর মতে এক একটি দীর্ঘ সময়ে বিজ্ঞানীরা ওসময়ে প্রধান প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোকে ওগুলোর নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন— কারণ তাঁরা ওই তত্ত্বগুলোর আবহে কাজ করতে অভ্যস্ত। প্রয়োজনে সেই প্রধান তত্ত্বের সঙ্গে কিছু আনুসঙ্গিক অনুমান যোগ করে তাঁরা এটি করেছেন। অবশেষে বৈপ্লবিক তত্ত্ব এসে অবশ্য এতদিনের আবহ-সৃষ্টিকারী সেই প্রধান তত্ত্বকে স্থানচ্যুত করেছে। কূনের এই ইতিহাস-বিশ্লেষণে তিনি দেখাবার চেষ্টা করছিলেন যে কার্ল পপারের মত অনুযায়ী তত্ত্বকে ক্রমাগত মিথ্যাকরণের চেষ্টাটি আসলে বাস্তবে খুব বেশি বিজ্ঞানী করেননি।

কূনের এই মতবাদের মধ্যে বিজ্ঞানের আপেক্ষিক হবার আভাস আছে এমন কিছু লক্ষ্য করে কোন কোন দার্শনিক এই আপেক্ষিকতাকে অনেক বেশি পরিমাণে আরোপ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক

হবার বদলে বিজ্ঞান বরং একটি সমাজ ও ব্যক্তিনির্ভর ব্যাপার। এক সমাজের বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্য সমাজের বিজ্ঞান মিল্‌বে একথা আশা করাই উচিত নয়। যার যার সংস্কৃতি অনুযায়ী নানা সমাজে বিজ্ঞান বিভিন্ন রূপ নিতে পারে— যেগুলো কোনটি অন্যটির থেকে বেশি সত্য নয়। তাঁদের কেউ কেউ এমনো বলার চেষ্টা করেছেন যে আজ যাকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞান বলি তা প্রধানত ইউরোপীয় সমাজ-সংস্কৃতির সৃষ্ট একটি বিশেষ বিজ্ঞান; আফ্রিকার কোন কোন সমাজ তাদের যুক্তি অনুযায়ী জাদু-টোনার বিশ্বাসের যে 'বিজ্ঞান' গড়ে ওঠেছে তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবীর কোন অধিকার এই 'ইউরোপীয়' বিজ্ঞানের নেই। এগুলো অল্প কিছু ভিন্নমতের দার্শনিকের কথা হলেও তাঁদের বাইরেও কোন কোন গোষ্ঠির মধ্যে তার সমর্থন রয়েছে। তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত সবাই জানেন বিজ্ঞান মোটেই সে রকম কিছু নয়। বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার সমালোচনা যা হয় সেও বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার আবহের কারণেই হয়। বস্তুনিষ্ঠতার যে কোন ব্যত্যয় বিজ্ঞান জগতের মধ্যেই প্রবল বাধার সম্মূখীন হয়, আর তার ফলে এই রকম কিছু এখানে বেশীদূর যেতে পারে না। বিজ্ঞানকে এভাবে বস্তুনিষ্ঠ রাখার ওপরেই অনেকখানি নির্ভর করে তার সাফল্য, এবং তার বক্তব্যের মধ্যে থাকা জিনিসগুলোর বাস্তব অস্থিত্বে বিশ্বাস।

প্রকৃতির নিয়মে বিজ্ঞানের বাস্তবতা

নিয়ম মানার অর্থ কী:

প্রকৃতি নিয়ম মেনে চলে কিনা এমন প্রশ্ন করা হলে সব বিজ্ঞানী এক বাক্যে জবাব দেবেন প্রকৃতি অবশ্যই নিয়ম মেনে চলে। কারণ প্রকৃতি নিয়ম মেনে চল্‌লেই শুধু বিজ্ঞানীদের করার মত কাজ থাকে— প্রকৃতির নিয়ম উদ্ঘাটনই তো বিজ্ঞানের কাজ। আমরা এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে দেখেছি মানুষ মাত্রই এক রকম স্বভাব-বিজ্ঞানী গুহাবাসী প্রাচীন মানুষও তাই ছিল। তারাও ওরকম হতে পেরেছিলো প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাসী ছিল বলে; সেই নিয়ম বোঝার চেষ্টায় অনুসন্ধিৎসা মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো। কিন্তু সেই বিশ্বাস, সেই স্বভাবের কথা না ভেবে যদি একেবারে নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো প্রকৃতিকে নিয়মবদ্ধ হতেই হবে এমন কোন কথা নেই— প্রকৃতি নিয়ম মেনে চলার কোন দাসখত্ কাউকে দেয়নি। এখনো প্রকৃতির গভীরে এমন অনেক অংশ রয়েছে যেখানে কোন নিয়মের উপস্থিতি আদৌ আছে কিনা তা বিজ্ঞানী শুধু আশা করতে পারেন মাত্র। আসলে গুহাবাসীদের আমল থেকে সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায় সূর্য উঠতে দেখে, গ্রীষ্মকাল যথাসময়ে ফিরে আসতে দেখে বা এমনিতরো নানা অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের মধ্যে এরকম আশাবাদ জন্মেছে; এতে তারা উপকৃতও হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমও হতে পারতো।

প্রকৃতিতে নিয়ম বলে মনে হওয়া যা দেখা যায় তা আসলে দৃষ্টি বিভ্রম— এমনোতো হতে পারতো। তেমন হলে দেখা যেতো আসলে প্রকৃতি যেমন খুশি তেমন চলার জগত, কোন নিয়ম মেনে চলার জগত নয়। সে জগতে গতি মাত্রই ইতস্তত; কোন কিছু একবার ঘট্‌তে দেখলে তাকে আবার কখন ঘটতে দেখা যাবে, আদৌ আর দেখা যাবে কিনা এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন জগতে তো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে কোন লাভ নেই। বিজ্ঞানীরা কিন্তু কখনো প্রকৃতিকে এই দৃষ্টিতে দেখেননি। যেখানে বোঝা যায়নি প্রকৃতিতে নিয়ম আছে কিনা সেখানেও কিন্তু বিজ্ঞানীরা নিয়ম আছে ধরে নিয়েই এগিয়েছেন। সেটি গুহাবাসী স্বভাব-বিজ্ঞানী যেমন প্রাচীন আমলে করেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানীও প্রকৃতির নতুন নতুন রহস্যের পেছনে যেতে সেভাবেই অনুমান করছেন- যে প্রকৃতি নিয়ম মেনে চলে, এবং সেই নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব। তাঁরা মনে করেছেন নিয়ম আছে বিশ্বাস নিয়ে এগুনোটাই বিচক্ষণতার কাজ। যদি এ বিশ্বাস ঠিক প্রমাণিত হয় তা হলে প্রকৃতি আমাদের কাছে কারো খানিকটা উন্মোচিত হবে— তার উপকার অনেক। যদি এটি ঠিক না হয়, তা হলে অন্যদিকে দেখা যাবে। আর যদি আগে থেকেই প্রকৃতিকে যেমন খুশি তেমন চলার জগত মনে করে হাল ছেড়ে দিই, তা হলে তো বিজ্ঞানী হিসেবে এবং স্বভাব-বিজ্ঞানী মানুষ হিসেবে আমি এ মুহূর্তেই বেকার হলাম। নিয়ম মানাটাই যখন স্বীকৃত, তখন প্রকৃতির এ নিয়ম আবিষ্কার করে প্রকাশ করার সময় বিজ্ঞানীকে তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা জিনিসের কথা বলতে হয়। নিয়ম সত্য হবে যদি ওই জিনিসগুলোর বাস্তব অস্থিত্ব থাকে। সে অস্থিত্ব আছে কিনা, থাকলে তার বাস্তবতার স্বরূপ কী এসব খুব নায্য প্রশ্ন।

তার আগে অবশ্য দেখা দরকার যে প্রকৃতি নিয়ম মেনে চলে এই কথারই বা অর্থ কী। এই একই কথার নানা অর্থ হতে পারে। তার কিছুটা অন্য প্রসঙ্গে আমরা এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে দেখেছি। আসল অর্থটি জানা দরকার, কারণ এখানে আমরা দেখবো তার ওপরেই নির্ভর করবে এ নিয়মের সঙ্গে বিজ্ঞানের জিনিসের বাস্তবতার সম্পর্ক আছে কিনা। তাই প্রকৃতির নিয়ম থাকার অর্থটির অবতারণা আবার আমাদেরকে করতে হবে।

একটি ঘটনা একইভাবে বার বার পুনরাবৃত্ত হতে থাকলে আমরা বলি ওটি একটি নিয়মে চল্‌ছে। দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম মানা বল্‌তে সাধারণত আমরা এই পুনরাবৃত্তিকেই বুঝি। একটি ঘটনার পর সব সময় অন্য একটি ঘটনা ঘটলে তাকেও আমরা নিয়ম বাঁধা ঘটনা বলি। যেমন স্কুলে ছুটির ঘন্টা পড়লে ছাত্ররা হৈচৈ করে বেরিয়ে যাবে এটি একটি নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম বলতেও অনেকে এভাবে পুনরাবৃত্তি বা একটি ঘটনার পর নিয়মিত অন্য একটি ঘটনা ঘটাকে মনে করেন। কিন্তু এরকম পুনরাবৃত্তিকে নিয়ম বলার কিছু বিপত্তি আছে। একটি বিপত্তি হলো এতে সত্যিকার নিয়ম এবং দৈবক্রমে পুনরাবৃত্তি—

এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায়না। যেমন আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে ঢাকায় স্কুলের ছুটির ঘন্টা বাজলে ঠিক সে সময় চট্টগ্রামের স্কুলের ছাত্ররা যে হৈচৈ করে বেরিয়ে আসে, সেটি একটি নিয়ম। এটি প্রতিদিন ঘটে। পুনরাবৃত্তিই যদি নিয়ম হয়, তাহলে এটি নিয়ম না হবার কোন কারণ নেই। অথচ ব্যাপারটি নেহাৎ দৈব ঘটনাচক্রে ঘটছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের স্থানীয় সময় ভিন্ন হলেও আমরা জাতীয়ভাবে সারা দেশে একই সময় ব্যবহার করি। স্কুল ছুটির সময় বিকেল চারটা এই দুই জায়গাতে একই। তাই চট্টগ্রামের ছাত্ররা চারটা বাজলেই হৈচৈ করে বেরিয়ে আসে, ঢাকায় স্কুলে ঘন্টা বাজার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অথচ পুনরাবৃত্তিকে নিয়ম ধরায়, একেও আমাদের কাছে নিয়ম মনে হচ্ছে। বোঝা গেল নিয়ম হতে গেলে পুনরাবৃত্তি ছাড়াও আরো কিছু নিয়ম-জাতীয় উপাদান থাকতে হবে।

পুনরাবৃত্তিকে নিয়ম বলার আরো বিপত্তি আছে। এতে নিয়মটি কোন্ অভিমুখে তা বোঝা যায়না। বক্ষ ক্যানসারের সঙ্গে ধূমপানের সম্পর্কটিকে আমরা একটি নিয়ম হিসেবে দেখি কারণ এটি নানা ক্ষেত্রে বার বার একই সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্ক দিয়েছে। যেখানেই ধূমপান বেশি, সেখানেই এই ক্যানসার বেশি। কিন্তু এর থেকে একটি জিনিস বোঝার উপায় নেই যে ধুমপান ক্যানসার সৃষ্টি করছে, না ক্যানসার ধূমপান সৃষ্টি করছে। অথচ এটি না বুঝতে পারলে এই নিয়ম জেনে কোন লাভ নেই। এখানেও স্পষ্ট যে নিয়ম হতে হলে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আরো কিছু নিয়ম-জাতীয় উপাদান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাড়তি উপাদানটি বেশ আন্দাজ করা যাচ্ছে— ধূমপান আর ক্যানসারের সম্পর্কের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কটি জানতে হবে; তবেই বুঝবো কিসের জন্য কী হচ্ছে।

ওপরে উদাহরণ দুটি থেকে মনে হতে পারে যে প্রকৃতির নিয়ম হবার জন্য ঘটনার বার বার পুনরাবৃত্তির শর্তটি যথেষ্ট নয় বটে কিন্তু এরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে— অর্থাৎ এটি যথেষ্ট শর্ত নয়, তবে প্রয়োজনীয় শর্ত। কিন্তু আসলে এটি তাও নয়, নিয়ম হবার জন্য পৌনপুনিকতাটি একটি প্রয়োজনীয় শর্তও নয়। একটি উদাহরণ দিয়ে এটি দেখানো যাক্। বস্তুর পতনশীলতার নিয়মটি আমরা গ্যালিলিওর কাছ থেকে প্রথম পেয়েছি— এতে তিনি দেখিয়েছেন ভর সম্পন্ন যে কোন বস্তু নিচের দিকে পড়ে, এবং ওসময় তার পতনের বেগ একই হারে ক্রমাগত বাড়তে থাকে— অর্থাৎ নিচের দিকে সমত্বরণে এটি পড়ে। পৃথিবীর কোন একটি জায়গার জন্য ত্বরণটি সুনির্দিষ্ট পরিমাপযোগ্য। পরে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব এই নিয়মটিকে আরো সাধারণ নিয়ম হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু প্রকৃতির দিকে তাকালে সব কিছুকে কি আমরা বার বার এই নিয়মে পড়তে দেখি? গাছের একটি ঝরা পাতার দিকে লক্ষ্য করলেই বল্‌বো— না, তা দেখিনা। ওই পাতাকে সমান ত্বরণে নিচের দিকে পড়ার বদলে বরং এদিক

ওদিক ইতস্তত উড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিত কোথাও পড়তে দেখি। এরকম পাতা এক এক সময় এক এক ভাবে পড়তে দেখি— যার মধ্যে কোন পৌনপুনিকতা নেই। তাহলে গ্যালিলিওর পতনশীল বস্তুর নিয়ম সঠিক হবার জন্য পৌনপুনিকতার প্রয়োজন নেই— কোন নিয়মের জন্য এই পুনরাবৃত্তি বা পৌনপুনিকতা অবশ্যকীয় নয়।

নিয়ম হবার জন্য জরুরি উপাদান, যা বাস্তবতার সাক্ষী:

বোঝা যাচ্ছে নিয়ম হবার জন্য অন্য কিছুর দরকার— যাকে আমরা ওপরে বলেছি 'নিয়ম-জাতীয় উপাদান'। নিয়মের এই উপাদানটি হলো ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি, প্রায়শ সেটি এক একটি জিনিসের বিশেষ কিছু 'ক্ষমতা' থাকার ওপর নির্ভর করে— যেমন ভর, বৈদ্যুতিক চার্জ ইত্যাদির কারণে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষমতা ইত্যাদি। এসব সাধারণত ঘটনার কারণ সৃষ্টি করে, এবং নিয়মের পেছনেও জরুরি হয়ে ওঠে। ওপরে দেয়া ধূমপান ও ক্যানসারের সম্পর্কের নিয়মটিতে কাজ করছে ক্যানসার সম্পর্কে ও ধূমপান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। এর ফলে উভয়ের সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্কটিতে আমরা বুঝতে পারি ধূমপান ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে, ক্যানসারের পক্ষে ধূমপান সৃষ্টির কোন উপায় নেই। ব্যাপারটি পৌনপুনিক না হলেও নিয়মটির কোন ব্যত্যয় হয়না। শুধু পৌনপুনিকতা দেখে যদি আমরা এই নিয়মটির সিদ্ধান্তে আসতাম তা হলে ধূমপান নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ক্যানসার প্রতিরোধের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্যানসার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধূমপান প্রতিরোধের চেষ্টাও হয়তো করতাম।

অন্য উদাহরণে গ্যালিলিওর পতনশীল বস্তুর নিয়মটি এসেছে ভরযুক্ত অন্যসব বস্তু যে পৃথিবীর দিকে যায় সেই জ্ঞান থেকে- পরে নিউটন যাকে মহাকর্ষ হিসেবে সাধারণ নিয়মে পরিণত করেছেন। গাছের ঝরা পাতাকে আমরা এই নিয়ম অনুযায়ী পড়তে দেখিনা, কারণ পাতাটির ওপর শুধু এই নিয়মই কাজ করছেনা, একই সঙ্গে অন্যান্য নিয়মও কাজ করছে— যেমন বাতাসের বাধার নিয়ম, বায়ুপ্রবাহের নিয়ম ইত্যাদি। হালকা-পাতলা পাতার ক্ষেত্রের এই শেষের নিয়মগুলোর প্রভাবও যথেষ্ট। আমরা পাতার ওপর এসব বিভিন্ন নিয়মের মোট ফলটি দেখি- তাই পতনশীলতার নিয়মের পুনরাবৃত্তি দেখিনা। কাজেই প্রকৃতির নিয়ম বলতে ঘটনার পুনরাবৃত্তি বোঝানোটি সঠিক নয়, বরং ঘটনা যদি এর সঙ্গে জড়িত নানা জিনিসের ক্ষমতা ও তাদের সৃষ্ট কার্য-কারণের ওপর নির্ভর করে তা হলেই জানবো যে ওটি একটি নিয়ম মেনে চলে।

প্রকৃতির নিয়মকে এভাবে দেখলে আরো একটি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। প্রকৃতিকে উদ্ঘাটন করে বিজ্ঞানের যে সব নিয়ম, সাধারণত ওগুলো

বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়। এক্সপেরিমেন্ট অত্যন্ত বিশেষায়িত আবহের মধ্যে কাজ করে— নানা রকম নিয়মকগুলো এতে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে। সত্যিকারের প্রকৃতিতে এরকম বিশেষায়িত ও নিয়ন্ত্রিত আবহ থাকে না— তারপরও ওই বৈজ্ঞানিক নিয়মটি আমরা অবলীলায় সত্যিকারের প্রকৃতির ওপর প্রয়োগ করে সফল হই। এভাবে নিয়ন্ত্রিত আবহের এক্সপেরিমেন্টে পাওয়া নিয়ম বাইরের কাজের অনিয়ন্ত্রিত আবহের মধ্যে সফল হওয়ার কোন ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না। অথচ উদাহরণ স্বরূপ এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে পাওয়া লোহার স্থিতিস্থাপকতার নিয়ম আমরা কতই না নিশ্চিন্তে ভবন নির্মাণের কর্মস্থলে লোহার রড ইত্যাদির ওপর প্রয়োগ করছি। অথচ সেখানে ল্যাবোরেটরির নিয়ন্ত্রণগুলো নেই। প্রকৃতির নিয়মকে ওই নানা জিনিসের ক্ষমতা ভিত্তিক কার্য-কারণ হিসেবে দেখাতে এরও একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভবন নির্মাণে এক্সপেরিমেন্টে পাওয়া নিয়মটি ব্যবহার করতে পারছি কারণ এক্সপেরিমেন্টের আর ভবনের এই দুই আবহেই ওই কার্য-কারণের উপাদানটি সমানে কার্যকর থাকে— লোহার স্থিতিস্থাপকতার সেই আবশ্যিক ক্ষমতা ও তার ফলে কার্যকারণ, নিয়মের ভেতর এটিই গুরুত্বপূর্ণ।

এখন আমরা বিজ্ঞানের বাস্তবতার সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মের সম্পর্কটি দেখার চেষ্টা করি। এজন্য বিজ্ঞানে বাস্তবতায় যাঁরা সন্দেহ করেন তাঁদের একটি যুক্তির দিকে তাকাই। তাঁরা বলেন বিজ্ঞানের তত্ত্ব আসল প্রকৃতির অনেক সরলীকৃত ও বিমূর্ত রূপ, তাই এতে যে সব জিনিসের কথা বলা হয় তা বাস্তবে প্রকৃতিতে থাকতে পারে না। যেমন হাইড্রোজেন এটমের কোয়ান্টাম তত্ত্বীয় বর্ণনার থেকে এর থেকে নির্গত আলোর যে স্পেকট্রাম হিসেব করে পাওয়া যায় তা সত্যিকার স্পেকট্রামের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। অথচ হিসেব করার তত্ত্বের মধ্যে ধরে নেয়া হয়েছে যে ওই একটি এটমের কাছাকাছি পরিবেশে অন্য এটম বা অন্য কোন কিছু এর ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করছেনা। এই ধরে নেয়াটি কিন্তু বাস্তব নয়, বরং একটি সরলীকৃত কথা মাত্র। এরই বিস্তৃতি টেনে তাঁরা বলেন সরলীকৃত হয়েও বাস্তবের সঙ্গে মেলার জন্য তত্ত্বেও ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদির বিশেষ গুণ সম্পন্ন চিত্রের অবতারণা করতে হয়েছে, ওগুলোও আসলে বাস্তব নয়। সন্দিহানদের এমন কথা বিজ্ঞানীরা মানেন্না এই যুক্তিতে যে তত্ত্বের মধ্যে ইলেকট্রনের (এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণ-অযোগ্য জিনিসের) যে সব নানা আসন্ন রূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয়েছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেটি কোন্ অর্থে আসন্ন রূপ তার কার্য-কারণ ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের জানা রয়েছে। এ কারণেই তাতে বাস্তব ফল পেতে কখনো অসুবিধা হয়নি। ইলেকট্রনকে কখনো একটি জ্যামিতিক বিন্দু, কখনো সম্ভাবনার তরঙ্গের কুয়াশা ইত্যাদির রূপে দেখা হয়েছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা ঠিক জানেন কোথায় কোন্ জিনিসকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তাঁরা সেখানে ইলেকট্রনের একটি বিশেষ মডেল ব্যবহার করেছেন। তাই

তাঁদের কাছে এক একটি পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রত্যেকটিই সত্য; সব মিলিয়ে যে ইলেকট্রন তা ঠিকই বাস্তব। তাঁরা এও জানেন যে প্রত্যেকটি ইলেকট্রনের চার্জ মাপলে তাতে এদিক-ওদিক সামান্য ত্রুটি থাকবেই, একটির চার্জের সঙ্গে অন্যটির চার্জ হুবহু মিলবেনা। কেন তা মিলবেনা তা জানেন বলেই তাঁরা এও জানেন যে আসলে সব ইলেকট্রন হুবহু এক, তাদের চার্জও হুবহু এক।

এখানে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির যে নিয়ম আবিষ্কার করেছেন তা নিয়ম হিসেবে দাঁড়িয়েছে ইলেকট্রনের ওই সব আসল গুণ ও সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে— যা আমাদের সেই নিয়ম-জাতীয় উপাদান। এই উপাদান আছে বলেই এগুলো প্রকৃতির নিয়ম হতে পেরেছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বাস্তবতায় সন্দিহানরা যেই ভুলটি করেন তা হলো প্রকৃতির ঘটনার পুনরাবৃত্তিকেই তাঁরা প্রকৃতির নিয়ম মনে করেন, এর মধ্যে কার্য-কারণ জ্ঞানটিকে আমলে নেন্না। ফলে তাঁদের কাছে হাইড্রোজেন এটমের ওপর বাইরের প্রভাব না ধরেই তার দ্বারা হুবহু প্রকৃত স্পেকট্রামের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারাকে কৃত্রিম ভাবে পারা মনে হয়— কৃত্রিম ইলেকট্রন ইত্যাদির সহায়তায়। তাঁরা প্রকৃতির মধ্যে সরলীকৃত বৈজ্ঞানিক মডেলের মর্মকথাটি দেখতে পাননা বলেই এমন হয়। তাঁরা নিয়ম বলতে ঘটনার পুনরাবৃত্তির নিয়মই মনে করেন। তাই ইলেকট্রনকে কখনো বিন্দু, কখনো কুয়াশা রূপে নেয়ার মধ্যে পুনরাবৃত্তির ব্যত্যয় দেখে ইলেকট্রন জিনিসটাকেই কৃত্রিম মনে করেন। অথচ ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি পুনরাবৃত্তি নয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই প্রকৃতির নিয়মের সঠিক উপাদান। প্রকৃতির ওই নিয়ম যদি বাস্তব হয়, তা হলে সেই ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত জিনিসগুলোও বাস্তব।

এলেম কোয়ান্টাম দেশে

চিরায়ত জগত ও কোয়ান্টাম জগত

আমাদের বোধশক্তিতে শুধুই চিরায়ত জগত:

আমরা বিজ্ঞানের বাস্তবতার প্রশ্নটি আলোচনা করেছি। বিজ্ঞান যেভাবে প্রকৃতিকে বর্ণনা করে সেটি আমাদের বোধশক্তিতে স্বাভাবিক ভাবে ধরা দিলে বিজ্ঞানের বাস্তবতাটি সহজবোধ্য হয়, আমাদের মস্তিষ্কে তা বেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু আধুনিকতম বিজ্ঞান আমাদের জন্য সে সুযোগ রাখেনি। সুযোগটি হারিয়ে গেছে প্রধানত পদার্থবিদ্যার চিরায়ত রূপটি হারিয়ে যাওয়ার কারণে, যা বিজ্ঞানের মৌলিক চিত্রটিই বদলিয়ে দিয়েছে। এটি আমাদেরকে বেশ পরিচিত চিরায়ত জগত থেকে নিয়ে এসে অপরিচিত কোয়ান্টাম জগতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সব কিছুর মূলে এটম ইত্যাদি ক্ষুদ্র জিনিসের যে প্রকৃতি রয়েছে তা নিজেদের বোধশক্তি দিয়ে কল্পনা করাটাই এরপর থেকে আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ এ কঠিন কাজটি করতেই হচ্ছে; বাস্তব প্রকৃতির সঙ্গে এই কোয়ান্টাম জগতের বয়ানগুলো এতো চমৎকার ভাবে মিলে যায়, এবং অন্য কোন বয়ান সেখানে হালে পানি পায়না বলেই বোধশক্তির বিরুদ্ধে গিয়েও একেই মেনে নিতে হয়েছে। এ যেন 'এ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' বইয়ের এ্যালিসের আজব দেশে হাজির হওয়ার মত। ওখানে সব কিছু এমন বাস্তব ভাবে ঘটছিলো যে এ্যালিসকে আজব দেশের নিয়মেই চিন্তা করতে অভ্যস্ত হতে হয়েছে। আমাদেরকে কোয়ান্টাম দেশে এসে তাই করতে হচ্ছে। বিজ্ঞান জিনিসটি কী, এ কথা আজকের দিনে বুঝতে হলে এই কোয়ান্টাম দেশের হালচাল কিছুটা বুঝতে হবে বৈকি। তবে শুরুতে দেখা দরকার আগের চিরায়ত জগতটারই মূল বক্তব্যটি কী, কোয়ান্টামের আজব দেশে তার যা যা বদলে গেছে সেগুলোও বা কী।

এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে গত শতাব্দীর বৈপ্লবিক বিজ্ঞান তত্ত্বগুলোর আলোচনায় আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্বের বেশ কিছু পরিচয় ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছি। এখানে আমাদের দেখার বিষয় হলো কোয়ান্টাম তত্ত্বের জগতে ভৌত বিষয়গুলো আমাদের বোধশক্তির কাছে কী অভিনব রূপে আসছে তা। আমাদের চিরায়ত ধারণাগুলোকে পটভূমিতে রেখে এই অভিনবত্বকে খানিকটা বোঝার চেষ্টা করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য। যেহেতু পটভূমিতে চিরায়ত

ধ্যানধারণাকে রাখতে হবে তুলনার জন্য, কাজেই আগে সেই চিরায়ত বিজ্ঞানের দিকে একটু তাকানো যাক্।

ক্ল্যাসিকাল ফিজিক্স বা চিরায়ত পদার্থবিদ্যা নামটি দেয়া হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যায়ে তখন পর্যন্ত চমৎকার ভাবে প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিদ্যাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু থেকে এই নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার জয়জয়কার একেবারেই একটানা চলে আসছিলো। এটি যেভাবে নিশ্চিত প্রত্যয়ে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করছিলো, সব কিছুর নিখুঁত হিসেব করে দিচ্ছিলো, তা বিজ্ঞানীদেরকে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিলো। কোন সমস্যাই এর মধ্যে সমাধানহীন ছিলনা। একারণেই একে চিরায়ত বলা হয়েছে। এর মধ্যে এমন কিছু ধারণা বদ্ধমূল ছিল যেগুলো আমাদের সাধারণ বোধশক্তির সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াতে তাদেরকে চিরায়ত বা চিরকালীন ভাবতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। মহাবিশ্ব এর কাছে যেন একটি বিশাল যন্ত্র। সামগ্রিক ভাবে তার সবকিছুর গতিবিধি যতই জটিল হোক না কেন, এর ভেতরের অংশগুলোর সরল ও বোধগম্য গতিবিধি থেকেই সেগুলো সৃষ্টি হয়। এই অংশগুলো আমাদের দৃষ্টির বাইরে হলেও, তাদের এই সরল গতির নিয়ম কানুন নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর প্রত্যেকটির পেছনে কারণ আছে— সব ঘটনা একবারেই আমাদের বোধগম্য কার্য-কারণের দ্বারা সুনির্দিষ্ট। যে কোন একটি সময়ে কোন কিছুর গতির তথ্য যদি জানা থাকে তাহলে এর পরের বা আগের অন্য যে কোন সময়ে এর গতি একেবারেই নিখুঁত ও সুনির্দিষ্ট রূপে হিসেব করে জানা সম্ভব। এভাবে চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় হিসেব করে অবস্থান, গতি ইত্যাদি জানা যাবেনা এমন কিছু নেই— সেটি যদি অণু, এটম বা ইলেকট্রনের মত অতি ক্ষুদ্র জিনিসও হয় তাও। চিরায়ত পদার্থবিদ্যার সক্ষমতার এই দিকগুলো নিউটনের অত্যন্ত সফল গতি তত্ত্ব দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো।

চিরায়ত পদার্থবিদ্যার সক্ষমতার অন্য একটি দিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক পরে উনবিংশ শতাব্দীতে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বের মাধ্যমে। আলো সহ সব বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের আচরণ এই তত্ত্ব থেকে নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এগুলো যে তরঙ্গ, এর সবগুলোরই যে একই সুনির্দিষ্ট বেগ রয়েছে, এগুলো সুন্দর সব এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন আলোকে যদি খুব সরু দুটি ফাটলের মধ্য দিয়ে যেতে দেবার পর একটি পর্দার ওপর ফেলা হয় তা হলে এই আলো পর্দায় দুটি ফাটল বরাবরই শুধু পড়েনা (আলো যদি ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত হতো, তা হলে তাই যেতো) বরং পর্দায় খানিকটা আলোর পাশে থাকে খানিকটা অন্ধকার, তার পাশে আবার আলো, আবার অন্ধকার— এমনি একটি ঝালর সৃষ্টি করে আলো পড়ে। তত্ত্ব অনুযায়ী আলো যে তরঙ্গ এটি তার প্রমাণ। কারণ দুই ফাটল দিয়ে আসা তরঙ্গের পরস্পর উপরিপাতনের ফলে যেখানে উভয়ের শীর্ষের সঙ্গে শীর্ষ মিলেছে সেখানে উভয়

শীর্ষ যোগ হয়ে আলোর সৃষ্টি হয় আর যেখানে শীর্ষের সঙ্গে বিপরীত শীর্ষ মেলে সেখানে উভয়ে কাটাকুটি হয়ে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। এটি দুই ফাটলের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হওয়া আলোর মধ্যে ইন্টারফেরেন্স বা পরস্পর ক্রিয়ার ফল। বিখ্যাত দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে এর সাক্ষাত আমরা আগেই পেয়েছি। যে কোন তরঙ্গ এভাবে দুই ফাটলের মধ্য দিয়ে গেলে এমন ঝালর সৃষ্টি করবে— অবশ্য তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ অনুযায়ী ফাটলের ছিদ্র এবং দুই ফাটলের মধ্যে দূরত্ব ভিন্ন ভিন্ন সাইজের হতে হবে। অন্য দিকে কণার প্রবাহকে এভাবে দুই ফাটলের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলে কোন ঝালর দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে শক্তি যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় দুই ভাবে সেটি সম্পন্ন হতে পারে— কণিকার মাধ্যমে অথবা তরঙ্গের মাধ্যমে। শক্তিকে এই দুইয়ের কোন একটিতে থাকতে হবে— হয় কণিকায়, নইলে তরঙ্গে। এর একটিতে থাকলে একই সঙ্গে অন্যটিতে থাকা সম্ভব নয়। যেমন আমরা দেখেছি আলো হলো তরঙ্গ, কাজেই তার পক্ষে কণিকা হওয়া সম্ভব নয়। এমনি ভাবে এটম হলো কণিকা, তার পক্ষে তরঙ্গ হওয়া সম্ভব নয়।

চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় যে কোন সিস্টেমের যে কোন গুণ নীতিগত ভাবে নিখুঁত ভাবে পরিমাপ করা সম্ভব— যেমন এর উত্তাপ, চাপ, গতি ইত্যাদি। পরিমাপ করতে গিয়ে একে চেনার বা দেখার জন্য যদি কোন আলো জাতীয় রশ্মি ব্যবহার করতে হয়, আর তার প্রভাবে মাপে কিছুটা ভুল দেখা দেবার আশঙ্কা থাকে তা হলে সেই রশ্মির তীব্রতা কমিয়ে মাপকে শুদ্ধ রাখা সম্ভব। যতখানি শুদ্ধ চাই, তীব্রতা হ্রাস তেমন ভাবে করে ততখানিই শুদ্ধতা অর্জন সম্ভব। তাছাড়া ভুল যেটুকু হবে তা তাত্ত্বিক ভাবে হিসাব করে ফলাফলকে শুদ্ধ করে নেয়া যায়। অর্থাৎ চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় ভৌত প্রকৃতি সম্পর্কে যতখানি ইচ্ছা সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভে কোন বাধা অন্তত নীতিগত ভাবে দেখা যাচ্ছিলোনা। এতে বিজ্ঞানী মনে করতে পারেন প্রকৃতি ওই তো ওখানে রয়েছে— এর সকল আচরণ বিজ্ঞানের নিখুঁত সমীকরণগুলো দিয়ে সরাসরি ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

কিন্তু হায় উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে না হতে, এই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বিজ্ঞান-ছবিতে সমস্যা দেখা দেয়া শুরু হয়েছিলো। তার খুব গুরুতর কিছু সমস্যা ছিল আলোর মত শক্তি বিকিরণ, এবং পরমাণু বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কণিকার ক্ষেত্রে চিরায়ত পদার্থবিদ্যার এই অনেকগুলো আলামতই সত্যি হতে না দেখা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চার দশকের মধ্যেই ক্রমাগত গবেষণা চিরায়ত পদার্থবিদ্যার অবসান ঘটিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। এই দুইয়ের যে দুই জগত তাতে গাণিতিক ও বাহ্যিক কিছু কিছু মিল ও ধারাবাহিকতা আছে বটে— কিন্তু আসলে এই দুইয়ের ধারণা

একেবারেই ভিন্ন রকমের। চিরায়ত ধারণাগুলো যতই আমাদের বোধশক্তির কাছের জিনিস, কোয়ান্টাম ধারণাগুলো ততই এই বোধশক্তি থেকে অনেক দূরের।

প্রকৃতির পছন্দ কোয়ান্টাম বিজ্ঞান:

কোয়ান্টাম জগতে বিশ্বকে চিরায়ত অর্থে যন্ত্রের মত সুনির্দিষ্ট ধরে নেবার উপায় রইলোনা, কারণ এর সমীকরণ একেবারে দুয়ে দুয়ে চারের মত করে সবকিছুর গতিবিধির ভবিষ্যদ্বাণী করেনা। এর মানে এই নয় যে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় ঘটনার সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়না, বরং আরো চমৎকার ভাবে তা করা যায়। কিন্তু এই জগতে 'সুনির্দিষ্ট' কথাটির অর্থটাই বদলে গেছে— যা আমরা একটু পর দেখবো। একটি বড় পার্থক্য হলো আলো এখানে তরঙ্গও, আবার কণিকাও; এর একটি হলে অন্যটি হতে পারবেনা চিরায়ত বিজ্ঞানের সেকথা এখানে অচল। এই দ্বৈততা শুধু আলোর নয়, কোয়ান্টাম জগতের সবকিছুরই রয়েছে।

এ জগতের অণু-পরমাণুর মত ক্ষুদ্র জিনিসগুলোর কিছু কিছু গুণের ওপর পরিমাপ চালালে একই সঙ্গে তার সব গুণ নিশ্চিত করা যায়না, বিশেষ বিশেষ জোড়ায় দুটি গুণের একটি যতই নিশ্চিত হবে, অন্যটি ততই অনিশ্চিত হতে থাকে। কিন্তু এই অনিশ্চয়তার নীতিটি কিন্তু খুবই সুনির্দিষ্ট। এসব আমাদের পরিমাপের পদ্ধতি বা যন্ত্রের সীমাবদ্ধতার কারণে হচ্ছে তা কিন্তু নয়, বরং এটি প্রকৃতিরই অমোঘ নিয়ম— প্রকৃতির পছন্দ এই কোয়ান্টাম বিজ্ঞান, আমাদের বোধশক্তি যাই বলুক না কেন।

সাধারণ একটি ধারণা যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব সঠিক ফল দিতে পারে না, শুধু সম্ভাব্য ফল দিতে পারে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়— বরং এটি খুবই শুদ্ধ ফলাফল দেয়— যে সব ফলাফল চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় নিখুঁত পাওয়া যেতোনা তাও। ফলাফলের প্রকৃতিটি কিন্তু চিরায়ত বিজ্ঞান থেকে কিছুটা আলাদা— সেটি বুঝতে পারটাই জরুরি। সম্ভাবনা জিনিসটি আসলে চিরায়ত বিজ্ঞানেরই ধারণা, কোয়ান্টাম তত্ত্বে এর সঙ্গে তুলনীয় এক ধরণের সম্ভাবনা-সদৃশ প্রভাব ফলাফলের মধ্যে খুব গুরুত্ব পায়, কিন্তু সেটি একান্তই কোয়ান্টাম জগতেরই ধারণা আর তাতে প্রকৃতির আচরণের শুদ্ধ ফল পেতে কোন বাধা হয়না।

চিরায়ত পদার্থবিদ্যা থেকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় এই যে পার্থক্য, এই যে সুনির্দিষ্টতা, নিশ্চয়তা, সম্ভাবনা ইত্যাদির অর্থ পরিবর্তন, তরঙ্গের বস্তু-ধর্ম আবার বস্তুর তরঙ্গ-ধর্ম এসব শুধু ক্ষুদ্র জিনিসের ফলাফল দিতে প্রযোজ্য তা নয়, বড় জিনিসের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব খুব বেশি। ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর পর্যায়ের এই কোয়ান্টাম নীতি বড় দৃশ্যমান বস্তুর ঘটনাবলীতেও দারুণ ভাবে বদলে দেয়। যেমন একটি কৃষ্টালের কথাই বলি যা কিনা একটি বড় কঠিন বস্তু যার

অণুগুলো সব দিকে সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ। একটি মিছরি, বা একটি লবনের কৃষ্টালও এর উদাহরণ হতে পারে। এর যে গুনাগুন— যেমন এর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, তাপ পরিবাহিতা, কোন্ তল বরাবর চাপ দিলে এটি সহজে ভেঙ্গে যাবে— এই সব সঠিক ভাবে জানার জন্য কোয়ান্টাম তত্ত্বের মাধ্যমেই এগোতে হয়, চিরায়ত তত্ত্বের মাধ্যমে নয়। এই কৃষ্টাল যে এমন সুশৃঙ্খল কঠিন রূপ নিতে পেরেছে তার ব্যাখ্যাও কোয়ান্টাম মতেই শুধু দেয়া সম্ভব। এই কঠিন বস্তুর আরো নানা আচরণ যেমন লোহার চৌম্বক গুণ, লোহা কত শক্ত বা নরম হবে, তার গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক ইত্যাদি কত হবে তাও শুধু কোয়ান্টাম তত্ত্বের পক্ষেই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়। এই তত্ত্বের ভেতরে যতই 'সম্ভাবনা', 'অনির্দিষ্টতা' ইত্যাদি থাকুক না কেন এই ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু একবারেই সুনির্দিষ্ট— বাস্তব ফলাফলের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে যায়। আমাদের বোধশক্তির অতীত কোয়ান্টাম বাস্তবতার অংশ এরা, আমাদের সুপরিচিত চিরায়ত বাস্তবতার নয়— কারণ কোয়ান্টাম বাস্তবতাটাই প্রকৃতির পছন্দ, আমাদের পছন্দ হোক্ বা না হোক্। তাই কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা এখন বিজ্ঞানের পুরো মৌলিক অংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বিশেষ করে ভৌত বিজ্ঞানের। একবারে সাধারণ জিনিস— যেমন ধরা যাক কোন বস্তুর রঙ অর্থাৎ তা কোন্ ফ্রিকোয়েন্সির আলো শোষণ করবে অথবা বিকিরণ করবে তাও নির্ধারিত হয় কোয়ান্টাম প্রক্রিয়ায়। আগে মনে করতাম রঙের ব্যাখ্যা আমরা জানি, কিন্তু আসলে সেই জানাটি সঠিক ছিলনা। শুধু কোয়ান্টাম বাস্তবতায়, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতেই তা ধরা পড়ে। এমনি ভাবে আরো অনেক কিছু এখনই শুধু বোঝা যাচ্ছে। এই কেমিস্ট্রি আবার জীববিজ্ঞান সহ অন্যান্য নানা বিজ্ঞানেরও নিয়ামক। যেমন বংশগতির বাহক যে ডিএনএ অণু তার প্রক্রিয়াগুলোও তো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিরই নিয়ন্ত্রণে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বে আমরা শুধু সম্ভাবনা-সদৃশ একরকম মানের নিরিখেই ক্ষুদ্র জিনিসের গুনাগুনকে বর্ণনা করতে পারি— তার সুনির্দিষ্ট অবস্থান, বেগ ইত্যাদির নিরিখে নয়। যেমন সেই দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টের কথাটিই ধরা যাক। ইলেকট্রনকে আমরা একটি কণিকা হিসেবে জানি— সেই একটি ইলেকট্রনের সামনে যদি তার ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য মানানসই দুটি অতি ক্ষুদ্র ফাটল রাখি, ফাটলের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পর পর্দার ওপর তার উপস্থিতির ঝালর-সদৃশ বন্টন দেখে মনে হবে ওই একটি ইলেকট্রন একই সঙ্গে এই দুটি ফাটলের মধ্য দিয়েই গিয়েছে। কোয়ান্টাম বাস্তবতাতেই এমনটি হবে, চিরায়ত বাস্তবতায় নয়, কারণ এখানে এটি কণিকাও, আবার তরঙ্গও। দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টে আমরা তার তরঙ্গ-রূপটিই দেখ্ছি, কিন্তু কণিকা রূপটিও যদি না ভুলি তা হলে একই সঙ্গে কণিকাটির অবস্থান প্রথম ফাটলেও ছিল এবং দ্বিতীয় ফাটলেও ছিল এমনটিই ভাবতে হবে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমীকরণই

শুধু হিসেব করে দিতে পারে কোন্ ফাটলে থাকার সম্ভাবনাটি কী রকম ছিল? প্রকৃত কোয়ান্টাম ঘটনাটি এই দুই সম্ভাবনার (আসলে সম্ভাবনা-সদৃশ একরকম মানের) একটি মিশ্রণ— ওই মিশ্রণ হিসেবেই একে গ্রহণ করতে হয়। এমন অদ্ভুত কথা মানতে প্রকৃতি আমাদেরকে বাধ্য করেছে। আমাদের বোধশক্তির সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন করে একে যখন চিরায়ত বিজ্ঞানে বোঝার চেষ্টা করেছি কখনো কখনো নাটকীয় ভাবে মারাত্মক ভুল ফলাফল পেয়েছি।

আসলে হয় কণিকা, নয় তরঙ্গ এর যে কোন একটির মাধ্যমে শক্তির আনাগোনা ঘটে চিরায়ত বিজ্ঞানের এই ধারণাটিই ছিল মৌলিক ভাবে ভুল। কণিকার অবস্থান আমাদের ত্রিমাত্রিক স্থানে; এখানে তাই এই তিন মাত্রার তিনটি স্থানাঙ্কে তার অবস্থানটিকে এবং ভরবেগের তিন মাত্রার তিনটি উপাংশে তার ভরবেগকে বর্ণনা করা যায়। কাজেই মোট এই ছয়টি মাত্রাতেই এর স্বাধীন যাতায়ত (ডিগ্রি অব ফ্রিডম)। অন্যদিকে তরঙ্গের বর্ণনা আসে অসীম ভাবে বিস্তৃত ক্ষেত্রের নিরিখে— যেমন বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রে। ছয়টি মাত্র সংখ্যা কণিকার বর্ণনা দিলেও ক্ষেত্রের বর্ণনা আসে অসীম সংখ্যক সংখ্যার দ্বারা। বিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো কোন জিনিস যত সংখ্যক মাত্রায় স্বাধীন যাতায়ত করতে পারে তার মোট শক্তিকে এই সব মাত্রার মধ্যে সমান ভাবে বন্টিত থাকতে হবে। যেমন কণিকার ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ছয় হওয়াতে তার শক্তি এই ছয় মাত্রায় সমান ভাবে বন্টিত হবে। কোন সিস্টেমে কণিকা ও তরঙ্গ উভয়ে থাকলে, কণিকা পাবে মোট প্রায় অসীম সংখ্যক ভাগ এর মানে তরঙ্গই সব শক্তি খেয়ে ফেল্‌বে— কণিকা বলতে গেলে কিছুই পাবেনা। শুধু তাই নয় একটি ওভেনের মত উৎস থেকে যে শক্তি পাব ওই অসীম ভাগকে যোগান দিতে গিয়ে ওভেনের মোট শক্তি অসীম হতে হবে, যা কখনো সম্ভব নয়। চিরায়ত পদার্থবিদ্যার মূল সমস্যা এখানেই। তরঙ্গ হলে কণিকা হতে পারবেনা, কণিকা হলে তরঙ্গ হতে পারবেনা এমন চিরায়ত ধারণার কারণেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের কণিকা-তরঙ্গ দ্বৈততার জগতে এই সমস্যা নেই।

আমরা আমাদের বৈজ্ঞনিক মডেলিঙের অধ্যায়ে দেখেছি রাদারফোর্ডের সৌরজগত সদৃশ এটম মডেলটি এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সেটি কেন পুরাপুরি শুদ্ধ ছিলনা। নিউক্লিয়াসের চারিদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে হলে ইলেকট্রনকে বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তি বিকিরণ করে নিউক্লিয়াসের ওপর পড়ে যেতে হবে। তা হলে এটম চুপসে যাবে। কিন্তু সত্যিকার এটমে তা হয়না, তার কারণ আসলে একটি ইলেকট্রনও এটমের নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকে, সবখানেই তার থাকার একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা আছে, খুব বেশি সম্ভাবনা আছে এক একটি নানা আকৃতির বলয়ে। 'সম্ভাবনার ঘনত্ব'কে কুয়াশার ঘনত্বের মতো কল্পনা করা যায় বলে এই বলয়ে ইলেকট্রনটির অবস্থানের কুয়াশা ঘন হয়ে

থাকে, অন্যত্র তা এত ঘন হয়না। কুয়াশার ঘনত্ব এখানে সম্ভাবনার বন্টনের এক রকম সূচক মাত্র, অন্য কিছু নয়। কোয়ান্টাম তত্ত্বে এটম দেখা দিলো এক ধরণের কুয়াশা মডেলে। এই কুয়াশা মডেল থেকেই বিজ্ঞানের নানা ফলাফল খুব সঠিক ভাবে পাওয়া যায়। যেমন কেমিস্ট্রির নানা মৌলের এটমের পরস্পরের বন্ধন বা বিক্রিয়ায় এক এটমের সম্ভাবনার কুয়াশা আরেক এটমের সম্ভাবনার কুয়াশার সঙ্গে যেভাবে গাণিতিক ভাবে কাজ করে তার থেকেই বেরিয়ে আসে প্রকৃতিতে কেমিস্ট্রির আসল খবর, অন্য কোন উপায়ে আসতোনা। কাজেই এটমের কুয়াশা মডেল সব বাস্তবতাকে সম্ভাবনার কুয়াশায় পরিণত করেছে এমন ভাবার কোন কারণ নেই, বরং প্রকৃতির নিখুঁত বাস্তবতার হিসেব এভাবেই দেয়া যাচ্ছে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে প্রায়শ আলোর কণিকা ফোটন এবং ক্ষুদ্রতম একটি বস্তু কণিকা ইলেকট্রনের উদাহরণ নেয়া হয়। কিন্তু ইলেকট্রনের বদলে এর থেকে ২০০০ গুণ ভারী প্রোটন কণিকাকে নিলেও কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগ একই ভাবে হবে। অনেকগুলো প্রোটন-ইলেকট্রনে গড়া পুরো এটমকে নিলে তাও সই। যেমন পুরো এটম নিয়ে যদি দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টটি করি তাতে এর তরঙ্গ-চরিত্রটি বেশ ভালভাবেই দেখা যাবে, যেভাবে ফোটন বা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এগুলো সবার ক্ষেত্রে ফাটল পার হয়ে যাওয়ার পর এরা পর্দায় কোন না কোন ভাবে ওই ঝালরের ব্যাপারটি ফুটিয়ে তোলে এবং কণিকা হয়েও এদের তরঙ্গ-চরিত্রের প্রকাশ ঘটে। কাজেই এই সব কিছু কোয়ান্টাম জগতেরই অন্তর্গত। এমনি ভাবে কিছু এটম মিলে যে অণু তার ক্ষেত্রেও যে এমনটি হয় সে ব্যাপারেও আমরা নিশ্চিন্ত।

কিন্তু ধরা যাক অণু-পরমাণুর সাইজ থেকে অনেক অনেক বড় কিছু নিয়ে কথা বলছি— যেমন এই ক্রিকেট বল্‌টি। এটিও কি কোয়ান্টাম জগতের অন্তর্গত হবে? যদি হয় তা হলে ফোটন, ইলেকট্রন, এটম বা অণুর ক্ষেত্রে যা করা হয়েছে সে রকম দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্ট ক্রিকেট বলের ক্ষেত্রে করলে একই রকম ফল পাওয়া যাবে। অর্থাৎ একটি ক্রিকেট বল তার সামনে দুই ফাটলের উভয়টির মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে যাবে এবং নিজের ওপরেই নিজে উপরিপাতিত হয়ে পর্দায় ঝালর সৃষ্টি করবে!! আমরা জানি সেটি হবেনা— ক্রিকেট বলের ক্ষেত্রে অথবা হাতীর মত আরো বড় জিনিসের ক্ষেত্রে কেন তরঙ্গ-ধর্ম প্রযোজ্য হবেনা বলা একটু জটিল। নানা দিক থেকে এই না হওয়াটিকে ব্যাখ্যা করা যায়, যার একটি আমরা একটু পর দেখবো। তবে এটি ঠিক যে কোন জিনিস ওই অণু-পরমাণুর সাইজের থেকে যতই বড় ও জটিল হতে থাকে তার কোয়ান্টাম চরিত্র তত কম প্রকাশ পায় এবং এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। যেটি মনে রাখা দরকার অণু-পরমাণু জগতের প্রায় সবই কোয়ান্টাম জগতের আর বড় জিনিস প্রায় সবই চিরায়ত জগতের।

চিরায়ত জগতে 'সম্ভাবনা' জিনিসটির মানে:

ইতোমধ্যে দেখেছি কোন জিনিসের কোয়ান্টাম অবস্থার বর্ণনা দিতে গেলে বর্ণনাটি হতে হয় একাধিক বিকল্প অবস্থার একটি মিশ্রণ হিসেবে। পরে দেখবো মিশ্রণে এর প্রত্যেকটির গুরুত্ব কত দিতে হবে তা আসে প্রত্যেকটিকে সেটির 'সম্ভাবনার' মত একটি রাশি দিয়ে গুণ করে। কোয়ান্টাম জগতে এভাবে সম্ভাবনার মত রাশির হিসেবেই ফলাফলগুলো পাওয়া যায়, যা বেশ নিখুঁত ফলাফল। কিন্তু সম্ভাবনা (প্রবাবিলিটি) বল্‌তে সাধারণত আমরা যা বুঝি তা আসলে চিরায়ত জগতেরই ব্যাপার, চিরায়ত বিজ্ঞানে যার চমৎকার ব্যবহার রয়েছে। চিরায়ত জগতে সম্ভাবনা জিনিসটির মানেটি স্পষ্ট হলে, এই সম্ভাবনার মত যেই রাশিগুলো কোয়ান্টাম জগতে এত বড় ভূমিকা পালন করছে তাকে বোঝার সহায়ক হবে।

গণিত থেকে সম্ভাবনার যে ধারণাটি এসেছে তা হলো কোন ঘটনা যদি কয়েক রকমের বিকল্প রূপে ঘটতে পারে তা হলে সেগুলোর মধ্য থেকে একটি বিশেষ বিকল্প মোট ঘটনা সংখ্যার কত ভগ্নাংশে ঘটতে পারে সেটিই হলো তার সম্ভাবনা। যেমন একটি মুদ্রার এপিঠ বা ওপিঠ ওপরে রেখে পড়ার ব্যাপারে যদি সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন প্রতিসাম্য থাকে তা হলে ছুঁড়ে দিলে এটি পড়ার দুটি প্রতিসম বিকল্প থাকে— হয় 'হেড', নয় 'টেইল'। পূর্ণ প্রতিসাম্য থাকায় এই প্রত্যেকটি বিকল্প ঘটার সম্ভাবনা অর্ধেক; আশা করা যায় যে একশ'বার ছুঁড়লে পঞ্চাশবার হেড পড়বে এবং পঞ্চাশবার টেইল পড়বে। সত্যি সত্যি এতবার না ছুঁড়েই যে আমরা আশা করতে পারছি যে এত ভগ্নাংশে অর্থাৎ এতবার এই বিকল্প ঘটবে, আর অত ভগ্নাংশে ওই বিকল্প ঘটবে; এবং সত্যি সত্যি ছুঁড়ে দেখলে দেখি তার খুব কাছাকাছিই সব সময় ঘট্‌ছে— এটিই সম্ভাবনার ধারণার বাহাদুরি। মুদ্রা ছোঁড়ার ব্যাপার না হয়ে এটি যদি লুডুর দান ফেলার ব্যাপার হয় তাহলে এতে ছয়টি তলের মধ্যে যে কোন একটি পড়ার সম্ভাবনা $\frac{১}{৬}$। ওই ছয় তলের মধ্যে যদি নিখুঁত প্রতিসাম্য থাকে তা হলে ৬০ বার দান ফেল্‌লে ছক্কা পড়ার সম্ভাবনা এর $\frac{১}{৬}$ অর্থাৎ ১০ বার। সত্যি সত্যি যদি ৬০ বার ফেলা হয় ঠিক ১০ বার না পড়লেও ছক্কার সংখ্যা তার খুব কাছাকাছি হয়, আর ৬০০ বার ফেললে তার $\frac{১}{৬}$ অর্থাৎ ১০০ বারের আরো বেশি কাছাকাছি হয় (তুলনামূলক ভাবে)। কাজেই সম্ভাবনা নামক ওই ভগ্নাংশটি জানার মাধ্যমে আমরা ঘটনা সত্যি সত্যি না ঘটিয়েই তার কোন্ বিকল্প কতবার হবে সেটির ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। লুডুর মত খেলা, লটারির বা জুয়ার মত অনিশ্চিত ব্যাপারে এই

ধারণাটি বেশ কাজে লেগে যায়। তবে আরো বড় কথা— এটি গণিতের ক্ষেত্রেও একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

গণিত থেকে আসা সম্ভাবনার এই চিরায়ত ধারণা নির্ভর করে বিকল্পগুলোর মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব থাকবেনা এই নীতির ওপর, যাকে বলা যায় প্রতিসাম্যের নীতি। সত্যিকার ঘটনা ঘটার সময় এক একটি বিকল্প কতবার করে পুনরাবৃত্ত হয়েছে— (ফ্রিকোয়েন্সি) সেই ব্যাপারটি এখানে আসেনা। এই সত্যিকার ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেই, এই সম্ভাবনা সেই ফ্রিকোয়েন্সির ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই অজ্ঞতাকে পূরণ করার জন্যই যেন সম্ভাবনার ব্যবহার। কারণ এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে নানা বিকল্পের ফ্রিকোয়েন্সি জানতে অসংখ্য জিনিসের অথবা অসংখ্যবার কোন ঘটনা ঘটার খবর নিতে হয়, যেটি করতে পারা অসম্ভব। কিন্তু নানা বিকল্পের মধ্যে প্রতিসাম্য থাকলে সেটি না করেও সেই অসংখ্যবারের মধ্যে কোন্ বিকল্প কতবার ঘটবে তা বলে দেয়া যায় সম্ভব। যেমন এক লক্ষবার মুদ্রা ছুঁড়লে কতবার হেড পড়বে, তা।

কিন্তু চিরায়ত জগতে সম্ভাবনাকে আরো এক ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এটি হলো সত্যিকার ঘটনা অন্তত বেশ কিছুবার ঘটার অভিজ্ঞতা থেকে তার বিভিন্ন বিকল্প সত্যি সত্যি কতবার করে ঘটেছে তা লক্ষ্য করে। একটি বিশেষ বিকল্প মোট ঘটনার সংখ্যার যত ভগ্নাংশে ঘটেছে সেটিই ওই বিকল্পের সম্ভাবনা। স্পষ্টত সম্ভাবনার এই সংজ্ঞাটি বিভিন্ন বিকল্পের ফ্রিকোয়েন্সির ওপর নির্ভর করে, যা কিনা অভিজ্ঞতা থেকেই আসে। ধরা যাক গত দশটি ঘোড়দৌড়ে তিনটি ঘোড়ার মধ্যে একটি জিতেছে ৭ বার, একটি ২ বার আর একটি ১ বার। তাহলে এই সংজ্ঞা অনুযায়ী পরের বার প্রথমটির জেতার সম্ভাবনা $\frac{৭}{১০}$, দ্বিতীয়টির $\frac{২}{১০}$, এবং তৃতীয়টির $\frac{১}{১০}$। স্বাভাবিক ভাবে প্রথমটির ওপরেই বেশির ভাগ লোক বাজি ধরবে। আসলেও যে কোন বাজি ধরার ক্ষেত্রে মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া এই সম্ভাবনার কথাই জানতে চায়। তাছাড়া সত্যিকার অভিজ্ঞতা থেকে এখানে সম্ভাবনাকে পাওয়া যাচ্ছে বলে চিরায়ত বিজ্ঞানও সম্ভাবনা বল্‌তে এই ফ্রিকোয়েন্সি থেকে পাওয়া সম্ভাবনাকেই সাধারণত বোঝায়। একবার এরকম কিছু অভিজ্ঞতা থেকে সম্ভাবনাটি জানা হয়ে গেলে ভবিষ্যতের আরো অনেক বেশি সংখ্যক ঘটনার ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ না করেই সেখানে কোন্ বিকল্প কতবার ঘটবে তা আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। এখানেও তাই অজ্ঞতাকে পূরণ করার জন্যই সম্ভাবনার ব্যবহার হচ্ছে। বিজ্ঞানের একটি অনুসঙ্গ সংখ্যাতত্ত্বেও সম্ভাবনা বল্‌তে সাধারণত একেই বোঝানো হয়।

কার্যক্ষেত্রে এই ভাবে নেয়া সম্ভাবনাটি বেশ উপযোগী হলেও এর কিছু সমালোচনা রয়েছে যেগুলো মনে রাখা প্রয়োজন। যেমন একটি থার্মোমিটারে স্কেলে দাগ কাটায় যদি ভুল থাকে তা হলে যতবার এটি দিয়ে উত্তাপ মাপা হয়ে এতবারই ভুল হবে। আমরা ভুল ফ্রিকোয়েন্সি পাব এবং তার থেকে বের করা সম্ভাবনাটিও ভুল হবে। তেমনি একটি মুদ্রা যদি ১০ বার ছুঁড়ে ৯ বারই হেড পাই, তা হলে স্পষ্টত এর হেড পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি থেকে হিসেব করা সম্ভাবনা ভুল হবে। আর কিছু সমস্যা হতে পারে যা সম্ভাবনার এই সংজ্ঞার মধ্যেই নিহিত। যেমন যে ঘটনা কোন বিকল্পেই এখনো ঘটেইনি তার নানা বিকল্পের সম্ভাবনাও জানা যাবেনা, উদাহরণ স্বরূপ যে মুদ্রা এখনো ছোঁড়াই হয়নি তার হেড পড়ার সম্ভাবনা জানবো কী ভাবে? যে সব বিকল্প একবারের বেশি ঘটার উপায় নেই, অর্থাৎ পুনরাবৃত্তির (ফ্রিকোয়েন্সির) সুযোগ নেই, তার সম্ভাবনাও বা কেমন করে জানবো। যেমন নিউক্লিয়ার চুল্লীতে ইউরেনিয়ামের অসংখ্য নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে কোন একটির একবারই শুধু ফিশন প্রক্রিয়ায় দুই টুকরা হয়ে শক্তি দেবার কথা। কোন নির্দিষ্ট সময়ে সেই নিউক্লিয়াসে এটি ঘটার সম্ভাবনা কী ভাবে নির্ণয় করবো? আর কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে সম্ভাবনা হয় শূন্য নয় এক হতে বাধ্য, অন্য কিছু নয়। যেমন কম্পিউটার মেমোরির একটি বিট হয় এক বা শূন্য হতে বাধ্য। সম্ভাবনা শুধু এই দুইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেখা যায় যে এই শেষের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলো চিরায়ত বিজ্ঞানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কোয়ান্টাম বিজ্ঞানে কিন্তু সম্ভাবনা ব্যাপারটির জটিলতার ব্যাপ্তি বেশি, সেখানে সমস্যা হতে পারে, এবং সম্ভাবনাকে অন্য ভাবে দেখতে হয়। যেমন সাধারণ কম্পিউটারের মেমোরির ব্যাপারটিই এমন যে এটি শূন্য বা এক এই দুয়ের একটিই হবে। কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটারে শূন্য ও এক এর মাঝে মেমোরির আরো বিভিন্ন সম্ভাবনা থাকে। তবে যতক্ষণ আমরা চিরায়ত জগতে আছি ততক্ষণ সম্ভাবনার এই ফ্রিকোয়েন্সি সংজ্ঞাটি দিয়ে চমৎকার কাজ চলে। চিরায়ত বিজ্ঞানে এমনি সম্ভাবনাগুলোকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সম্ভাবনার অংক — নানা সম্ভাবনার মধ্যে যোগ, গুণ ইত্যাদি। যেমন কোন ঘটনার A বিকল্পটি ঘটার সম্ভাবনা এবং B বিকল্পটি ঘটার সম্ভাবনা যদি আলাদা ভাবে জানা যায় তা হলে A ও B উভয়েই এক সঙ্গে ঘটার সম্ভাবনাটি ওই দুটি আলাদা সম্ভাবনাকে গুণ করেই বলতে পারে। উভয় সম্ভাবনাই দুটি ভগ্নাংশ হওয়াতে গুণফলটি স্বাভাবিক ভাবেই হবে প্রত্যেকটি থেকে অনেক ছোট। এই ভাবে সম্ভাবনার একটি বিস্তৃত পাটিগণিতই গড়ে ওঠছে।

চিরায়ত বিজ্ঞানে সম্ভাবনাকে নিয়ে একটি তত্ত্বই সৃষ্টি হয়েছে যা কিনা একটি গাণিতিক তত্ত্ব। সম্ভাবনা কী ভাবে আমাদেরকে সত্যিকার বাস্তব ফলের দিকে নিয়ে যায়, কী ভাবে এর ওপর আমাদের আস্থার সৃষ্টি হয়, সেসব বিষয়

নিয়েই এই তত্ত্বের কারবার। বিশেষ করে যে সব ফলাফলকে আগে থেকে নিশ্চিত করা যায়না সেগুলো ইতস্তত ভাবে ঘটা দৈবাৎ ঘটনার ফল হওয়ার কারণে সম্ভাবনার তত্ত্ব সেগুলো সম্পর্কেও বেশ কিছু কথা বল্‌তে পারে। আগে ঘটা বিভিন্ন ফলের ফ্রিকোয়েন্সির ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি ফলের ওপর একটি সম্ভাবনার মান আরোপ করা হয়। এই তত্ত্ব চেষ্টা করে নানা ফলের এই সম্ভাবনার মানগুলো কী ভাবে বন্টিত থাকে তার একটি চিত্র দিতে। উদাহরণ স্বরূপ অনেক সংখ্যায় যখন এই ফলগুলো আসে তখন কোন্ ফলটির সম্ভাবনার মানের গড় ফ্রিকোয়েন্সি কত বেশি পাওয়া যাবে সে লেখচিত্রটি একটি ঘন্টার আকৃতি ধারণ করে— মাঝখানটায় সব চেয়ে উঁচু হয়ে একটি মসৃণ শীর্ষের মত, আর দুপাশ ক্রমাগত নিচে নেমে আসে, প্রথম দিকে খুব দ্রুত, কিনারার দিকে ধীরে নেমে শূন্যের কোঠায়। যেমন কোন পরীক্ষায় ছাত্রসংখ্যা যদি যথেষ্ট বড় হয় পরীক্ষা নেবার আগেই আমরা এরকম একটি ঘন্টা-আকৃতির চিত্র থেকে বুঝতে পারি মাঝামাঝি নম্বর পাওয়া ছাত্রের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি হবে, এর থেকে যতই কম নম্বর পাওয়া ছাত্রের কথা উঠবে তাদের সংখ্যা ততই কমে যাবে, আবার ওই মাঝামাঝির চেয়ে যত বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রের কথা উঠবে তাদের সংখ্যাও একইভাবে কমে যাবে। এ চিত্রের মাঝখানটা কত উঁচু, কিনারা কী ভাবে নিচু হয়ে এসেছে তার হদিশ আসছে— আগের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া সম্ভাবনা মানের বন্টন থেকে। এই বন্টনই বলে দিচ্ছে যে পরীক্ষা এখনো নেয়া হয়নি, তার ফলাফলের বন্টনও কী হবে বলে আশা করা যায়। এরকম ঘন্টা আকৃতির বন্টনকে বলা যায় স্বাভাবিক বন্টন, ছাত্রদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বিজ্ঞানের নানা ঘটনার এমনি স্বাভাবিক বন্টন আশা করা যায়।

এ ধরণের বন্টন-চিত্রের ওপর নির্ভর করেই সংখ্যাতাত্ত্বিক গতিবিদ্যা নামের চিরায়ত বিজ্ঞানে আমরা অসংখ্য অণু নিয়ে গড়া সিস্টেমেও অণুগুলোর অবস্থান, ভরবেগ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। অথচ একটি একটি করে এই অসংখ্য অণুর ক্ষেত্রে এসব জিনিস পরিমাপ করতে হলে তা একেবারেই সম্ভব হতো না। অজ্ঞতা সত্ত্বেও জ্ঞান লাভের এই উপায় বাতলিয়ে দিয়েছে চিরায়ত সম্ভাবনা তত্ত্ব। এর ওপর চমৎকার কাজ করেছেন ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। তিনি গ্যাসের গতীয় তত্ত্বে গ্যাস অণুগুলোর আচরণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটি বদ্ধ পাত্রে রাখা গ্যাসের অণুগুলো নিত্য ইতস্তত ছোটাছুটি করছে। যেভাবে এলোমেলো ভাবে সব সময় অণুগুলোর মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হচ্ছে, কিছু অণুগুলো পাত্রের দেয়ালের ওপর এসে আঘাত করে সেখানে চাপের সৃষ্টি করছে। উত্তাপ বাড়লে অণুর ছোটাছুটি বাড়ে বলে চাপও বাড়ে। প্রত্যেকটি অণুর গতি ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেও যাতে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় সে জন্য ম্যাক্সওয়েল অণুর গতির সম্ভাবনা-

বন্টন চিত্র পেতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি অণুর গতি সম্পর্কে যৌক্তিক কিছু অনুমানের সাহায্য নিয়েছেন। অণুগুলোকে ধরে নেয়া যায় ক্ষুদ্র স্থিতিস্থাপক গোলকের মত। এদের প্রত্যেকটির আকার পরস্পর থেকে গড় দূরত্বের তুলনায় অনেক ছোট। অণুগুলোর পরস্পরের মধ্যে যখন ঠোকাঠুকি হয়, তখন সংঘর্ষের আগে ও পরে উভয়ের মোট শক্তি সমান থাকে। পর পর দুটি সংঘর্ষের মাঝখানে অণুটি সরল রেখায় সমবেগে চল্‌তে থাকে এবং এ সময় অন্য কোন অণুর সঙ্গে তাদের বিক্রিয়া ঘটেনা। আর একটি অনুমান মত শুরুতে একেবারে ইতস্তত ভাবেই সব গতি শুরু হয়, তারপর উল্লিখিত ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। এই একেবারে শেষের অনুমানটিই সব চেয়ে চম্‌কে দেবার মত, কারণ ওটি এমনিতে চট্ করে মনে হবার নয়; ম্যাক্সওয়েলের অন্তর্দৃষ্টিতেই এটি ধরা পড়েছে। আর এরকম ইতস্তত গতির কোন পক্ষপাতিত্ব না থাকার কারণেই একে সম্ভাবনা তত্ত্বের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

যদিও এতো অসংখ্য অণুর গতি হিসেব করে বের করা সম্ভব নয়, কিন্তু বিজ্ঞানী জানেন যে এর প্রত্যেকটি নিখুঁতভাবে নিউটনের গতি তত্ত্ব অনুযায়ীই গতিমান রয়েছে। যদি ওই তত্ত্ব দিয়ে প্রত্যেকটির হিসেব করতে পারতাম তাহলে সম্ভাবনার বিষয়টির প্রয়োজনই হতো না। এখানে সম্ভাবনা এসেছে নিউটনীয় তত্ত্বের কোন কারণে নয়, বরং ওই তত্ত্ব ব্যবহার না করতে পারায় আমাদের অজ্ঞতার জন্য। কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাবনা কিন্তু এরকম অজ্ঞতার কারণে আসেনা, স্বয়ং ওই তত্ত্বের বৈশিষ্টের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই আসে। সে যাই হোক ম্যাক্সওয়েলের এই চিরায়ত জগতের অণুর সমাবেশের ক্ষেত্রে নিউটনীয় তত্ত্ব ব্যবহার করেই তিনি নির্ণয় করেছেন যে ওই সমাবেশের (গ্যাসের) উত্তাপ সব অণুর গড় বেগের বর্গ। ওপরের সব ক'টি অনুমানের সঙ্গে এটি মিশিয়ে একটি বিশেষ উত্তাপে অণুগুলোর গতির সম্ভাবনার বন্টন চিত্র তিনি খাড়া করতে পেরেছিলেন। একটি বিশেষ বেগে চলা অণুর কথা যদি ভাবি তা হলে এমন অণু এই সমাবেশের কত ভগ্নাংশ হবে তাই এই বন্টন-চিত্র দিতে পারছে। অর্থাৎ ইতস্তত যে কোন একটি অণু বেছে নিলে তার একটি বিশেষ বেগ হবার সম্ভাবনা এর থেকে পাওয়া যাবে। এই বন্টন-চিত্রটি 'ম্যাক্সওয়েল বন্টন-চিত্র' নামে বিখ্যাত। প্রত্যেকটি অণুর হিসেব করতে না পারা সত্ত্বেও এই চিত্র থেকে কোটি কোটি অণুর এই সমাবেশের উত্তাপ, চাপ, আয়তন ইত্যাদি সম্পর্কে অনেকখানি জ্ঞান লাভ এই সম্ভাবনার বন্টন-চিত্র থেকে সম্ভব হয়েছে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বেও প্রায় একই রকমের বন্টন-চিত্র রয়েছে। কিন্তু সেখানে সম্ভাবনার অর্থ ভিন্ন, তাই এর গণিত ও তার ব্যাখ্যা ঠিক চিরায়ত বিজ্ঞানের মত নয়। এখানে যাদের সমাবেশের বন্টন দেয়া হয় সেগুলো কণিকাও বটে, তরঙ্গও বটে— তাই চিরায়ত বিজ্ঞানের সঙ্গে বেশ কিছু ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও

কোয়ান্টাম জগতে সম্ভাবনার ভূমিকাকে আলাদা ভাবে দেখতে হয়। আর ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি প্রতিটি অণুর গতিবিধি সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য এই সম্ভাবনার আশ্রয় নিতে হয়নি, বরং ওরকম অণুর কোন হিসেব 'সম্ভাবনা' ছাড়া করা নীতিগতভাবেও সম্ভব নয় বলেই ওটি এসেছে।

'কোয়ান্টাম অবস্থা' নির্ণয়টিই প্রকৃতির উদ্ঘাটন

কোয়ান্টাম জগতের এক একটি জিনিস তার 'কোয়ান্টাম অবস্থার' মাধ্যমেই আমাদের কাছে ধরা দেয়। কাজেই একটি সিস্টেমের মধ্যে থাকা জিনিসের 'অবস্থা' বলতে কী বোঝায় তা জানা দরকার। অবস্থাটি প্রকাশিত হয় এর অবস্থান, ভরবেগ ইত্যাদি নানা গুণের যে সব নানা বিকল্প মান রয়েছে নিজ নিজ 'সম্ভাবনা' অনুযায়ী তার প্রত্যেকটির গুরুত্বের একটি মিশ্রণ হিসেবে। চিরায়ত অর্থে যে সম্ভাবনা আগে আমরা দেখেছি এই কোয়ান্টাম সম্ভাবনা ঠিক তা নয়। এটি আসলে একটি গাণিতিক মান। শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিচিত চিরায়ত সম্ভাবনার নিরিখে তার ফলাফলকে ব্যাখ্যা করা হয় বলে একে আমরা সম্ভাবনা বল্‌ছি— আরো স্পষ্ট করে বল্‌লে বলতে হবে 'সম্ভাবনার উচ্চতা'। চিরায়ত সম্ভাবনা প্রকাশিত হয় একটি ভগ্নাংশ রূপে যার মানে দুটি গোটা সংখ্যার অনুপাত হিসেবে। যেমন মুদ্রায় হেড পড়ার সম্ভাবনা $\frac{১}{২}$। এর মানে ওই সম্ভাবনাকে সব সময় একটি সাধারণ মূলদ সংখ্যা হতে হয়, $\sqrt{2}$ ইত্যাদির মত অমূলদ হতে পারে না যাতে দশমিকের পর ইতস্তত নানা সংখ্যা এসে চলতেই থাকে, এরকম অদ্ভুত কিছু হতে পারে না। একই কারণে এটি প্রকৃত ও কাল্পনিক সংখ্যার সমন্বয়ে কম্‌প্লেক্স নাম্বারও হতে পারে না। অথচ কোয়ান্টাম জগতের যে 'সম্ভাবনার' বা সম্ভাবনার উচ্চতার কথা বলছি সেটি একেবারে আবশ্যিকভাবেই একটি কম্‌প্লেক্স নাম্বার! আমাদের চেনা চিরায়ত জগতের কোন সম্ভাবনার মান কমপ্লেক্স নাম্বার হবে এমন কথা চিন্তাই করা যায়না। কাজেই সম্ভাবনার উচ্চতা আমাদের পরিচিত সম্ভাবনা নয়। তারপরও চিরায়ত সম্ভাবনার সঙ্গে এই অদ্ভুত কোয়ান্টাম 'সম্ভাবনার' কিছু গঠনগত মিল রয়েছে বৈ কি। সেজন্য সিস্টেমের অবস্থাটি যে কী জিনিস, সে কথাও আমরা চিরায়ত জগতের থেকেই শুরু করতে পারি।

সরল উদাহরণ হিসেবে চিরায়ত জগতে কোন সিস্টেমের এমন একটি অবস্থা ধরে নিই যাতে কোন কিছু দুটি বিকল্পে থাকতে পারে— যাদেরকে আমরা A বিকল্প ও B বিকল্প বলে চিহ্নিত করি। মনে করি চিরায়ত হলেও এক্ষেত্রেও সত্যি কোন্ বিকল্পে এটি থাকবে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, শুধু বল্‌তে পারি A বিকল্পে থাকার সম্ভাবনা p (যা কিনা একটি স্বাভাবিক ভগ্নাংশ),

আর B বিকল্পে থাকার সম্ভাবনা q (এটিও অন্য একটি ভগ্নাংশ)। p এর সর্বোচ্চ মান হতে পারে 1 (তাহলে প্রায় নিশ্চিত যে A বিকল্পেই জিনিসটি আছে) আর সর্বনিম্ন শূন্য (প্রায় নিশ্চিত যে A বিকল্পে এটি নেই) । q এর ক্ষেত্রেও তাই।

সাধারণত অবশ্য p ও q দুটিই ভগ্নাংশ হবে যা যোগ করলে পাব 1। যেহেতু A হিসেবে থাকার ও B হিসেবে থাকার উভয় পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে কাজেই অবস্থার বর্ণনাটি হবে একটি মিশ্র রাশি— A ও B এর যোগফল, তবে A'র গুরুত্ব এই মিশ্রণে কতখানি তা বুঝাতে Aকে p দিয়ে গুণ করে নিতে হবে, এবং B'র গুরুত্ব কতখানি তা বুঝাতে B কে q দিয়ে গুণ করে নিতে হবে। এভাবে অবস্থা বর্ণনার রূপটি দাঁড়াবে pA+ qB। বর্ণনা না হয় এরকম হলো কিন্তু তার থেকে বাস্তব ফল লাভের উপায় কী? যেহেতু এখানে সব কিছু চিরায়ত জগতের বিষয়, p এবং q আমাদের পরিচিত চিরায়ত সম্ভাবনা, কাজেই সেই সম্ভাবনার সংজ্ঞাই সব কিছু ঠিক করে দেবে। এটি বোঝার জন্য মনে করি p এর মান $\frac{3}{4}$ অর্থাৎ জিনিসটি A হিসেবে থাকার সম্ভাবনা তিন চতুর্থাংশ, এবং q এর মান $\frac{1}{4}$ অর্থাৎ B হিসেবে থাকার সম্ভাবনা এক চতুর্থাংশ। এর মানে যদি ১০০ বার জিনিসটি পরিমাপ করতাম তাহলে A হিসেবে একে পেতাম প্রায় ৭৫ বার আর B হিসেবে একে পেতাম প্রায় ২৫ বার। জিনিসটির অবস্থা pA+ qB, এই কথাটি দিয়ে এটিই বোঝা যাচ্ছে।

কোয়ান্টাম জগতের কোন সিস্টেমের 'অবস্থা'ও প্রথম দৃষ্টিতে এরকমই মনে হবে। এই জগতের নিয়মই হলো এতে কোন জিনিসকে নির্দিষ্ট এক জায়গায়, বা এক ভরবেগে (এবং সেই সুবাদে এক শক্তিতে, এক উত্তাপে ইত্যাদিতে) পাওয়া যায়না, এদের বিভিন্ন সম্ভাবনার মিশ্রণ হিসেবে পাওয়া যায়। ধরা যাক এক্ষেত্রেও Aও B এই দুই বিকল্পের মিশ্রণ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। এখানেও মিশ্রণে A'র গুরুত্ব কতখানি তা বোঝাতে A' এর সম্ভাবনার মত একটি মান ব্যবহার করা হয় যাকে বলা হয় 'সম্ভাবনার উচ্চতা'। এটি যে ঠিক চিরায়ত সম্ভাবনা নয় তা বোঝাতে এই ভিন্ন নামে ডাকা, আর সেজন্যই এর চিহ্ন হিসেবে p ব্যবহার না করে করলাম ধরা যাক্ w। A'র সম্ভাবনার উচ্চতা হলো w এবং B'র সম্ভাবনার উচ্চতা z যা B'র গুরুত্ব কতখানি তা বলে দেয়। তা হলে ওই চিরায়ত জগতের ধারা অনুসরণ করে কোয়ান্টাম অবস্থাটি wA+zB, এই কথাটি দিয়ে বর্ণনা করতে পারি। এখানে চিরায়ত জগতের থেকে একটি বিরাট পার্থক্য হলো w এবং z কোন স্বাভাবিক ভগ্নাংশ নয় বরং এরা প্রত্যেকে একটি কম্প্লেক্স নাম্বার। যেই কম্প্লেক্স নাম্বারের বাস্তব

কোন অর্থ দেয়া দুরূহ তাকেই এখন কোয়ান্টাম জগতের সিস্টেমের বর্ণনায় সম্ভাবনার উচ্চতা হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

সাধারণত একটি কোয়ান্টাম অবস্থা শুধু A ও B নয় বরং তাদের মত আরো অনেক বিকল্পের মিশ্রণ হিসেবে আসে। কিন্তু ধরা যাক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ঠিক দুটি বিকল্পের মিশ্রণই এটি। যেমন দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টে একটি ইলেকট্রনের A নামক ফাটলে থাকাটিই A বিকল্প এবং B নামক ফাটলে থাকাটি B বিকল্প। A তে থাকার সম্ভাবনার উচ্চতা w এবং B তে থাকার সম্ভাবনার উচ্চতা z। কাজেই যেহেতু কোয়ান্টাম জগতে ইলেকট্রনটি একই সঙ্গে A ও B উভয় ফাটল দিয়ে যায় (একই সঙ্গে দুই ফাটলে অবস্থান) তাহলে এর অবস্থা ওই wA+zB মিশ্রণটি দিয়ে বর্ণিত হবে। একে দেখতে ওই চিরায়ত pA+qB এর মত দেখালেও এর অর্থ কিন্তু ভিন্ন। এতে A তে থাকার অবস্থা ও B তে থাকার অবস্থা উভয়টির মধ্যে এক রকম উপরিপাতন ঘটছে—তাই বাহ্যিক ভাবে তুলনীয় হলেও কোয়ান্টাম অবস্থা চিরায়ত জগতের অবস্থার মত নয়। ওই উপরিপাতিত অবস্থাটি শুধু কোয়ান্টাম জগতেরই বৈশিষ্ট। এ সময় যদি আমরা A ফাটলের কাছে এমন একটি ইলেকট্রন উদ্ঘাটক যন্ত্র বসাতে পারতাম যা ওখানে ইলেকট্রন কণিকা যাওয়া মাত্রই আমাদেরকে ক্লিক শব্দ করে জানিয়ে দিত তাহলে ইলেকট্রন A ফাটল দিয়ে গেল কিনা জানতে পারতাম। ইলেকট্রন যদি চিরায়ত জগতের জিনিস হতো তা হলে A ফাটলে গেলে ইলেকট্রনকে এভাবে ঠিকই পাব। পর্দায় ইলেকট্রনকে একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে পাব, ইন্টারফেরেন্স ঝালর ইত্যাদি থাকবেনা। অবশ্য কোয়ান্টাম জগতের ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এমনটি কখনো হবেনা, আমরা এক জায়গায় ইলেকট্রনকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবোনা। চিরায়ত জগতে একটি কণিকার খবর আমরা পাই সুনির্দিষ্ট একটি বিন্দুতে তার অবস্থান থেকে। এরপর এটি কোন্ বিন্দুতে যাবে সেই খবর পাই এর ভরবেগ থেকে। কোয়ান্টাম জগতে কণিকার অবস্থান একই সঙ্গে নানা বিন্দুতে থাকে, এই প্রত্যেক বিন্দুই অবস্থানের এক একটি বিকল্প। কাজেই সাধারণত wA+zB ধরণের রাশিতে এ রকম আরো অনেক বিকল্প যোগ হয়।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের একজন প্রধান সৃষ্টিকার শ্রোয়েডিঙ্গার এভাবে প্রত্যেক বিন্দুতে কণিকাটি থাকার সম্ভাবনা উচ্চতা দিয়ে সেই বিন্দুর কণিকা-অবস্থান সংক্রান্ত অবস্থাটি বর্ণনা করেন। এরকম সব বিন্দুর অবস্থার সমষ্টিকে পুরো সিস্টেমটির (এ ক্ষেত্রে কণিকাটির) সামগ্রিক অবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তিনি এই সামগ্রিক অবস্থাকে দেখেছেন একটি গাণিতিক ফাংশান হিসেবে স্থানের বিভিন্ন বিন্দুর স্থানাঙ্কের একটি ফাংশান, এর নাম দিয়েছেন ওয়েভ ফাংশান (তরঙ্গ-ফাংশান); আর একে যে চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করেছেন তা হলো গ্রীক বর্ণ 'সাই'। একে তাই সাই ফাংশানও বলা হয়। ফাংশানটিকে

লেখচিত্রে জ্যামিতিক চিত্র হিসেবে দেখা যায়। তিন মাত্রার স্থানে এটি বেশ জটিল বলে বোঝার সুবিধার জন্য আপাতত একে শুধু এক মাত্রার ফাংশান হিসেবে চিন্তা করা যায়। সেক্ষেত্রে একই অক্ষরেখার নানা বিন্দুর ওপরে নিচে সম্ভাবনার উচ্চতা w, z ইত্যাদি অনুযায়ী ওঠানামা করা একটি রেখাই তখন এই সাইয়ের প্রতিনিধিত্ব করবে। কণিকার অবস্থানের কোয়ান্টাম অবস্থার এটিই ছবি। তবে ওই রেখার ছবিটি খুব সাদাসিদা কিছু হবেনা, কারণ মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক বিন্দুতে সম্ভাবনার উচ্চতা কোন সাধারণ সংখ্যা নয়, এটি একটি কমপ্লেক্স নাম্বার। কমপ্লেক্স নাম্বারকেও অবশ্য জ্যামিতিক ভাবে দেখানো যায়— সেটিই ছবিটিকে বেশ খানিকটা জটিল করে তুলবে। তাছাড়া এক মাত্রার বদলে তিন মাত্রায় নিলে ছবিটি যে তখন একটি রেখা মাত্র থাকবেনা, অনেক জটিল যে হবে তা বলাই বাহুল্য। তা জ্যামিতিক ছবি জটিল হলে ক্ষতি নেই, শ্রোয়েডিঙ্গার এমন একটি সমীকরণ দিতে পেরেছিলেন যা সিস্টেমের শক্তি সংক্রান্ত জানা প্রকৃতি থেকে দাঁড় করানো যায় এবং যার সমাধান করে ওই সাই ফাংশান নির্ণয় করা যায়। আর সাই ফাংশানেই তো সিস্টেমের অবস্থা বেরিয়ে আসে।

এখন যদি বলি কণিকাটি কোথায় রয়েছে, তার উত্তরে চিরায়ত জগতের মত একটি বিন্দু নির্দেশ করে বলতে পারবোনা যে এই বিন্দুতে। বরং তখন ফাংশানের পুরো জটিল ছবিটাই দেখিয়ে অথবা গাণিতিক ফাংশানটি দেখিয়ে বলতে হবে এটিই এর অবস্থানের অবস্থা-চিত্র। কিন্তু এটি জানার ফলে আমরা কণিকার অবস্থানের বাস্তবতা সম্পর্কে কী জানলাম? বাস্তবতা বলতে বোঝায় সত্যি সত্যি যদি কোন বিন্দুতে ওই কণিকার অবস্থান মাপতে পারি তাহলে মেপে কী পাব সেইটি। সেই বাস্তবতা খুব সোজাসাপ্টা, কোন জটিলতা নেই। হয় কণিকাটি সেই বিন্দুতে থাকবে অথবা থাকবেনা। যেই মুহূর্তে সেটি জানতে পারলাম তখন সেটি আর কোয়ান্টাম জগতের ব্যাপার থাকবেনা, চিরায়ত জগতের ব্যাপারে পরিণত হবে। ওই বিন্দুতে সম্ভাবনা উচ্চতার যে মান তার সঙ্গে এই বাস্তব জানার সম্পর্ক কী? একথার সহজ উত্তর নেই। শ্রোয়েডিঙ্গার মনে করেছিলেন যে সম্পর্কটি এমন হবে যে এই সম্ভাবনার উচ্চতার মান থেকেই চিরায়ত জগতের মতই সুনির্দিষ্ট অবস্থান কোন ভাবে পাওয়া যাবে। কিন্তু অন্য বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছে যে তা সম্ভব নয়। এর থেকে শুধু আমাদের পরিচিত সম্ভাবনার নিরিখেই বাস্তবতাটি পাওয়া যায়। তাই যেই উত্তরটি শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে তা হলো এই বিন্দুতে অবস্থানের যে সম্ভাবনার উচ্চতা তার বর্গ করলেই আমরা ওখানে কণিকাটির অবস্থানের ভবিষ্যদ্বাণী পাব। যেহেতু সম্ভাবনা উচ্চতা একটি কমপ্লেক্স নাম্বার তাই আসলে বর্গ করতে হবে তার পরম মানটির যা নিজে কিন্তু সাধারণ সংখ্যা। এর বর্গটি ওই বিন্দুতে

কণিকাটির অবস্থানের চিরায়ত সম্ভাবনাটি দেবে। যেমন এটি যদি $\frac{১}{৪}$ হয় তা হলে ১০০ বার ওই বিন্দুতে কণিকাটির অবস্থান মাপলে ২৫ বার সেটি ওখানে পাব।

এটি গেলো একটি বিশেষ বিন্দুতে কোয়ান্টাম অবস্থার বাস্তব রূপ। কিন্তু যদি পুরো সিস্টেমের কোয়ান্টাম অবস্থার বাস্তব রূপ জানতে চাই, অর্থাৎ সমগ্র সাই ফাংশানের বাস্তব মানে জানতে চাই? তখনো একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। সামগ্রিক ভাবে সাই যা দাঁড়ায় তার পরম মানের বর্গই এই বাস্তবতা দেবে। কিন্তু এর মধ্যে কিছু জটিলতা আছে। যদি আমরা ওই A ও B এর মত মাত্র দুটি বিকল্পই আছে বলে বিবেচনা করি তা হলে সাই এর সামগ্রিক প্রকাশ হবে এদের দুটি সম্ভাবনা উচ্চতা w এবং z এর সমষ্টি w+z। কমপ্লেক্স রাশির নিয়ম অনুযায়ী w+z এর পরম মানের বর্গ নিলে তাতে আলাদা আলাদা ভাবে w এর পরম মানের বর্গ এবং z এর পরম মানের বর্গের সমষ্টি তো পাবই, তার সঙ্গে একটি অতিরিক্ত রাশিও যোগ হবে যা কিনা w এবং z এর একটি মিশ্রণ— পরিস্থিতি ভেদে যার বিভিন্ন মান হয়। এই শেষের রাশিটি A ও B বিকল্পের একটি অদ্ভুত উপরিপাতন বা মিশ্রণ বাস্তব ফলাফলের মধ্যেও রেখে দেয়, যা পরিস্থিতি অনুযায়ী বড় ছোট হতে পারে, ঋণাত্মকও হতে পারে, শূন্যও হতে পারে। এই শেষের মিশ্র রাশিটিই সামগ্রিক সিস্টেমের বাস্তবতাকে কোয়ান্টাম রূপ দেয়। শুধু A ও B বিকল্প না হয়ে অনেক বিকল্প থাকলেও একই ভাবে মিশ্র রাশি থাকবেই।

এই মিশ্র রাশিটি সাই এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিকল্পের পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়ায় সৃষ্ট, চিরায়ত জগতে যা নেই। যাবতীয় কোয়ান্টাম আচরণের সৃষ্টি এতেই। যেমন দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টে ইলেকট্রন একই সঙ্গে দুই ফাটলের ভেতর দিয়ে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। তার ফলে পর্দার ওপর কোথাও তার জোরালো অবস্থান থাকে, কোথাও তা নিষ্প্রভ হয়ে যায়, তাই ওভাবেই সৃষ্টি হয় ইন্টারফেরেন্স ঝালর। মিশ্র রাশিটির নানা মানের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত। কিন্তু ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র এবং সরল কণিকা না হয়ে জিনিসটি যদি হতো একটি ক্রিকেট বলের মত বড় ও জটিল, তাহলে এই মিশ্র রাশিটি এত বড় জিনিসের ক্ষেত্রে অসংখ্যবার আসবে এবং গাণিতিক নিয়মে ওই মিশ্র রাশিটি গড়পড়তায় গিয়ে শূন্য হয়ে পড়বে। কাজেই ক্রিকেট বলের সাই এর বাস্তব প্রকাশের মধ্যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারী মিশ্র রাশি অবশিষ্ট থাকে না, এর সবটাই তাই চিরায়ত জগতের, সব বড় জিনিসের ক্ষেত্রেই তাই। বড় জিনিস কেন যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অধীন নয়, এটি তার একটি কারণ।

বোঝা গেল যে যে কোন কোয়ান্টাম সিস্টেমের অবস্থানের অবস্থা জানার উপায় হলো এর সাই ফাংশানটি জানা। শ্রোয়েডিঙ্গার এটি গাণিতিক ভাবে নির্ণয়ের উপায়টিও দিয়ে গেছেন। যে কোন ক্ষুদ্র জিনিসের তরঙ্গ রূপ আর কণিকা রূপের যে সম্পর্ক— যেমন তার তরঙ্গ-দৈর্ঘের (তরঙ্গ রূপ) সঙ্গে ভরবেগের (কণিকা রূপ) যে সম্পর্ক ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সেটিকে অনুসরণ করে এবং সিস্টেমের শক্তির গাণিতিক রূপটি জানা থাকলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁর সেই বিখ্যাত সমীকরণ দিতে পারলেন যার সমাধান করে সাই ফাংশান অর্থাৎ সাই তরঙ্গ পাওয়া যায়। আর আমরা দেখেছি সাই তরঙ্গের ধারণাটি শ্রোয়েডিঙ্গার এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে কোয়ান্টাম অবস্থার সবকিছু এতেই পাওয়া যায়। এই সমীকরণ এখন কোয়ান্টাম তত্ত্বের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। এই সমীকরণ সমাধান করে সাই ফাংশানটি পাওয়া গেলে তার থেকে ওই সম্ভাবনার হিসেবে সব বাস্তব ফলাফলও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

স্থানের বিভিন্ন বিন্দুতে কণিকার অবস্থানের সম্ভাবনা উচ্চতা দেয়া সাই তরঙ্গের চিত্রটি পেতে আমরা দেখেছি। অবস্থানের সঙ্গে আর যে জিনিসটি জানা দরকার তা হলো ভরবেগ। ওই সাই তরঙ্গ থেকেই ভরবেগের নানা বিকল্পগুলোও নির্ণয় করা যায়। গণিতবিদ ফুরিয়ারের একটি বিখ্যাত পদ্ধতিতে যে কোন গাণিতিক ফাংশানকে অসংখ্য নিয়মিত তরঙ্গরূপ ফাংশানের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করা যায়। পদ্ধতিটিকে বলা হয় হারমোনিক বিশ্লেষণ। আগের মত শুধু এক মাত্রায় দেখলে এর একটি সুন্দর উপমা পাই তার দিয়ে গড়া বাদ্য যন্ত্রে। এতে টান টান করে রাখা তারে টোকা দিলে আমরা তারকে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘের তরঙ্গ তুলে কাঁপতে দেখি। এর থেকে সৃষ্ট সঙ্গীতের শব্দের তরঙ্গটি এই সব বিভিন্ন তরঙ্গের সম্মিলিত ফল। এই সঙ্গীত তরঙ্গ বিশ্লেষণ করলে আমরা বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘের বিশুদ্ধ তরঙ্গগুলো পাব যাদেরকে বলা হয় এক একটি হার্মোনিক। এর মধ্যে পুরো তার এক সঙ্গে কাঁপে যে তরঙ্গে তাকে বলা যায় প্রথম হার্মোনিক, দুই ভাগ হয়ে যে তরঙ্গে কাঁপে তাকে বলা যায় দ্বিতীয় হার্মোনিক— এমনি ভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি হার্মোনিক। দেখা যায় যে সাই এর ক্ষেত্রে এরকম হার্মোনিকগুলো ওই সিস্টেমের ভরবেগের বিভিন্ন বিকল্পগুলো দিয়ে থাকে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হার্মোনিককে ১,২,৩ ইত্যাদি পরপর পূর্ণ সংখ্যার দ্বারা সূচিত করা যায় যাদেরকে বলা হয় কোয়ান্টাম নাম্বার। এরকম বিভিন্ন কোয়ান্টাম নম্বরের বর্গকে ওই কোয়ান্টাম নম্বরধারী অবস্থার শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়। অন্যরকম কিছু কোয়ান্টাম নম্বরকে কৌণিক ভরবেগ ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়। বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এই সব ক্ষেত্রে এক মাত্রিক স্থান ব্যবহার করেছি বটে, কিন্তু এক মাত্রায় সীমাবদ্ধ থাকার কোন কারণ নেই। দ্বিমাত্রিক স্থানে নিলে বাদ্য যন্ত্রের

উপমাটি নিতাম তবলার উপরিতল হিসেবে যেখানে চাঁটি দিলে চামড়ায় নানা হার্মোনিকের দ্বিমাত্রিক তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। আর সাধারণ প্রকৃতিতে তো সব কিছু তিন মাত্রায় হতে পারে— অবস্থানের সাই তরঙ্গে যেমন, তেমনি ভরবেগের সাই তরঙ্গে।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা যদি এটমের দিকে তাকাই রাদারফোর্ডের সৌরজগত সদৃশ এটম মডেলে মাঝখানে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরতে দেখেছি। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে এই ইলেকট্রনকে শক্তি বিকিরণ করে শক্তি হারিয়ে এটমকে চুপসে ফেলতে হয় বলে সেই মডেল সত্যিকার এটমের বর্ণনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কোয়ান্টাম জগতের যে বর্ণনা দেখলাম তাতে ইলেকট্রন থাকবে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ব্যাপ্ত সাই তরঙ্গের এক রকম 'কুয়াশা' হিসেবে। যেখানে অবস্থানের সম্ভাবনার উচ্চতা বেশি সেখানে কুয়াশা ঘন, সেখানে ইলেকট্রনকে পাওয়া যাওয়ার 'সম্ভাবনা' বেশি। শক্তি, কৌণিক ভরবেগ ইত্যাদি সূচক কোয়ান্টাম নম্বর অনুযায়ী এই 'কুয়াশা' বিভিন্ন আকার-আকৃতির বলয়ে (অরবিটাল) বিন্যস্ত হয়ে থাকে। এই বিন্যাস শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণের সমাধান থেকে পাওয়া যায়। এটি এটমের সর্বাধুনিক কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক মডেল, যার চুপসে যাবার ভয় নেই, স্থায়ীত্ব নিয়ে কোন সমস্যা নাই। একটি ইলেকট্রন এখানে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় 'কোয়ান্টাম লাফ' বা কোয়ান্টাম উল্লম্ফন দিতে পারে। শক্তি সংক্রান্ত দুই কোয়ান্টাম নম্বরের ক্ষেত্রে এর ফলে সিস্টেমটি বেশি শক্তির অবস্থা থেকে কম শক্তির অবস্থায় চলে যাচ্ছে বলে বাড়তি শক্তিটুকু আলো রূপে বিকীর্ণ হয়ে যায়। ওই উভয় অবস্থার কোয়ান্টাম বর্ণনা থেকে আমরা হিসেব করে এই আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ নির্ণয় করতে পারি। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ বাস্তব ফলাফলের সঙ্গে সূক্ষ্ম ভাবে মিলে গিয়ে এটমের এই কোয়ান্টাম মডেলের বাস্তব যথার্থতা প্রমাণ করে। তবে একটি বিশেষ এটমে কোয়ান্টাম লাফটি কখন ঘটবে তা নিশ্চিত নয়, এটি সম্পূর্ণ চান্সের ব্যাপার, হঠাৎ হঠাৎ ঘটে। কোয়ান্টাম তত্ত্বে চান্সের ব্যাপারটি শুধু এখানেই, যারও অবশ্য সামগ্রিক হিসেবটি নিশ্চিত ভাবেই করা যায়।

কোয়ান্টাম অবস্থার গাণিতিক অনুধাবনে কোন সমস্যা নেই, তবে স্বয়ং শ্রোয়েডিঙ্গার এবং অন্যান্য আরো গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী এর বাস্তব ব্যাখ্যায় সমস্যা অনুভব করেছেন। শ্রোয়েডিঙ্গার যখন তাঁর সাই তরঙ্গ এবং শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ দিয়েছিলেন তখন মনে করেছিলেন এগুলো চিরায়ত জগতের মত সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়ার পথে এক রকম গাণিতিক কৌশল হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু সে রকম কিছু হয়নি। বরং তাঁর সাই ফাংশনের ব্যাখ্যাটি যেটি ক্রমেই প্রতিষ্ঠিত ও ফলপ্রসূ হচ্ছিল সেটি সম্ভাবনায় গড়া ফলাফলের মত— যা আমরা দেখেছি। এতে সাই এর যে অর্থ দাঁড়ায় তাতে তা একাধিক বিকল্পের

এক উপারিপাতিত মিশ্রণ হিসেবে দেখা দেয়। শ্রোয়েডিঙ্গারের কাছে একে মনে হয়েছে বাস্তবে অগ্রহণযোগ্য একটি জগাখিচুড়ি হিসেবে। তিনি বল্‌লেন একটি এটমকে এই বিকল্পেও আছে, ওই বিকল্পেও আছে এমন মিশ্র ভাবে যদি অবশ্যই ধরা দিতে হয়, তা হলে সেটি হবে তাঁর উদ্ভট একটি ব্যাপার। এই উদ্ভটতা হাস্যকর ভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি 'শ্রোয়েডিঙ্গার বেড়াল' নামে পরিচিত তাঁর বিখ্যাত প্যারাডক্সটি তৈরি করেছিলেন। এর কথা আমরা বইয়ের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছি; সংক্ষেপে কিছুটা পুনরাবৃত্তি করছি এই ব্যাপারে শ্রোয়েডিঙ্গারের আশাভঙ্গের কথা বল্‌তে।

এটি একটি কাল্পনিক পরিস্থিতি। যদিও বেড়াল, বিষের শিশি, হাতুড়ি ইত্যাদি মোটেই কোয়ান্টাম জগতের জিনিস নয়, তবুও কল্পনা করা হয়েছে যে এরা কোয়ান্টাম জগতের নিয়মেই চল্‌ছে। এখানে একটি বদ্ধ কালো বাক্সে একটি বেড়াল ও বিষ ভর্তি কাচের শিশি রাখা হয়েছে। ওর মধ্যে আলাদা ভাবে থাকা এটমে দৈবাৎ কোয়ান্টাম লাফের ঘটনা ঘটলে ওখান থেকে আসা বিকিরণ একটি হাতুড়িকে সচল করে বিষের শিশিটি ভাঙ্গবে এবং বিষ-বাষ্পে বেড়াল মারা যাবে; যদি দৈবাৎ কোয়ান্টাম লাফ আর বিকিরণ না ঘটে তা হলে বেড়াল বেঁচে থাকবে। চিরায়ত বর্ণনায় একে বল্‌বো বিড়ালটি হয় মরা রয়েছে অথবা জীবিত রয়েছে। কিন্তু যদি কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী বর্ণনা করা হয় তা হলে বলতে হবে ওই পুরো সময়টাতে বেড়ালের অবস্থা দুটি বিকল্পের সমন্বয়ে গড়া— জীবন্ত বেড়াল আর মৃত বেড়াল এই দুই অবস্থার সমন্বয়ে। তার সাই তরঙ্গ জীবিত ও মৃত বেড়ালের একটি মিশ্র অবস্থাই তুলে ধরবে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাই এর প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা এ কথাই বলে। এই ব্যাখ্যা আরো বলে যে বাক্সের ভেতর দেখে বেড়ালের অবস্থা বাস্তব পর্যবেক্ষণে যতক্ষণ না আনা হবে বেড়ালের বৈজ্ঞানিক বর্ণনাটি ঠিক এরকমই থাকবে। যে মুহূর্তে সে রকম পর্যবেক্ষণ করা হবে সেমুহূর্তে অবশ্য এই কোয়ান্টাম অবস্থার অবসান ঘটবে, সাই তরঙ্গ চুপসে যাবে, এবং চিরায়ত জগতের মতই বেড়ালকে হয় জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় দেখা যাবে, মিশ্র অবস্থায় নয়। শ্রোয়েডিঙ্গার কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যাকে হাস্যকর করে তোলার জন্য এই বেড়াল কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টার পর এতগুলো বছর কেটে গেলেও এই ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলার বদলে এই ব্যাখ্যাটিই আজকের পদার্থবিদ্যার মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বে সবকিছু এভাবে নানা বিকল্পের উপরিপাতন হিসেবেই থাকে। সেই উপরিপাতিত গাণিতিক প্রকাশ থেকেই প্রকৃতির ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আসে। এরপর যখন সত্যি সত্যি পরিমাপ করবো তখন দেখবো সম্ভাবনার হিসেবে ওই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ঠিকই ফলে গেছে। যদিও শ্রোডিঙ্গার তাঁর নিজের আবিষ্কৃত সাই ফাংশানের এমন ব্যাখ্যাতে মনোবেদনায় ভুগেছেন, আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের আর একজন প্রধান আবিষ্কারক

আইনষ্টাইন কখনোই সম্ভাবনা-ভিত্তিক এই ব্যাখ্যাকে সন্তোষজনক মনে করেননি, তারপরও এটি নিশ্চিতভাবে দেখা গেছে যে প্রকৃতির আচরণটি আসলেই এরকমই, আমাদের বোধশক্তির কাছে তা যতই চমকে ওঠার মত হোক না কেন।

অনিশ্চয়তার নিশ্চয়তা

কোয়ান্টাম তত্ত্বে কোন সিস্টেমের বর্ণনা যে ভাবে দেয়া যায় তার মধ্য থেকেই দেখানো যায় যে এতে কণিকার অবস্থানটি একেবারে সুনির্দিষ্ট ভাবে একটি জায়গায় যদি থাকে বলে মনে করতে হয় তাহলে তার ভরবেগটি প্রায় অসীম ভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে— অর্থাৎ এর ছুটাছুটি যে কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে তার কোন ইয়ত্তা নেই। আর ভরবেগটি যদি একেবারে সুনির্দিষ্ট করতে চাই তখন তার অবস্থানটি প্রায় অসীম ভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এই দুটিই অসম্ভব ব্যাপার। যা সম্ভব তা হলো অবস্থানে এবং ভরবেগে উভয় ক্ষেত্রে কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকে। এটিই কোয়ান্টাম তত্ত্বে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি নামে পরিচিত। এই নীতি বলে দেয় অবস্থানের অনিশ্চয়তা কতখানি হলে ভরবেগের অনিশ্চয়তা কতখানি হবে; এই দুই অনিশ্চয়তার গুণফল অতি ক্ষুদ্র একটি ধ্রুবক হওয়াতেই এমনটি হয়। এসব আমরা এ বইয়ের প্রথম খণ্ডে দেখেছি। এখানে আমরা দেখার চেষ্টা করবো এই অনিশ্চয়তা নীতিটি কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট থেকে কীভাবে অনিবার্য ভাবে এসে গড়ে, আর বিজ্ঞানের ওপর এই নীতিটির সামগ্রিক প্রভাবই বা কী।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল বৈশিষ্টটি এসেছে শক্তি বিকিরণকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে আসা জিনিস মনে না করে ক্ষুদ্র প্যাকেটে প্যাকেটে আসছে বলে মনে করা। এই প্যাকেটে থাকা খুব ক্ষুদ্র শক্তির পরিমাণটুকুই একটি কোয়ান্টাম। কোয়ান্টামের এই শক্তির পরিমাণ হচ্ছে ওই শক্তিবিকিরণের ফ্রিকোয়েন্সিকে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক নামক একটি অতি ক্ষুদ্র ধ্রুবক দিয়ে গুণ করে পাওয়া পরিমাণ যার জন্য h চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। এটি কী রকম অবিশ্বাস্য রকম ক্ষুদ্র পরিমাণ তা বোঝা যায় সাধারণ বৈজ্ঞানিক এককে প্রকাশ করলে এবং শুধু এক দশমিক স্থান পর্যন্ত লিখলে এর মান হলো ৬.৬× $১০^{-৩৪}$; অর্থাৎ ১ এর পর ৩৪টি শূন্য দিলে যে সংখ্যা হয় ৬.৬ এর এত ভাগের এক! তাই কাজেই বিকিরণের সচরাচর যে সব ফ্রিকোয়েন্সি হয় তাকে এই অতি ক্ষুদ্র h দিয়ে গুণ করে একটি কোয়ান্টামের যে শক্তি পাই তাও অতি অতি ক্ষুদ্র। কোয়ান্টাম তত্ত্বের অনেক বৈশিষ্টই h এর এবং কোয়ান্টামের এমন ক্ষুদ্র হবার ওপরেই নির্ভর করে।

ওপরে শক্তির কোয়ান্টামের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাতে

শক্তি = h × ফ্রিকোয়েন্সি

কোয়ান্টাম তত্ত্বে কণিকাকে তরঙ্গ হিসেবে যখন দেখা হয় সে তরঙ্গের রূপ হয়

$$\text{তরঙ্গ-দৈর্ঘ} = \frac{h}{\text{ভরবেগ}}$$ । অর্থাৎ কিনা $$\text{ভরবেগ} = \frac{h}{\text{তরঙ্গ-দৈর্ঘ}}$$

কল্পনা করি যে একটি অণুবীক্ষণ দিয়ে একটি কণিকাকে দেখ্‌ছি — এবং তাকে একটি সুনির্দিষ্ট জায়গাতেই আছে বলে দেখছি। অণুবীক্ষণে যে 'আলো' ব্যবহার করা হচ্ছে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘকে ওই কণিকার সাইজ থেকে অনেক ছোট হতে হবে। কণিকার কিনারায় আলোর যে ডিফ্রাকশানে পর পর আলো ছায়া দেখা দেবে তার কারণে ওই আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ বা তার থেকে ছোট কোন জায়গায় কণিকাটির অবস্থান নিশ্চিত করে বলা একেবারে নীতিগতভাবেই অসম্ভব। কাজেই কণিকার অবস্থানে একেবারে অবশ্যম্ভাবী যে অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে তার পরিমাণ অন্তত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘের সমান হবে। কাজেই

কণিকার অবস্থানের অনিশ্চয়তা ≈ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ

অন্যদিকে এই আলোকেও যদি তার কণিকা রূপে অর্থাৎ ফোটন রূপে নিই তাহলে কণিকাটির ভরবেগে ন্যূনতম অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে একটি মাত্র ফোটনের আঘাতে কণিকার ভরবেগের পরিবর্তনটুকু— যা ওই ফোটনের ভরবেগের সমান। ফোটনের এই ভরবেগ এই আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ থেকে হিসেব করে পাওয়া যায় $$\frac{h}{\text{তরঙ্গ-দৈর্ঘ}}$$ কাজেই

$$\text{কণিকার ভরবেগের অনিশ্চয়তা} \approx \frac{h}{\text{আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ}}$$

এভাবে উভয় অনিশ্চয়তার গুণফল হবে:

কণিকার অবস্থানের অনিশ্চয়তা × কণিকার ভরবেগের অনিশ্চয়তা ≈

$$\text{আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ} \times \frac{h}{\text{আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ}} \approx h$$

এটিই হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি, যা বল্‌ছে উভয় অনিশ্চয়তার গুণফল h ধ্রুবকটির প্রায় সমান। এখান থেকেই বোঝা যায় যে অবস্থানের বা ভরবেগের অনিশ্চয়তাকে h এর মানের থেকে খুব বেশি কমাবার উপায় নেই— এর থেকে বেশি সুনির্দিষ্ট করার উপায় নেই। যদি তা করতে যাই এবং তা এত

সুনির্দিষ্ট হয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে যায় তখন অন্যটির অনিশ্চয়তা h কে প্রায় শূন্য দিয়ে ভাগ করার মত হবে, ফলে যা প্রায় অসীমের দিকে চলে যাবে। এই অনিশ্চয়তার নীতি কোয়ান্টাম জগতের অনেক কিছুর সীমা টেনে দিচ্ছে। যেমন ইলেকট্রনের মত কণিকার জন্য দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টের ফাটলগুলোকে অতি ক্ষুদ্র হতে হয়। ইলেকট্রনটিকে যদি এরকম একটি ফাটল দিয়ে যেতে হয় ফাটলে থাকার সময়ে এর অবস্থানকে অতি সুনির্দিষ্ট করতে হয় অনিশ্চয়তা যার শূন্যের কাছাকাছি। তেমন সুনির্দিষ্ট করে অবস্থানের নিশ্চয়তা দিতে গেলে এর ভরবেগ চলে যাবে অসীমের কোঠায় অর্থাৎ ওই ফাটলের থেকে কী প্রবল বেগে এটি ছুটে কোথায় যেতে চাইবে তার ইয়ত্তা থাকবেনা— যা অসম্ভব একটি পরিস্থিতি। তাই ইলেকট্রনের পক্ষে শুধু সেরকম একটি ফাটলের মধ্য দিয়ে যাবার উপায় নেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের বর্ণনাতে। এভাবে অনিশ্চয়তার নীতিই এক্সপেরিমেন্টে পাওয়া ফলাফলের একটি কারণ বলে দিচ্ছে।

একই ভাবে অনিশ্চয়তার নীতির কারণেই এটমের মধ্যে ইলেকট্রন একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষ পথে থাকতে পারে না— তাকে কুয়াশার আকার ধারণ করতে হয়। মনে রাখতে হবে এই অনিশ্চয়তা মোটেই আমাদের পরিমাপের প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে ঘটছেনা যে প্রযুক্তির উন্নতি হলে এটি কমে যাবে বা এর অবসান হবে। এটি অজ্ঞানতা বা অপারগতা প্রসূত নয়— বরং প্রকৃতির একটি অমোঘ নিয়ম।

ফলে এটি চিরায়ত বিজ্ঞানের একটি মৌলিক দাবীকে সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে ফেলেছে। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় নীতিগত ভাবে বিশ্বের বর্তমান অবস্থা থেকে হিসেব করে সব কিছু ভবিষ্যতে যে কোন সময়ে কী অবস্থা তা বলে দেয়া সম্ভব ছিল। নিউটনের পরবর্তী কালের গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ লাপ্লাসের ভাষায় মহাবিশ্বের সব কণিকার অবস্থান ও গতিকে যদি কোন এক সময়ে জানতে পারতাম তা হলে তাদের আচরণ অতীতের যে কোন সময় কী রকম ছিল এবং ভবিষ্যতে যে কোন সময় কী রকম হবে তা আমরা হিসেব করে বলে দিতে পারতাম। অবশ্য মহাবিশ্বের সব কিছুর অবস্থান ও গতি মাপা সম্ভব নয়, কিন্তু সেটি আমাদের অপারগতার সমস্যা; নীতিগতভাবে চিরায়িত পদার্থবিদ্যায় লাপ্লাসের কথাটি যথার্থ না হবার কোন কারণ নেই। চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় এমন দাবী একেবারেই বৈধ ছিল। কিন্তু অনিশ্চয়তার নীতির ফলে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় লাপ্লাসের এই দাবীর বৈধতা আর রইলোনা। এর কারণ কোন কণিকার অবস্থান ও গতি আমরা এক সঙ্গে নিশ্চিত করতেই পারবোনা। একই ভাবে আমরা বইয়ের প্রথম খণ্ডে দেখেছি কোন সিস্টেমের শক্তি এবং তার প্রয়োগের সময়কে একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে পারবোনা। এ সব অনিশ্চয়তা যে কোয়ান্টাম তত্ত্বে কী অদ্ভুত সব ফল দেয় তা অবস্থান বনাম ভরবেগের

ক্ষেত্রে যেমন দেখলাম, শক্তি বনাম সময়ের অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রেও তার ফল কম অদ্ভুত নয়। এর ফলে যে কোন কণিকা বা তরঙ্গ একটি অসম্ভব বাধাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। যেমন তেজস্ক্রিয় বস্তুর এটমের নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় বিটা রশ্মি হিসেবে। ধনাত্মক নিউক্লিয়াসের প্রবল আকর্ষণ বল অতিক্রম করে তার বের হতে পারার কথা ছিলনা। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ও নিশ্চিত সময়ে অর্থাৎ সময়ের অনিশ্চয়তাকে অতি ছোট করে এটি শক্তির অনিশ্চয়তাকে প্রায় অসীম করে তুলতে পারে। ক্ষণিকের এই অসীম শক্তির কাছে সবই সম্ভব। এসব যে কথার কথা নয় তা তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিটা রশ্মি দেখেই বুঝতে পারি। এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা নীতি নতুন প্রযুক্তিরও সুযোগ করে দিয়েছে। যেমন 'টানেল ডায়োড' নামে যেই ডায়োড আমরা ইলেকট্রনিক যন্ত্রে অহরহ ব্যবহার করি তা এই নীতির মাধ্যমেই কাজ করে। চিরায়ত দৃষ্টিতে যে উচ্চ বাধাকে অতিক্রম করা অসম্ভব তাকে এই অনিশ্চয়তার সুযোগ অতিক্রম করাকেই টানেলিং বা সুড়ঙ্গ পথে অতিক্রম বলা হয়।

চিরায়ত পদার্থবিদ্যার সীমাহীন নিশ্চয়তার এরকম অবসান ঘটাতে অনেকের মন খারাপ হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানী বরং একে বিজ্ঞানের বিশাল অগ্রগতি মনে করেন। অতীতের পদার্থবিদ্যা ক্ষুদ্র বস্তুর ভিন্ন জগতের ওপর সাধারণ জগতের নিয়মগুলো চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। ফলে ক্ষুদ্র জগতের আচরণটি অনাবিষ্কৃত থেকে গিয়েছিলো। কোয়ান্টাম জগতকে আবিষ্কার করে আমরা বরং প্রকৃতির অনেক গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছি। যেমন কণিকা-তরঙ্গ দ্বৈততা, অনিশ্চয়তার নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে শক্তির থেকে কণিকার সৃষ্টি আবার শক্তির মধ্যে কণিকার বিলয়, শূন্য থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ইত্যাদির মত জটিল প্রশ্নগুলোর সমাধানের পথে আমরা এগোতে পেরেছি।

কোয়ান্টাম জগত, আপেক্ষিকতার জগত

যখন আমরা কোয়ান্টাম জগতে এলাম, প্রায় একই সঙ্গে কিন্তু আলাদা ভাবে আমরা আপেক্ষিকতার জগতেও এলাম— আপেক্ষিকতার বিশেষ ও সাধারণ তত্ত্বের মাধ্যমে। কোয়ান্টাম জগত ক্ষুদ্র জিনিসের জগত, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব দ্রুতগামী জিনিসের জগত। এ বইয়ের প্রথম খণ্ডে দেখেছি আলোর গতির কাছাকাছি দ্রুত গতির জিনিসের কেমন করে স্থান ছোট হয়ে যায়, সময় দীর্ঘ হয়ে যায়। আলোক কণিকা ফোটন, বস্তু কণিকা ইলেকট্রন ইত্যাদি একাধারে ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী— কাজেই কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্ব উভয়েই একই সঙ্গে এদের ওপর প্রযোজ্য হবার কথা। উভয় তত্ত্বের মধ্যে একটি আভ্যন্তরীণ সুসমতা রয়েছে, যা পল ডিরাক চমৎকার ভাবে ব্যবহার করে ইলেকট্রনের জন্য একটি নতুন তরঙ্গ-সমীকরণ দিলেন। এই নতুন সমীকরণ কোয়ান্টাম তত্ত্বে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সংযোজন ঘটালো। এটি

সবকিছুকে বাস্তবের আরো কাছে নিয়ে আসলো। এক্সপেরিমেন্টে আগেই বোঝা যাচ্ছিলো যে ইলেকট্রনের এক রকমের অন্তর্নিহিত ঘূর্ণন (স্পিন) আছে। ডিরাকের এই সমীকরণে এটি গাণিতিক ভাবে ফুটে ওঠলো— লাটিমের মধ্যে বা স্পিন বোলারের ছুঁড়ে দেয়া বলে যে ঘূর্ণন দেখি সে রকম কিছু নয়, তবে তার সঙ্গে তুলনীয় কোয়ান্টাম জগতেরই নিজস্ব একটি ব্যাপার। এক্সপেরিমেন্টে ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের যে মান $\frac{1}{2}$ পাওয়া যাচ্ছিলো, সমীকরণটিও তাই দিলো। আর এই সমীকরণই বলে দিলো ইলেকট্রনের একটি প্রতি-কণিকা আছে— এন্টি-ইলেকট্রন বা পজিট্রন— যেটি পরে যথারীতি এক্সপেরিমেন্টে পাওয়া গেছে।

ডিরাক এভাবে কোয়ান্টাম জগত আর আপেক্ষিকতার জগতকে প্রথম কাছে আনলেন। উভয়ে আরো কাছে এলো 'কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি' নামের নতুন তত্ত্বে। শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁর বিখ্যাত সমীকরণে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বকে আমলে আনেননি কারণ এটি আনতে গিয়ে তিনি সমীকরণটির সঙ্গে কিছু এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলকে মেলাতে পারছিলেননা। কিন্তু শিগ্‌গির বিজ্ঞানীরা বুঝলেন যে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে বস্তু, শক্তি এবং গতিকে যেভাবে একাকার করে সম্পর্কিত করা হয়েছে, কোয়ান্টাম তত্ত্বেও তা স্বাভাবিক ভাবে আসাটি অনিবার্য। এই অনিবার্যতা থেকেই কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির জন্ম। চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় ম্যাক্সওয়েল, ফ্যারাডে প্রমুখরা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদি নিরবিচ্ছিন্ন ফিল্ড বা ক্ষেত্রের ধারণা প্রবর্তন করেছিলেন। এখন এই নিরবিচ্ছিন্ন ফিল্ডের জায়গায় এলো গুচ্ছে গুচ্ছে অর্থাৎ কাটা-কাটা অবস্থায় কোয়ান্টাম ফিল্ড। ওই ফিল্ডের সহযাত্রী যে কণিকাগুলো সেই ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদিও কিন্তু কাটা-কাটা জিনিস। ফলে উভয় রকম কাটা-কাটা জিনিসের মধ্যে দুই 'কণিকার' মতই ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলতে পারি। একটির থেকে অন্যটির সৃষ্টিও হতে পারে, একটি অন্যটির মধ্যে বিলীনও হতে পারে। এক্সপেরিমেন্টে পাওয়া ফলের সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম ভাবে মিলে যাওয়ার কথা যদি বলি তা হলে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি পদার্থবিদ্যার সফলতম তত্ত্বগুলোর অন্যতম।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব মেলাতে গিয়ে অদ্ভুত কিছু ব্যাপারেরও সাক্ষাত পাওয়া গিয়েছে, বিশেষ করে একটি কোয়ান্টাম সিস্টেমে পরস্পর সম্পর্কিত দুই দোসরকে পরস্পর থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেলে একের পরিবর্তনে অন্যটির সেই সুদূর থেকেই তাৎক্ষণিক সাড়া দেয়ার ব্যাপারটি। এটি বোঝার জন্য ধরা যাক A ও B একই সিস্টেমের ভেতর দুটি আলাদা রকমের কণিকা। A দুটি বিকল্প অবস্থায় থাকতে পারে যার একটি A_1 এবং অন্যটি A_2। সে রকম B দুটি বিকল্প অবস্থায় থাকতে পারেঃ B_1 ও B_2। উভয় কণিকার বিকল্পগুলোর উপরিপাতনের ফলে পুরো সিস্টেমটির অবস্থা A_1

$B_1 + A_2 B_2$ এরকম ভাবে প্রকাশ করা যায়। ধরা যাক A এর ওপর হ্যাঁ-না জাতীয় একটি পরিমাপ করা যায় যাতে A কে A_1 বিকল্পে পাওয়া গেলে হয় 'হ্যাঁ', আর A_2 বিকল্পে পাওয়া গেলে হয় 'না'। এই পরিমাপের ফলশ্রুতিতে B তে কী হবে? A আর B যে এখনো সিস্টেমটিতে দোসর হিসেবে রয়েছে এবং সেই কারণে A সম্পর্কে কিছু পরিমাপে জানা গেলে তা B কেও প্রভাবিত করবে। A এর পরিমাপে যদি 'হ্যাঁ' পাওয়া যায় তা হলে সিস্টেম হবে $A_1 B_1$, আর যদি 'না' পাওয়া যায় তাহলে সিষ্টেম হবে $A_2 B_2$। অর্থাৎ A যখন পরিমাপে একটি বিকল্পে নির্দিষ্ট হয়ে যায় তখন সেই অনুসারে B কে প্রয়োজনে কোয়ান্টাম লাফ দিয়ে হয় B_1 বিকল্পে অথবা B_2 বিকল্পে নির্দিষ্ট হয়ে যেতে হবে। Bকে A এর কাছ থেকে লক্ষ মাইল দূরেও যদি নিয়ে যাই তবুও A তে ঘটা ঘটনার এই প্রভাব সেই দূরে গিয়েও B এর ওপর ঘটবে। একে বলা হয় উভয় কণিকার 'কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থা'— যত দূরেই থাকুক তারা বিজড়িত থাকবেই। আর এটি ঘট্‌বে তাৎক্ষণিক ভাবে, যা কিনা অপেক্ষিক তত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী অসম্ভব— কারণ সেই তত্ত্ব অনুযায়ী আলোর গতির থেকে বেশি বেগে কোন কিছুই যেতে পারে না, A এর পরিমাপের খবরটিও না। এখানে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যে একটি বিরোধের গন্ধ আমরা পাচ্ছি।

ব্যাপারটি আরো নাটকীয় হয়ে ওঠে যখন এমন ভাবে আয়োজন করি যেন A এর ওপর কী পরিমাপ করবো সেটিও আগে থেকে নির্ধারিত ছিলনা। এক্ষেত্রে B এর পক্ষে আগে থেকে কোন কিছুর জন্য ঠিক হয়ে থাকা একেবারেই সম্ভব ছিলনা। অথচ A তে ঘটনা ঘটার প্রতিক্রিয়ায় B কে দূর থেকে সঠিক লাফটি দিতে হয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক শূন্য স্পিন যুক্ত একটি কণিকা অবক্ষয়িত হয়ে একটি ইলেকট্রন ও তার প্রতি-কণিকা একটি পজিট্রনের সৃষ্টি হয়েছে এবং পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়েছে। যেহেতু ইলেকট্রনের $\frac{১}{২}$ স্পিন ও পজিট্রনের $\frac{১}{২}$ স্পিন বিপরীতমুখী তাই এখনো সিস্টেমের মোট স্পিন শূন্য। বিভিন্ন দিকে ইলেকট্রনের স্পিনের উপাংশ পাওয়ার জন্য এর স্পিনকে তার নিজের মূল দিকের আপেক্ষিকে বিভিন্ন দিকে মাপা যায়। এখন ইচ্ছেমত যে কোন দিকে ইলেকট্রনের স্পিন মাপলে সঙ্গে সঙ্গে পজিট্রন স্পিনকে লাফ দিয়ে ঠিক তার বিপরীতমুখী হতে হবে। উভয়ের মাঝখানে লক্ষ মাইল দুরত্ব থাকলেও এটি ঘট্‌বে। ওখানে B এর ওপর কোন পর্যবেক্ষণকারী পর্যবেক্ষণ চালালে B কে সেভাবে লাফ দিয়ে যাওয়া অবস্থাতেই পাবে। অথচ A এর স্পিন কোন্ দিকে মাপা হবে তা কারোই আগে থেকে জানা ছিলনা। পরস্পর থেকে যে কোন দূরত্বে থাকা এই দুই কণিকা অদ্ভুত

ভাবে এখনো একই সিস্টেমে কোয়ান্টাম বিজড়িত হয়ে রয়েছে, তাই একের সব পরিমাপের ঘটনা অন্যের কাছে তাৎক্ষণিক ভাবে খবর হয়ে যাচ্ছে, যা পর্যবেক্ষণকারী দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। এটিই কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিধান।

তাত্ত্বিক ভাবে ব্যাপারটি বহুদিন থেকে স্পষ্ট হলেও দূরের দোসরের এই তাৎক্ষণিক ভাবে সাড়া দেয়ার ব্যাপারটি অনেক পরে এক্সপেরিমেন্টে দেখা গেছে এক জোড়া ফোটনের (আলোর কণিকা) উভয়টির পোলারাইজেশন মাপার মাধ্যমে। তরঙ্গ রূপে আলোর তরঙ্গগুলো কোন্ সমতলে কম্পিত হয় সেটি নির্ধারণ করে তার পোলারাইজেশন; কোয়ান্টাম তত্ত্বে তার কণিকা রূপের মধ্যেও এই পোলারাইজেশন গুণটি রয়েছে। এই এক্সপেরিমেন্টে সত্যি সত্যি দেখা গেল একই সিস্টেমে থাকা একটি ফোটনের পোলারাইজেশন যে কোন দিকে মাপা হলে সেটি তাৎক্ষণিক ভাবে দূরে থাকা অন্য ফোটনের পোলারাইজেশনকে প্রভাবিত করে। এতে প্রমাণ করা গেছে যে এই প্রভাবটি এক ফোটন থেকে অন্য ফোটনে আলোর গতির থেকে অধিক গতিতে যেতে পেরেছে— কারণ আলোর গতির সুনির্দিষ্ট সীমিত বেগ রয়েছে, ওটি তাৎক্ষণিক নয়। এই ব্যাপারটিতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিক তত্ত্ব সাংঘর্ষিক ফল দিচ্ছে, কারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে কিছুই আলোর গতির থেকে অধিক বেগে যেতে পারে না। তবে ১৯৮৬ সালের ওই এক্সপেরিমেন্টের যে রকম ব্যাখ্যা দেয়া হয়, এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাবনার স্বরূপকে যেভাবে নেয়া হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে এখনো কিছু প্রশ্ন রয়েছে। কাজেই কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এই দুটি অতি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের মধ্যে এই বিশেষ ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিকতা এখনো একটি প্যারাডক্স বা বিদঘুটে সমস্যা হিসেবে রয়েছে; এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলার সময় এখনো আসেনি। তাছাড়া কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বকে মেলাবার কাজটিও এখনো বাকি রয়ে গেছে। আগামী দিনের পদার্থবিদ্যার জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে।

এলেম কোয়ান্টাম দেশে

বিজ্ঞান জিনিসটি কী তা যদি একেবারে আজকের অবস্থান থেকে বুঝতে চাই তা হলে কোয়ান্টাম জগতের রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করে তা করা যাবেনা, সেখানে শুধু আমাদের বোধশক্তি দিয়ে চালিত হবার সুযোগ নেই। সামনা-সামনি দেখতে পেলে আমাদের বোধশক্তির কাছে কোয়ান্টাম জগতকে কেমন আজব জগত মনে হবে তার একটি কাল্পনিক চিত্র তুলে ধরা যায়। কোয়ান্টাম জগতের সাক্ষাত আমরা যে দৈনন্দিন পরিচিত বস্তুগুলোর মধ্যে পাচ্ছিনা

(যেমন ক্রিকেট বল ইলেকট্রনের মত আচরণ করছেনা) তার মূল কারণ প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h এর অতি অতি ক্ষুদ্র মান। ধরা যাক্ আমাদের ওই কাল্পনিক জগতে h এরকম ক্ষুদ্র কিছু নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন দৃশ্যমান জিনিসগুলোর সাইজের সঙ্গে মানানসই বেশ বড়সড় একটি সংখ্যা। তখন কিন্তু এই দৃশ্যমান জগতেই কোয়ান্টাম জগতের ঘটনাগুলো ঘটতে দেখবো। একটি ক্রিকেট বল তখন তার তুলনীয় সাইজের দুই ফাটলের মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে গিয়ে সামনের পর্দায় বল থাকা আর না থাকার ঝালর সৃষ্টি করবে— ক্ষুদ্র জগতে ফোটন বা ইলেকট্রন যা করতো। এই বড় h এর জগতে আমরা দেখবো একটি বেড়াল হঠাৎ এক লাফে এক পাহাড় ডিঙিয়ে পাহাড়ের অন্য পাশে চলে যাচ্ছে— শক্তি ও সময়ের অনিশ্চয়তা নীতির সুযোগ নিয়ে। গ্লাসের পানিতে ছোট ছোট যে বরফের টুক্‌রা দেয়া হয়েছে দেখা যাবে গ্লাসের ভেতর টুক্‌রাগুলো ভীষণ অস্থির ভাবে ঠোকাঠুকি করছে, গ্লাসের কাচ অক্ষত রেখে তার ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে দু' একটি টুকরা। ওই টুক্‌রাগুলোকে ওষুধ খাওয়ার আরো ছোট গ্লাসের মধ্যে রাখলে এই অস্থিরতা আরো বেড়ে যাচ্ছে— মনে হচ্ছে এগুলো কিছুতেই কোন ছোট নির্দিষ্ট জায়গায় আবদ্ধ থাকতে চাচ্ছেনা। অনিশ্চয়তার নীতিতে অবস্থান বেশি নির্দিষ্ট হয়ে গেলে যে ভরবেগের অনিশ্চয়তা সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে যায়, বরফের টুক্‌রার আচরণে তাই দেখা যাচ্ছে। এসব আর এমন কী, ক্ষুদ্র জগতে তো তা নিত্যই ঘট্‌ছে। এখন সেই ক্ষুদ্র জগতের ব্যাপারগুলো আমরা বৃহত্তর জগতেও দেখতে পারছি, কাল্পনিক বড় h এর কারণে— এই যা। সত্যিকার জগতে h অবশ্য অতি ক্ষুদ্র।

অন্য দিকে কোন জাদুমন্ত্র বলে আমরা যদি ইলেকট্রনের মত ছোট হয়ে যেতে পারি তাহলে h কে তার সঠিক ক্ষুদ্র মানে রেখেই আমরা কোয়ান্টাম জগতের সব কিছু সরাসরি বোধশক্তিতে আনতে হয়তো পারবো। আমাদের অবস্থা তখন হয়ে যাবে এ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের এ্যালিসের মত। তবে পার্থক্যটি হলো এই কোয়ান্টাম জগতটি কিন্তু মোটেই কাল্পনিক নয়, এটি একেবারে সত্যিকার জগত, যে জগত বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে।

বিজ্ঞানের বেশধারী অন্য কিছু

বিজ্ঞান না হয়েও বিজ্ঞানের বেশ ধারণ

আলাদা করে চেনা চাই:

প্রাচীনকালে বিজ্ঞানকে অন্যান্য ধরণের বিদ্যার সঙ্গে একসঙ্গে চর্চা করা হতো— বলা যায় সবই মেশামেশি করে থাকতো। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের রয়েছে একবারে নিজস্ব একক পরিচিতি, যার সাফল্য অনেক উঁচুতে। এ কারণে অন্য কিছু চর্চা বিজ্ঞান না হয়েও বিজ্ঞানের বেশে সমাজে বরাবর থাক্‌ছে। বিজ্ঞানীরা এসবকে বেশি গুরুত্ব না দিলেও এর কোন কোনটি সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ও জনপ্রিয়তার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। একে বলা যায় বিজ্ঞানের নকল করা 'মেকি বিজ্ঞান' (সিউডো সায়েন্স)। বিজ্ঞানের ভাবসাব থাকাতে অনেক মানুষ এদের ওপরও বিজ্ঞানের মতই আস্থা রাখেন, এবং সেই আস্থার প্রতিদান কী পেলেন না পেলেন সে ব্যাপারে নিশ্চিতও থাকেন না; কারণ প্রায়শ বিষয়গুলোর ফলাফল খুব স্পষ্ট ভাবে আসে না। ফলে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হন; বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁরা ভুল বার্তা পান, এবং সহজেই ঠকে যান। এই বিভ্রান্তি শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঘটে তাই নয়— সামাজিক, প্রতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও ঘটে, এমনকি দু'একটি ক্ষেত্রে বৈশ্বিক পর্যায়েও। তাই এমন জিনিসকেও প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও আনুকূল্য পেতে দেখা যায় যা বিজ্ঞানেরই প্রাপ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা প্রতিবাদ করে যুক্তি দেখিয়ে এর নিরসন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছেন; কখনো বা জনপ্রিয়তার কারণে বিজ্ঞানের বেশধারী ওই অন্য জিনিসগুলো বহুকাল টিকে থেকেছে, কোন কোনটি আজ অবধি। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন আরো কিছু চর্চা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এও ঠিক নয় যে বিজ্ঞানে কম উন্নত বলে আমাদের দেশে বা অনুরূপ উন্নয়নশীল দেশেই এগুলোকে দেখা যায়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের উৎসও অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানোন্নত দেশেই, এবং এদের জনপ্রিয়তা সেখানেও যথেষ্ট রয়েছে।

বিজ্ঞান বহির্ভূত সব ধরণের বিষয় অবশ্য এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। বিজ্ঞান নয় এমন কত বিষয়ই তো আছে, কিন্তু সেগুলোর বেশির ভাগই নিজেদেরকে বিজ্ঞান বলে দাবী করেনা— তাই মেকি বিজ্ঞান হবার কোন প্রশ্ন তাদের ক্ষেত্রে ওঠেনা, বিজ্ঞান সম্পর্কে ভুল বার্তা দেবার সুযোগও সেগুলোর নেই। সমস্যাটি

হলো যেই চর্চা নিজেদেরকে বিজ্ঞান বলে, অথবা বিকল্প বিজ্ঞান বলে দাবী করে তাকে নিয়ে। সাধারণত এর ভাবভঙ্গি বিজ্ঞানের মতো, দাবীটি হলো এ যেন বিজ্ঞানেরই আর দশটা শাখার মত একটি শাখা— যা তার নিজস্ব নিয়ম কানুনে চলে। এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পরিভাষা এটি ব্যবহার করে, এমনকি তার ছক, নক্সা ইত্যাদিও— তবে আসলে দেখা যায় যে ওই বিজ্ঞানের ধারে কাছে কিছুও এটি নয়, কোন ভাবেই এটি বিজ্ঞান নয়। অল্প কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বিজ্ঞানের সঙ্গে পার্থক্যটি খুব স্পষ্ট না হওয়াতে বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ ও এর দিকে ঝুঁকে পড়েন, যদিও সাধারণ ভাবে বিজ্ঞানী সমাজ এ বিষয়গুলোর সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখেন না। তবে জনপ্রিয়তার কারণে সমাজে তার প্রভাব যথেষ্ট পড়তে পারে।

জনপ্রিয়তার সিড়িতে বেশ খানিকটা ওপরে ওঠার পর এক সময় বৈজ্ঞানিক সাফল্যের দাবীগুলো ফিকে হয়ে আস্‌লে এগুলোর কোন কোনটির চর্চার অবসান ঘটেছে— কিন্তু সবগুলোর নয়। যেমন প্রাচীন কাল থেকে শুরু হয়ে আজ অবধি ভালই সমর্থিত হচ্ছে এমন একটির নজির আমরা পাই জ্যোতিষবিদ্যার মধ্যে। অবশ্য এক সময় যেভাবে এটি জ্যেতির্বিদ্যারই অনেকখানি জুড়ে ছিল এখন সে ভাবে নয়, প্রান্তিক বিষয় হিসেবে বহু মানুষের মনোযোগ ও আগ্রহের বিষয় হয়েই এটি আছে। যখন জ্যোতির্বিদ্যার থেকে একে আলাদা করার তাগিদ কেউ অনুভব করেনি তখন সেটি সবার কাছে বিজ্ঞান হিসেবেই বিবেচিত হয়ে এসেছে— সেই ব্যাবিলন বা মিশরের জ্যোতির্বিজ্ঞানের সময় থেকে প্রায় পুরো মধ্যযুগ ধরে। অবশেষে এই আলাদা করার তাগিদ যখন আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এসেছে, তখনই এটি বিজ্ঞানের বাইরে এক প্রান্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাই বলে দেশে দেশে মানুষের মধ্যে এর প্রভাব, এর চর্চার অর্থনৈতিক আকার ইত্যাদি কম থাকেনি।

এগুলো আর যাই হোক বিজ্ঞান যে নয়, তা জানার জন্য বিজ্ঞান থেকে মেকি বিজ্ঞানকে আলাদা করতে পারাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষও যেন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটিতে নিশ্চিত থাকতে পারে সে জন্যই এই আলাদা করার জন্য বিজ্ঞানের স্পষ্ট শর্তাবলী থাকাটি জরুরি। তবে এই দুইকে আলাদা করার অন্যরকম প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে— বিশেষ করে বিজ্ঞানের দার্শনিকদের কাছে— বিজ্ঞানের জ্ঞান বিচারের দায়িত্ব যাঁরা পালন করেন। বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করা উচিত সেটি বিজ্ঞান সমাজ সেভাবে নিরুপন করে তেমনি বিজ্ঞান-দার্শনিকও যে এটির চুলচেরা বিচার করতে চান সেটি আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। এই বিচার করতে সুবিধা হয় যখন বিজ্ঞানের বিপরীতে বিজ্ঞান-সদৃশ অন্যান্য বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে কী শর্তে এদেরকেও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এজন্য তাঁরা বিজ্ঞান এবং মেকি বিজ্ঞানের মধ্যেকার সীমানা রেখাকে সুস্পষ্ট ভাবে নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

অনেক ক্ষেত্রে হয়তো যে কেউ মেকি বিজ্ঞানকে মেকি বলে চিনতে পারেন, কিন্তু কেন কী কারণে এটি মেকি তা বল্‌তে পারে না। বিজ্ঞান নয় এটি স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় এদেরকে বিজ্ঞানের থেকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আলাদা করাটি একটি কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

এই কাজটি বিজ্ঞান-দার্শনিকরা সুন্দর ভাবে করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ কমানোটি এ কাজে তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিলনা বরং তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানকে স্পষ্ট করাটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। লজিকে বৈধ যুক্তি কী রকম তা স্পষ্ট করার জন্য যেমন আদি লজিকবিদদেরকে 'ভ্রান্তি' (ফ্যালাসি) কী রকম সেটিও নিরুপন করতে হয়েছিল এও অনেকটা সেরকম। তাই বিজ্ঞানকে স্পষ্ট করার জন্য মেকি বিজ্ঞানকে কীভাবে আলাদা করা যায় সেই সীমানা রেখাটি তাঁদের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছিলো।

কিন্তু এই সীমানা রেখাটি এখন বিজ্ঞান সমাজ, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, এবং সাধারণ মানুষও প্রয়োগিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করতে পারছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে মানুষ সব সময় নানা রকম শঙ্কায় ভোগে, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা যে সব সময় সব রোগকে সন্তোষজনক ভাবে নিরাময় করতে পারে তা নয়। সে ক্ষেত্রে অনেকে যে ওই চিকিৎসার ওপর আস্থা না রেখে নানা রকম বিকল্প চিকিৎসার মধ্যে সন্তুষ্টি খুঁজবেন তা স্বাভাবিক। তবে কি স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য এ ধরণের বিকল্প চিকিৎসার ওপর ভরসা রাখা অধিক নিরাপদ? একমাত্র ওই সীমানা রেখাই এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। তেমনি মানুষের এই শঙ্কার কারণে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের একটি অংশ যদি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার থেকে সরিয়ে এরকম নানা বিকল্প চিকিৎসার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, অথবা চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এটি করা হয়, তা কতখানি নিরাপদ সিদ্ধান্ত হবে? নানা দেশের কর্তৃপক্ষকে এসব প্রশ্ন খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়েছে, এবং এজন্য শুধু জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য না রেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ওই সীমানা রেখার প্রয়োগ করতে হয়েছে— বিকল্পগুলো সত্যিই কত ফলপ্রসূ বা নিরাপদ তা নির্ণয়ের জন্য, অর্থাৎ তা বিজ্ঞান নাকি মেকি বিজ্ঞান তা নির্ণয়ের জন্য। শুধু বিকল্প চিকিৎসাই বা কেন? আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে কোন্ বিশেষজ্ঞের মতামতকে সঠিক সাক্ষ্য বলে গ্রহণ করবে বিচার ব্যবস্থা? সেটি কি শুধু বিজ্ঞান হিসেবে সাব্যস্তকৃত বিষয়ের বিশেষজ্ঞের, নাকি মেকি বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞেরও। এর ওপর ন্যায়-অন্যায় স্থির করাটি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। কাজেই বিজ্ঞান হিসাবে কাকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে তা গুরুত্বপূর্ণ। বিকল্প বিজ্ঞান বলে কিছু নেই।

নিরাপদ খাদ্য থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের অনেক সিদ্ধান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের ওপর

নির্ভর করে। যেখানে এরকম সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক হওয়াটি গুরুত্বপূর্ণ সেখানে মেকি বিজ্ঞান এসে তার জায়গা দখল করলে প্রচুর অনর্থ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর একটি বড় জায়গা হলো শিক্ষা ব্যবস্থায়। বিজ্ঞান শিক্ষার ভেতরেই তার পাশাপাশি মেকি বিজ্ঞানও জায়গা করে নেয়ার ঘটনা এক এক সময় নানা দেশে ঘট্‌তে দেখা গেছে। এগুলো সারা দুনিয়ায় শিক্ষাবিদদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে কখনো কখনো। কল্পকাহিনীতে, জনশ্রুতিতে অথবা সনাতন বিশ্বাসে মেকি বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে দাবী করার যে প্রবণতা রয়েছে সেগুলোও অনেক সময় ওরকম ক্ষতিকর নীতি গ্রহণে বাধ্য করে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ব্যাপারে অস্পষ্ট নীতি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়তে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ছদ্মবেশগুলো কী ধরণের:

সুদূর অতীতে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান-বহির্ভূত নানা চর্চা প্রায়শ একই ব্যক্তির হাতেই ঘটতো, একই জ্ঞানী সমাজে সমাদৃত হতো। তাই সেখানে উভয়ের মিলে মিশে একটি মিশ্র অবস্থা তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক ছিলনা। এর কোনটিকে অন্যটির ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে এমন কথা বলার অবকাশ ছিলনা। যেমন প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা জ্যোতিষবিদ্যাকে আলাদা কোন জিনিস মনে করতেননা, গ্রহ-তারকার সঙ্গে মানুষের ভাগ্যের যোগসূত্র স্থাপনটি তাঁদের কাছে ওই গ্রহতারকার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের মতই স্বাভাবিক বলে মনে হতো। পর্যবেক্ষণ-নির্ভর তাঁদের জ্যেতির্বিদ্যার তত্ত্বগুলো যে বৈজ্ঞানিক ভাবে এসেছে, আর জ্যেতিষবিদ্যার তত্ত্বগুলো যে মনগড়া ভাবে এসেছে এটি তাঁরা লক্ষ্যই করেননি। উভয়ের এই গাঁটছড়া বাঁধা চর্চাটি অবশ্য আধুনিক কালে এসে আর টেকেনি। তাই বলে আধুনিক বিজ্ঞান আসার পরও বিজ্ঞান এবং মেকি বিজ্ঞান যে গা-ঘেষাঘেষি করে থাকেনি তা বলা যাবেনা। আধুনিক বিজ্ঞানের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোধা স্বয়ং নিউটন একই সঙ্গে অত্যন্ত মনোযোগ ও সময় দিয়ে আলকেমির চর্চা করেছেন। যেই আলকেমি একটি মেকি বিজ্ঞান হিসেবে হাজার বছর ধরে বহু বিজ্ঞানী ও অন্যান্য জ্ঞানী মানুষকে ব্যস্ত রেখেছে, তা নিউটনকেও রেখেছে। আলকেমি অনুযায়ী ধাতু, পাথর ইত্যাদি জড় পদার্থেরও আত্মা আছে, সেই আত্মার বিশ্লেষণ করে 'ফিলোসোফার স্টোনের' সন্ধান করা যাবে— যা লোহার মত সস্তা ধাতুকে সোনায় পরিণত করতে পারে। বিজ্ঞান ও মেকি বিজ্ঞানের চর্চা পৃথক হাতে যেতে আরো সময় লেগেছে— তাও পুরাপুরি গেছে বলা যাবে না।

অথচ লক্ষ্য করলেই দেখা যায় উভয়ের ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা— মেকি বিজ্ঞান কখনোই বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণের কঠিন পথে যায়নি। বিজ্ঞান যেখানে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ, আনুমানিক তত্ত্ব, এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে এগিয়েছে, মেকি বিজ্ঞানের অধিকাংশই সেখানে এসেছে কোন না কোন পণ্ডিত

ব্যক্তির সৃষ্ট এক এক রকম 'মতবাদ' থেকে। এ গড়ে ওঠার পেছনে সাক্ষ্যসাবুদের থেকে তাঁর প্রজ্ঞার ওপরেই নির্ভর করা হয় বেশি। ওই মতবাদে বেশ জটিল সব নিয়ম কানুন সৃষ্টি হতে পারে যা দেখতে শুনতে বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুনের মতই মনে হয়। এগুলো যে অনেক মানুষের সমর্থন লাভ করে তা এজন্য নয় যে তা বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বরং এ সমর্থন ও জনপ্রিয়তার পেছনে থাকে তার সাফল্যের দাবী। সাফল্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনশ্রুতিতে শোনা যায়, উপকারভোগীদের বিবৃতি থেকেও জানা যায়। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে সে সাফল্যের হারকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবেচনায় গুরুত্ব দিয়ে যাচাই করার চেষ্টা হয়েছে প্রায়শ দেখা গেছে যে কিছু কিছু সাফল্য কাকতালীয় ভাবে দৈবাৎ এসেছে, যা এমনিতেও সব সময় আসে। আবার কিছু কিছু এসেছে উপকারভোগীর মনস্তাত্ত্বিক কারণে। আর দেখা গেছে সাফল্যগুলো যেখানে খুব প্রচার পেয়েছে, ব্যর্থতাগুলো কিন্তু গোপনই রয়ে-গেছে। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেকি বিজ্ঞানের চর্চায় কঠিন পদ্ধতি কিছু থাকে না, সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয়টিই প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা থাকে না, তাই সাফল্যের প্রচার কাজেই বরং প্রচুর উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়েছে।

এক সময় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অনেকটা স্বাধীন ভাবেই গড়ে উঠতো, একের ওপর অন্যের তেমন কোন নির্ভরশীলতা ছাড়া। এই সুযোগে বিজ্ঞানেরই আর একটি নতুন শাখা হিসেবে মেকি বিজ্ঞানেরও গড়ে ওঠার সুযোগ বেশি ছিল। এক একটি সময়ে সত্যি সত্যি বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে এদের কোন কোনটি বেশ গ্রহণযোগ্যতাও পেয়েছে যেহেতু বিজ্ঞানের অন্যান্য অংশের তেমন কোন খবরদারিত্ব এর ওপর থাকতোনা। কোন কোন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বক্তব্য ও কার্যক্রম অনেক মানুষের কাছে সন্তোষজনক মনে নাও হতে পারে। যেমন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাবিদ্যার আবশ্যকীয় অস্ত্রোপচার ও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন ওষুধ অনেকের পছন্দ নয়। জীববিবর্তন তত্ত্বে মানুষকে সম্পূর্ণ প্রাণীকূলের সঙ্গে এক করে দেখাও অনেকের পছন্দ নয়। অনেকে নিজের ধূমপানের অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এ কথাটি ভাবতে চান্না। তাই কোন মতবাদ যদি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার কষ্ট স্বীকার না করেই এসবের বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়ে যায়, এবং হাল্কা যুক্তিতেই ওগুলোকে নাকচ করার প্রচারকার্যে নামে— তখন এই নতুন মতবাদের জন্য একটি সহজ জনপ্রিয়তা ইতোমধ্যেই তৈরি থাকে।

অবশ্য সব মেকি বিজ্ঞান যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে তাও নয়। এদের অনেকগুলো বরং সেই বিজ্ঞানের সঙ্গে সহ-অবস্থানের চেষ্টা করে। যেমন বিকল্প চিকিৎসাগুলো বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাকে ভুল বলে অভিহিত করার বদলে বরং বলে ওটি জটিল, ব্যয়বহুল এবং উপকারের সঙ্গে সঙ্গে অপকারও করে। তাছাড়া তাতে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির কারণে ভোগান্তি

বেশি, অথচ আরোগ্য হবার গ্যারান্টিও কম। নিজ নিজ বিকল্প চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবশ্য এরা এসব নেতিবাচক দিকগুলো এড়িয়ে অদ্ভুত সব সাফল্য দাবী করে। সমস্যা হলো তাঁদের এই 'সাফল্যগুলোকে' কখনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়না। মতবাদগুলো যাঁরা দেন বা যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরা এর জন্য কোন যাচাইকৃত বৈজ্ঞানিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করেন না। দাবী করা সাফল্য-ব্যর্থতাগুলো সম্পর্কে কোন পরিমাপগত বা সংখ্যাবাচক তথ্য সাধারণত থাকে না। প্রবর্তকরা নিজেরা যে এটি করতে চাননা সে কথা স্পষ্ট। বিজ্ঞানের এসব পদ্ধতি অনুসরণ না করলেও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের অধিক পরিচিত পরিভাষা, সে সব পদ্ধতির মত এক রকম কারিগরি বর্ণনা, এ সংক্রান্ত নক্সা, শ্রেণীবিভাজন, ফরমুলা, ইত্যাদি সৃষ্টি করতে তাঁরা অবশ্য কার্পণ্য করেন না। এ সবের ফলে বিজ্ঞান হিসেবে মতবাদগুলো অনেকের কাছে বেশ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

এসব বিষয়ে প্রচুর সংখ্যায় চর্চাকারীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণত দু'রকমের নীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। একদিকে সহজে অল্প কিছুদিন কারো কাছে শিখে, অথবা নিজে নিজে বই পড়ে শিখে এর অনেক চর্চাকারী পেশাদার হিসেবে অথবা সৌখিন হিসেবে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে এর প্রয়োগ শুরু করেন। অন্য দিকে বিজ্ঞান শিক্ষার অনুকরণে এর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য যথারীতি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ব্যবস্থা নেয়া হয় যেখানেই সম্ভব। এই উভয় নীতির ফলে দুদিক থেকেই এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব হয়। অল্পদিনে সহজ ভাবে শিখে এক রকম বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় বলে অনেকে উৎসাহ ভরে একে আপন করে নেন, যা জনপ্রিয়তায় বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মতবাদগুলোর মূল নীতি এবং মূল প্রয়োগ-পদ্ধতিগুলো সহজ হওয়াতে একে এভাবে আয়ত্ত করা কঠিন হয়না। তাছাড়া বিজ্ঞানের মত কড়াকড়ি যাচাইয়ে এর সাফল্যের পরীক্ষা দিতে হয়না বলে এরকম সৌখিন ভঙ্গিতে এর চর্চা করতে অসুবিধা হয়না। অন্যদিকে একই জিনিসকে আবার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগী করে বিস্তারিত পাঠক্রমে রূপ দেয়াতে সাধারণ ও উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে নিজের ও বিষয়টির সম্মান যেমন বাড়ানো যায়, তেমনি বিজ্ঞানের মত এর প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধও বাড়ে।

সীমানা রেখার বাইরের কিছু উদাহরণ

বিজ্ঞান আর মেকি বিজ্ঞানের সীমানা রেখার এপাশ ওপাশ সাব্যস্ত করা কোন কোন ক্ষেত্রে কঠিন হয়। কিন্তু যেগুলোর ক্ষেত্রে সীমানার বাইরে ফেলা মোটেই কঠিন হয়নি তার মধ্যে প্রাচীনতম চর্চাটি হলো জ্যোতিষবিদ্যার। মেকি বিজ্ঞানের প্রশ্ন আমলে সবার আগে এটির কথা মনে পড়ে, অথচ তা সত্ত্বেও এর এক রকম জনপ্রিয়তা এখনো অক্ষুণ্ন আছে মূল চর্চা শুরুর বহু হাজার বছর

পরেও। প্রাচীন বিজ্ঞানীরা আকাশের জ্যোতিষ্কগুলোর গতিবিধি নিয়ে যখন থেকে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করছেন তখন থেকেই এসব গতিবিধির সঙ্গে মানুষের ভাগ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এমন ধারণা পোষণ করেছেন। সেই সম্পর্ক নিয়েই চলেছে জ্যোতিষবিদ্যা। মজার ব্যাপার হলো এই ধারণা নিজের মত করে মধ্যপ্রাচ্যে, গ্রীসে, চীনে, ভারতে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় জ্যেতির্বিদ্যার চর্চার অঙ্গীভূত ছিল। এগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি অঞ্চলের মূলধারার জ্যোতিষবিদ্যায় আজ অবধি যে চর্চা চলে এসেছে তাতে রাশিচক্র, রাশিচিহ্ন, হরোস্কোপ ইত্যাদির প্রাধান্য রয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যায় সূর্যের বার্ষিক পরিক্রমণের পথ বরাবর একটি চওড়া সড়কের মত করে রাশিচক্র কল্পনা করা হয়েছে যার মধ্যে দিয়ে নানা গ্রহগুলোকেও বছরে একবার পরিক্রমণ করতে দেখা যায়। একে বার ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একটি রাশিচিহ্ন রয়েছে, যেমন তুলা, বৃশ্চিক, কর্কট, মিথুন ইত্যাদি। রাশিচিহ্নের বহু ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তির জন্মক্ষণ অনুযায়ী তার ভাগ্যের সঙ্গে একটি রাশিচিহ্নের যোগ দেখানো। ব্যক্তির জন্মের মত কোন একটি ঘটনার স্থান ও সময়ের নিরিখে সাতটি গ্রহ, বারটি রাশিচিহ্ন, এবং আকাশকে বিভক্তকারী বারটি ভূবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তৈরি হয় ওই ঘটনার হরোস্কোপ। বলা হয় এর থেকে বের করা যাবে এই ঘটনা কতটা শুভ বা অশুভ হবে। যেমন ভালবাসা, যুদ্ধ, সংকট ইত্যাদির সম্ভাবনা এখান থেকেই ধরা পড়ে। শেষ অবধি এই সবকিছু ব্যক্তি মানুষের বা দেশের ভাগ্য গণনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সারা দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ এখনো জ্যোতিষবিদ্যায় আস্থা রাখেন এবং এভাবে নিজের ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ নিরুপনের চেষ্টা করেন। এক সময় জ্যোতিষবিদ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন ছিল, এমনকি সে সময়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার পেছনে এই ভাগ্য গণনাকে একটি প্রধান প্রেরণা বলে মনে করা হয়। এখনো উভয়ের চর্চায় ব্যবহৃত জিনিসগুলো ও পরিভাষাগুলোর অনেকাংশে একই হওয়াতে চর্চাকারী ও ব্যবহারকারীদের কাছে এর বিজ্ঞান-ভাবটা রয়ে গেছে। অথচ আসলে বিজ্ঞানের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই—তখনো ছিলনা, এখনো নেই। বলতে গেলে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা এই বিদ্যাটি একটি জলজ্যান্ত মেকি বিজ্ঞান মাত্র।

প্রাচীন মেকি বিজ্ঞানের উদাহরণ ছেড়ে আমরা যদি অপেক্ষাকৃত কাছের সময়ে চালু হওয়া বিষয়ের উদাহরণ নিই তাহলে মেসমারিজমের কথা বলতে পারি। এর শুরু হয়েছিলো ১৭৩৪ সালে জন্ম নেয়া অষ্ট্রিয়ার একজন চিকিৎসক আন্তন মেসমারের হাতে। তিনি বল্‌লেন মানুষ সহ সব প্রাণীর শরীরে এক রকম চৌম্বক তরল থাকে, যার জন্য সৃষ্টি হয় প্রাণী-চৌম্বকত্ব। তিনি দাবী করলেন যে এই চৌম্বকত্বটিকে তিনি মানুষের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করতে পারছেন। রুগীর দেহের বিশেষ বিশেষ অংশের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে এবং

তাঁর চোখের সঙ্গে চক্ষু সংযোগ করে ওই চৌম্বক তরলকে চালনা করা যায়। এর ফলে রুগীর মধ্যে এক রকম সম্মোহনের সৃষ্টি হয় যার শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো রোগের উপশম করতে সক্ষম। কখনো কখনো এ প্রতিক্রিয়া অঙ্গ বিশেষে পক্ষাঘাতের মত অসাড়ত্ব সৃষ্টি করে, কখনো বা হিস্টিরিয়ার মত লক্ষণ সৃষ্টি করে— যেসব কিনা চিকিৎসারই অংশ। মেসমার এবং তাঁর অনুসারী এর চর্চাকারীদের হাতে নানা রকম রোগের নিরাময় সম্ভব হচ্ছে এমন জনশ্রুতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি ইউরোপের দেশগুলোতে জনপ্রিয় হয়। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা একে অসার প্রতিপন্ন করে অভিযোগ করলে ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমি একটি কমিশন গঠন করে এই বিদ্যাকে প্রতারণা বলে নাকচ করে দেয়। এর ফলে আপাতত এর প্রতি উৎসাহে ভাটা পড়ে।

কিন্তু ১৮৩০ এর দশকে বৃটেনে নতুন করে মেসমারিজমের উত্থান ঘটে, এবং এর পর এর জনপ্রিয়তা ইউরোপ ও আমেরিকায় এতই তুঙ্গে ওঠে যে নানা ভাষাগুলোতে পরস্পরের ওপর সম্মোহন প্রভাব বোঝাতে 'মেসমারাইজ' শব্দটিকে সাধারণ ভাবেও ব্যবহার করা শুরু হয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর বড় বড় সাফল্য দাবী করা হয়, এমনকি অস্ত্রোপচারের সময় অজ্ঞান করার বদলে মেসমারাইজ করেই চল্‌ছে এমন কথাও শোনা যায়। তাত্ত্বিক এক দল পণ্ডিত দাবী করেন যে এর মাধ্যমে প্রাণী বিজ্ঞান তার পূর্ববর্তী 'ভাইটালিস্ট' তত্ত্বকে সত্যিকার ভাবে ফিরিয়ে এনেছে যার মতে আত্মা বা জীবনীশক্তির নিরিখেই প্রাণীবিদ্যার চর্চা করতে হবে— প্রাণী-চৌম্বকত্ব তারই একটি প্রকাশ। জনপ্রিয়তার অন্য দিকটিতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও মেসমারিজম আয়ত্ব করার হিড়িক পড়ে যায়; অনেকে সখ করেও পরস্পরকে মেসমারাইজ করার জন্য এটি শেখেন।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আসার আগেই মেসমারিজমের ওই বিজ্ঞান হবার দাবী বিভিন্ন ভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন হয়, এবং এর জনপ্রিয়তা ওই নতুন শতাব্দীতে ক্রমেই হ্রাস পায়। তবে অনেকটা এর আদলে হিপনোটিজম নামের আর একটি মনোরোগ চিকিৎসা পদ্ধতি চালু হয়। হিপনোটিজমে প্রয়োগকারী বার বার মুখে রুগীকে বলতে থাকেন যে তাঁর দেহ মনে কোন একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে— এমনি ভাবে বলে এবং তাকিয়ে রুগীকে আবিষ্ট করে ফেলার নাম সাজেশন। প্রয়োগকারীর সম্মোহনী শক্তি এখানে কাজ করে এমনটিই দাবী। হিপনোটিজমের মতে প্রাণী-চৌম্বকত্ব বা জীবনীশক্তি ইত্যাদি নয় বরং অবচেতন মনে পরিবর্তন এনেই এটি সফল হয়— এই মত অনুযায়ী মেসমারিজমের সাফল্যগুলোও এ কারণেই এসেছিলো। এক সময় হিপনোটিজম মনোচিকিৎসায় প্রচুর ব্যবহৃত হলে এরও চর্চা এখন বেশি নেই। নিজের ওজন কমাতে, ধূমপান ছেড়ে দিতে এবং এরকম অনেক ইচ্ছা শক্তি

নির্ভর কাজে সফল হতে হিপনোটিজম সাহায্য করে বলে কেউ কেউ এখনো মনে করেন। দেখা যায় যে যারা এর দ্বারা প্রভাবিত হতে আগের থেকে অনুকূল মনোভাবাপন্ন হয়ে এসেছেন তাঁরাই এর দ্বারা আবিষ্ট হন। সাজেশনের বাক্য প্রয়োগে কারো কারো মনে যে আবিষ্ট ভাব সৃষ্টি হয় তার এক রকম ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞান দিয়েছে এটি তীব্র মনোসংযোগের মাধ্যমে মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে সম্ভব বলে মনে করে— যা ব্রেইন স্ক্যানিং এর মাধ্যমে কিছু দেখা গেছে। কিন্তু এর ফলে রোগ চিকিৎসা কতখানি ঘটতে পারে সেটি একেবারেই অনিশ্চিত। সনাতন হিপনোটিজম চিকিৎসা তত্ত্ব তাই মেসমারিজমের মতই বিজ্ঞান বহির্ভূত জিনিস বলে বিবেচিত হয়।

মেসমারিজমের সমসাময়িক আরেকটি মেকি বিজ্ঞান ইউরোপে ও আমেরিকায় যথেষ্ট ঢেউ তুলেও পরে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে— তা হলো ফ্রেনোলজি। এতে মাথার খুলির পরীক্ষা করে তার থেকে যে কোন ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা নির্ণয় করার দাবী করা হতো। অষ্ট্রিয়ান চিকিৎসক ফ্রান্স জোসেফ গালের মতবাদ থেকে এর সৃষ্টি। তৎকালীন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব থেকে শুরু করেও তিনি মতবাদটিকে নিয়ে গেছেন মেকি বিজ্ঞানের পথে। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে মস্তিষ্কের এক এক অংশ এক এক ধরণের ক্ষমতার জন্য দায়ী— কোনটি দৃষ্টির, কোনটি কথার অনুধাবনের, কোনটি কথা বলার, কোনটি শরীরের নানা অংশ নাড়াচাড়া করার ইত্যাদি। মস্তিষ্কের পৃষ্ঠদেশে যে কোর্টেক্স তাতে ফোলা ফোলা বেশ কিছু ডিবির আকারে এই পৃথক অংশগুলো থাকে— যে কারণে মাথার খুলির বিভিন্ন অংশও ওই ডিবিগুলোর আকার-আকৃতি লাভ করে।

ফ্রেনোলজি এসব তথ্যের ওপর নির্ভর করেই মাথার খুলির উপরিভাগের গঠন থেকে এক এক ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতার পূর্বাভাস দেয়ার দাবী করতো। সাধারণ মানুষও মস্তিষ্কের ভেতরের ওই জটিলতার মধ্যে না গিয়ে ফ্রেনোলজির এই সরলীকৃত যুক্তিতে মাথার খুলিতে আঙ্গুল বুলিয়ে মানসিক ক্ষমতা বোঝার আশা করতো। গাল এবং তাঁর অনুসারীরা এজন্য মাথার খুলির উপরিভাগের বিস্তারিত নক্সার ব্যবস্থা করেছিলেন যেখানে বিভিন্ন ডিবির আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণিত থাকতো। নক্সা দেখে এবং খুলি পরীক্ষা করে এত সহজে একজন মানুষ সম্পর্কে এত কথা বলার সুযোগ এনে দেয়াতে ফ্রেনোলজি খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ বিষয়ে অল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির চাহিদা দেখা দেয়। গাল এবং তাঁর সহকর্মীরা সারা ইউরোপ ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে এর জনপ্রিয়তা বাড়াতে সাহায্য করেন। ও সময় ফ্রেনোলজির ওপর শত শত বই প্রকাশিত হয়। দেশে দেশে ফ্রেনোলজি সোসাইটি গঠিত হয় এবং ১৮২০ সালে এ সম্পর্কিত পান্ডিত্যপূর্ণ লেখাগুলো প্রকাশের জন্য 'ফ্রেনোলজি জার্নাল' প্রকাশ শুরু হয়। মস্তিষ্কের গঠন সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা এর মধ্যে থাকলেও

ফ্রেনোলজি বিষয়টি ছিল আসলে ছিল সোজাসাপটা কিছু কাজ যা বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন থেকে একেবারেই আলাদা। বিজ্ঞানী মহল গোড়া থেকেই এর প্রতি সন্দিহান হলেও, সাধারণ মানুষ কিন্তু তা হয়নি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি অসারতা সবার কাছেই স্পষ্ট হয়েছিলো— এর অস্থিত্ব বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গড়ায়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শুরু হওয়া সিগমণ্ড ফ্রয়েডের মনোবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদ সাইকোএনালাইসিস বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। কিছুটা ভিন্ন রূপে একই রকম মতবাদ তাঁর শিষ্য ও পরে প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যালফ্রেড অ্যাডলার এবং কার্ল ইয়ুং এর হাত ধরেও অনেক খানি এগিয়েছিলো। ফ্রয়েডের মতবাদটি এসেছে তাঁর নিজের পেশা মনোরোগ চিকিৎসার প্রসঙ্গে। এর মতে মানুষের স্পষ্ট যে চেতনা তার গভীরে রয়ে গেছে একটি অবচেতন মন। চেতন ও অবচেতনের দ্বন্দ্বই নানা রকম মনোরোগের সৃষ্টি করছে। এই দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য চিকিৎসার যে পদ্ধতি তিনি শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন তা হলো রুগীর সঙ্গে নিয়মিত দীর্ঘ সময় ধরে খোলামেলা আলাপ করে তাঁর অবচেতন মনের কথাগুলোকে বের করে আনা। সেখানে যে ভয়, লোভ, লিপ্সা, যৌনতা ইত্যাদি লুকিয়ে থাকে— যার অনেকগুলো শৈশব থেকে সৃষ্ট— সেগুলো উঠে আসতেই রোগের নিরাময় হবে এটিই হলো ধারণা। তাছাড়া অবচেতন মনের অনেক কিছু স্বপ্নের মধ্যেও ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। তাও বিশ্লেষণে কাজে আসে। এর যে তত্ত্ব তাতে ফ্রয়েড মানসিক গঠনকে ঈড, ইগো এবং সুপার ইগো এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। জন্মলগ্ন থেকে যে সব তাড়নাগুলো মানুষের মধ্যে থাকে সেগুলো ঈড যার মূলে থাকে সুখানুভূতির এবং যৌনতার তাড়না। বড় হয়ে ওঠার সময় এই তাড়নাগুলোর সঙ্গে বাইরের বাস্তবতার মিশ্রণে তৈরি হয় মানুষের ইগো বা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। সুপার ইগোতে গিয়ে অবশ্য ব্যক্তি আত্ম-পর্যবেক্ষণ, আত্ম-সমালোচনার মত গভীরতর চিন্তার ক্ষমতা লাভ করে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ছয়টি দৃষ্টিভঙ্গি। সাইকোএনালাইসিসে এই ছয়টি দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়নের মাধ্যমে অবচেতন মনের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং চেতন ও অবচেতনের সংঘাত নিরসনে রোগেরও অবসান ঘটে।

ফ্রয়েড নিজের পেশাজীবন শুরু করেন ল্যাবোরেটরিতে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ওপর। কিন্তু শিগ্‌গির তিনি সরাসরি পরীক্ষার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে মনোরোগ সম্পর্কে মতবাদ তৈরির দিকে চলে যান। ফলে শুরু থেকেই তাঁর মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। শুধু তাই নয় সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক সুযোগ তাঁর মতবাদে না থাকাতে এটি প্রতিষ্ঠিত মনোবিদ্যার সীমার মধ্যে থাকতে পারেনি। তাঁর শিষ্যদের প্রবর্তিত অনুরূপ মতবাদগুলোর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিন্তু

একটি দীর্ঘ সময় সাইকোএনালাইসিস দেশে দেশে মনোরোগের চিকিৎসার জনপ্রিয় পদ্ধতি ছিল— ফ্রয়েড ও তাঁর মতবাদ সারা দুনিয়ায় দারুণ পরিচিত হয়েছে। অবশ্য বিজ্ঞান হবার দাবী থেকে ক্রমে সরে গিয়ে সাইকোএনালাইসিস বরং ক্রমে মানববিদ্যার (হিউম্যানিটিজ) অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে, এবং এক ভাবে সেখানে এর চর্চা অব্যাহত আছে— যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তত্ত্ব যাচাইয়ের আবশ্যকতা নেই। রুগীর সঙ্গে চিকিৎসকের খোলামেলা আলাপে যে কিছু কিছু মনোরোগ উপশম হয় সেই ধারণাটি অবশ্য কিছুটা পরীক্ষিত, এবং বৈজ্ঞানিক মনোরোগ চিকিৎসায় এখনো তা 'কাউন্সেলিং' রূপে অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে এ সম্পর্কে ফ্রয়েডের তত্ত্বগুলো বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যার অংশ নয়।

মানসিক রোগ ও মনোবিদ্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে যেমন এ জাতীয় উদাহরণ বেশি, তেমনি সার্বিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেগুলো সাধারণ ভাবে বিকল্প চিকিৎসা নামে পরিচিত, সেখানেও এর অনেক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু তুলনামূলক ভাবে আধুনিক, আর কিছু অনেক প্রাচীন হলেও এখনো যথেষ্ট চালু রয়েছে। আধুনিকগুলোর মধ্যে হোমিওপ্যাথি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। ১৭৯৬ সালে জার্মানীর স্যামুয়েল হ্যানেমান নিজের কিছু মতবাদের ওপর ভিত্তি করে এই চিকিৎসার প্রবর্তন করেছিলেন। এ মতবাদের দুটি প্রধান নীতির একটি হলো 'যে রোগ সৃষ্টি করে, তাই আবার রোগ সারায়', আর অন্যটি হলো 'যত পাতলা করে ব্যবহৃত হবে ওষুধ ততই বেশি কার্যকর হবে'। প্রথমটি অনেকটা বিষে বিষ ক্ষয় করে এমন ধারারই নীতি। সুস্থ মানুষের মধ্যে যা রোগের লক্ষণ সৃষ্টি করে, সেই রোগে আক্রান্ত মানুষ ওই জিনিসের প্রয়োগেই সুস্থ হন। আর দ্বিতীয় নীতি অনুযায়ী হোমিওপ্যাথিতে যে ওষুধই ব্যবহার করা হোক্ না কেন তাকে ক্রমাগত পানি বা এ্যালকোহলের সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে এত পাত্‌লা করে ফেলতে হবে যাতে শেষ মিশ্রণটিতে ওষুধের অস্থিত্বটিই একেবারে ক্ষীণ হয়ে যায়, বলতে গেলে থাকেই না। এমনটি করলেই ওষুধটি কার্যকর হবে। স্পষ্টত এই দুই নীতির কোনটিই বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খায়না। তা সত্ত্বেও হ্যানেমানের আমল থেকে আজ অবধি দুনিয়ার বহু দেশে এর প্রচলন ও জনপ্রিয়তা রয়েছে। হোমিওপ্যাথিতে গোড়া থেকেই নানা রোগের জন্য নানা ওষুধ চিহ্নিত করা হয়েছে— যা প্রাণী, উদ্ভিদ, খনিজ অথবা সিনথেটিক দ্রব্য থেকে পাওয়া যায়। এসব ওষুধের বিস্তারিত তালিকা-গ্রন্থ তৈরি করা হয়েছে, সেই সঙ্গে রোগের লক্ষণের তালিকাও। এরকম চিকিৎসা যাঁরা করেন তাঁরা সাধারণত এই তালিকার ওপরেই নির্ভর করে থাকেন। ওষুধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে রুগীর অন্যান্য দৈহিক-মানসিক অবস্থার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়। রুগীকে খাদ্যর বাছ-বিচার ইত্যাদিরও নানা পরামর্শ দেয়া হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে হোমিওপ্যাথি ইউরোপ থেকে শুরু হয়ে দুনিয়ার বহু দেশে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে— বিশেষ করে ভারতবর্ষে। এতে আগ্রহী রুগীর সংখ্যা যেমন বিপুল ছিল, তেমনি এর চর্চাকারীর সংখ্যাও ছিল অনেক। তাঁদের বেশির ভাগই নিজেরা পড়াশোনা করে এটি শিখতেন, এবং অভিজ্ঞ হয়ে উঠতেন। কেউ কেউ নিজেরা এবং নিজের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের চিকিৎসার জন্য এটি শিখে সৌখিন ভাবেও এর চর্চা করতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে লক্ষ্য করা যায় যে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে লেখা চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অসুখ-বিসুখে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ তাতে থাকতো। অবশ্য ইউরোপ-আমেরিকা সহ দেশে দেশে বিশেষজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবেই অনেকে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন। সহজে চর্চা করার সুবিধাটি জনপ্রিয়তার একটি কারণ হলেও চিকিৎসার সুলভতা, সারল্য, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া না থাকা, ইত্যাদিও এর কারণ ছিল। এ চিকিৎসায় ওষুধের নাম, কিছু কিছু বর্ণনা ও প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মত হলেও, এবং দীর্ঘ সময় বিশেষ করে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পাশাপাশি এর অবস্থান থাকলেও হোমিওপ্যাথির যে সত্যিকার বিজ্ঞান-ভিত্তি নেই তা বরাবর স্পষ্ট ছিল। কিন্তু জনমনে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনো বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সহ অনেক মানুষ যেটি বিশ্বাস করেন তা হলো হোমিওপ্যাথি চমৎকার কাজ করে— অন্তত অধিকাংশ অসুখের ক্ষেত্রে।

হোমিওপ্যাথিকে সব সময় বিজ্ঞান বহির্ভূত বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানীদের কাছে জানা থাকলেও অবশ্য এর জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে যাচাইয়ের আয়োজন অতীতে বড় একটি হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যুক্তরাজ্যে, অস্ট্রেলিয়ায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা হোমিওপ্যাথির সাফল্য যাচাইয়ের আয়োজন বেশ কিছু হয়েছে। এসব আয়োজনে সাধারণত যাচাইকারী এবং রুগী উভয় পক্ষই টের না পাওয়ার মত করে এক দল রুগীকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে এবং অন্য দলকে দেখতে হুবহু ওই ওষুধের মত চিনির গুড়া দিয়ে দুটি বড় দলের মধ্যে ফলাফলের সংখ্যাতাত্ত্বিক যাচাই করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত এসেছে তা হলো এর সাফল্য অনেকাংশে মনস্তাত্ত্বিক এবং ওষুধ ছাড়াই ভাল হয়ে যাবার ঘটনার ওপর নির্ভরশীল। এমন ফলাফল ক্রমে বেশি বেশি আসার পর কিছু কিছু দেশে হোমিওপ্যাথির জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের আনুকূল্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে; যদিও অবশ্য রুগীর নিজের চিকিৎসা পদ্ধতি বাছাইয়ের স্বাধীনতাকেও কোন কোন ক্ষেত্রে মনে রাখতে হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জীবন শঙ্কা থাকতে পারে এমন অসুখের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির ওপর নির্ভর করার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। অবশ্য দু'একটি ক্ষেত্রে এমনি পরীক্ষার ফলাফলকে অনিশ্চিত হিসেবেও ব্যাখ্যা করা গেছে— যেমন সুইজারল্যান্ডের একটি পরীক্ষায়।

প্রাচীন বিকল্প চিকিৎসার উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে সনাতন চীনা চিকিৎসাপদ্ধতির কথা উল্লেখ করতে পারি যা চীনে এবং জাতিগত ভাবে চৈনিক অধ্যুষিত দেশগুলোতে তো বটেই, সারা দুনিয়ার অন্যান্যদের মধ্যেও এখনো যথেষ্ট জনপ্রিয়। এরকম চিকিৎসার পুরোভাগে রয়েছে শরীরের নানা স্থানে চামড়ার তলে সূঁচ ফুটানোর মাধ্যমে যে চিকিৎসা সেই 'আকুপাংচার'। আকুপাংচার সহ সনাতন চীনা চিকিৎসা পদ্ধতি প্রাচীন চীনা সভ্যতার ধ্যান ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত— এর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের যে সম্পর্ক নেই তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একে এক রকমের বিকল্প বা সমান্তরাল বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা ঠিকই রয়েছে। আকুপাংচারে বিশ্বাস করা হয় শরীরের মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট রেখা-জাল অনুসরণ করে এক রকম জীবনী-শক্তির প্রবাহ রয়েছে। এ জালের বিভিন্ন অবস্থানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু রয়েছে। এক একটি রোগের জন্য এরকম কিছু বিন্দুতে সূঁচ ঢুকাতে হয়— যা সাধারণত কোন ব্যথা বা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ছাড়াই করা যায়। এভাবে বিভিন্ন বিন্দুতে সূঁচ ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ রাখার মাধ্যমে চিকিৎসার এক একটি পর্যায় সম্পন্ন হয়। মনে করা হয় যে এই সূঁচ জীবনীশক্তির প্রবাহকে ভিন্নমুখী করে রোগের উপশম ঘটাবে। তাছাড়া এমন সূঁচ ফোটানো শরীরের স্থান বিশেষে অসাড় ভাব সৃষ্টি করতে পারে অথবা বিশেষ বিশেষ ধরণের সংবেদনশীলতাও সৃষ্টি করতে পারে— যাও চিকিৎসার সহায়ক হয়।

কখনো কখনো আকুপাংচারের সঙ্গে অথবা আলাদা ভাবে আরো এক ধরণের চিকিৎসা করা হয়। এতে শরীরের চামড়ার নানা বিশেষ বিশেষ স্থানে উল্টা করা ছোট ছোট কাপ দিয়ে চাপ দেয়া হয়। কাপটি খানিকটা গরম করে বায়ুশূন্য করাতে এখানে চামড়া চোষার মত কাপের ভেতর কিছুটা ঢুকে লেগে থাকে। মনে করা হয় এখানে স্থানীয় ভাবে রক্ত প্রবাহ বেড়ে চিকিৎসার সুবিধা হয়। ব্যথা উপশমের জন্যও এই দুই চিকিৎসার সমন্বয়কে খুবই কার্যকর বলে দাবী করা হয়, এমনকি অস্ত্রোপচারে আবেদন করার জন্যও। এ ক্ষেত্রেও সাফল্যের দাবীগুলো বৈজ্ঞানিক আয়োজনে যাচাইয়ে প্রমাণিত না হলেও এর জনপ্রিয়তা এখনো বর্তমান।

বিজ্ঞান বহির্ভূত সাব্যস্ত করার শর্ত কী?

আগেই বলেছি বিজ্ঞান এবং মেকি বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করার সীমানাটি নির্ধারণের জন্য বিজ্ঞান-দার্শনিকরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন। বহু ক্ষেত্রে উভয়ে এমন ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে থেকে কাজ করেছে যে এই সীমানা নির্ধারণ সব সময় সহজ হয়নি, বিশেষ করে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য পরিস্থিতির ও জনমতের যথেষ্ট চাপ যখন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে মেকি বিজ্ঞান যে বিজ্ঞান নয় তা স্পষ্ট বোঝা যাওয়া সত্ত্বেও ঠিক অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দেয়া যাচ্ছিলনা কেন এটি বিজ্ঞান

নয়। এ কাজটিই গত শতাব্দীর বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-দার্শনিকরা বেশ যত্ন করে করার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানের বেশধারী অন্য বিষয়গুলো অনেক সময় বলার চেষ্টা করে যে ঠিকই এটি প্রচলিত অর্থে বিজ্ঞান নয়— মূলস্রোতের বিজ্ঞান হবার বদলে এটি বরং একটি বিকল্প বিজ্ঞান, অন্য রকমের বিজ্ঞান হওয়াতেই অন্য পদ্ধতিতে চলে। এমন কথাও মুষ্টিমেয় আধুনিক পণ্ডিতকে বলতে শোনা গেছে যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যভেদে বিজ্ঞান বিভিন্ন ঘরানার হতেই পারে। কিন্তু এমনটি যে হতে পারে না, বিজ্ঞানের যে একটিই বিশ্বজনীন রূপ, এই স্বীকৃত বিষয়টিই তাঁরা ভুলে যান। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে কোন বক্তব্য হয় একক ভাবে বিজ্ঞান, নয় বিজ্ঞান নয়। একই ঘটনার ব্যাখ্যায় দু'রকমের বিজ্ঞান থাকা দূরে থাক্, একই সঙ্গে সঠিক দুটি তত্ত্ব থাকাও সম্ভব নয়। কোন্‌টি সঠিক তত্ত্ব তা নির্ণয়ের শর্ত বিজ্ঞান সমাজ নিজেই ঠিক করে নিয়েছে এবং সে সমাজই বিজ্ঞান-দার্শনিক রূপে সে ব্যাপারে খবরদারি করে থাকে।

মিথ্যাকরণের সুযোগ আছে কিনা:

বিজ্ঞান-দার্শনিক কার্ল পপার একটি গ্রহণযোগ্য তত্ত্বের শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন সেই তত্ত্বটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সম্ভব কিনা তার সুযোগকে। মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা হিসেবে এই শর্তটিকে আমরা এখানে প্রথম অধ্যায়েই দেখেছি। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্টে তত্ত্বটিকে যাচাইয়ের জন্য সোপর্দ করেই এই মিথ্যাকরণের চেষ্টাটি করা হয়। যে তত্ত্বকে এভাবে সোপর্দ করার সুযোগ নেই তার গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হবার বা বিজ্ঞান হবার প্রশ্নই ওঠেনা। এমন সুযোগ (মিথ্যাকরণ-যোগ্যতা) যেই তত্ত্বের যত বেশি থাকবে সেটি তত ভাল তত্ত্ব। আর সেই যাচাইয়ের পরীক্ষায় মিথ্যাকরণের চেষ্টা ব্যর্থ হলে তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য হয়। এভাবে যেই তত্ত্ব যত বেশি রকমের মিথ্যাকরণের পরীক্ষায় যাচাইয়ের পরীক্ষায় অর্থাৎ পাশ করবে সেটি তত বেশি প্রতিষ্ঠিত হবে।

পপার এই মিথ্যাকরণ-যোগ্যতাকে মেকি বিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞানকে আলাদা করার শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছিলেন। তিনি নিজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শর্তটি প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সাধারণত মেকি বিজ্ঞানের বক্তব্যগুলো এমন হয় যে কোন পরীক্ষাতেই তা মিথ্যা প্রমাণ করার সুযোগ থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ পপার লক্ষ্য করেছিল ফ্রয়েডের মতবাদ সত্য নয় এমন কথা কোন এক্সপেরিমেন্টের আয়োজন করে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। যেমন অবচেতন মন আছে কিনা, তার সঙ্গে চেতনার সংঘাত আছে কিনা, ঈড-ইগো-সুপার ইগো এগুলো কোথায় কী ভাবে আছে এসবকে কোন যাচাই প্রক্রিয়ায় সোপর্দ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই মতবাদের ভেতরে মিথ্যা প্রমাণিত হবার কোন ঝুঁকি নেই। কিন্তু বিজ্ঞান হতে গেলে এই ঝুঁকি থাকতেই হবে। এভাবেই পপার দেখাবার চেষ্টা করেছেন সাইকোএনালাইসিস আর যাই হোক বিজ্ঞান নয়।

এভাবে বিজ্ঞান হবার দাবীদার অনেক কিছুতেই দেখা যাবে যে এর মধ্যে মিথ্যাকরণের কোন সুযোগ নেই। জ্যোতিষবিদ যখন শুভ-অশুভ বিধান দেবার জন্য হরোস্কোপের ব্যাখ্যা করেন তখন অনেক কিছু কিন্তু আবছা থাকে যার ফলে প্রায়ই একেবারে নিশ্চিত করা অসম্ভব হয় যে তাঁর ব্যাখ্যাটি ভুল। যদি সব ক্ষেত্রে এমন হতো তাহলে ওই কারণেই পত্রপাঠ বলে দেয়া যেতো যে জ্যোতিষবিদ্যা বিজ্ঞান নয়। তবে যে ক্ষেত্রে জ্যোতিষবিদ্যা স্পষ্ট কিছু দেখিয়ে এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে যে সেটি সত্য না মিথ্যা তা পরিস্কার বোঝা যাবে— যেমন খেলায় জিতবো কি জিতবোনা, বৃষ্টি হবে কি হবেনা ইত্যাদি— তখন তাকে মেকি বিজ্ঞান বলার জন্য ওই ফলাফল পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। যদি অনুরূপ অনেকগুলো ক্ষেত্রে তার ভবিষ্যদ্বাণী শুধু কোন কোন ক্ষেত্রেই সত্য হচ্ছে যা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে দৈবক্রমে এমনিতেই হতে পারে, তা হলে সে কারণেই সেটি মেকি বিজ্ঞান বলে প্রমাণিত হয়। জ্যোতিষবিদ্যার মত জিনিস ওভাবেই চূড়ান্তভাবে মেকি বিজ্ঞান বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

ধাঁধাঁ সমাধানের সামর্থ্য আছে কিনা:

কার্ল পপার বলেছেন বিজ্ঞান ইতিহাসে বিজ্ঞানীরা সব সময় তাঁদের তত্ত্বের মিথ্যাকরণের চেষ্টা করেছেন। পরে টমাস কূন দেখিয়েছেন বিজ্ঞানীরা এটি শুধু বৈপ্লাবিক নতুন তত্ত্ব আসার সময় করেন। তখন বৈপ্লবিক তত্ত্বের সমর্থন করা যায় কিনা এটা দেখার জন্য চলতি প্রধান তত্ত্ব এবং বৈপ্লবিক তত্ত্ব এই উভয়টিকে মিথ্যাকরণের যাচাইয়ে তাঁরা সোপর্দ করেন। বাকি পুরোটা সময় তাঁরা বরং ওই চল্‌তি প্রধান তত্ত্বটিকে ব্যবহার করে নানা ধাঁধার সমাধান করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তত্ত্বের প্রয়োগে যেখানে যে সমস্যা দেখা দেয় সেগুলোর সমাধানের চেষ্টা করেন। এ সময়টিকে কূন বলেছেন স্বাভাবিক বিজ্ঞানের সময়। স্বাভাবিক বিজ্ঞানের সময়ে এই ধাঁধা সমাধানের সামর্থ্যই বিজ্ঞান হবার আরেকটি শর্ত।

জ্যোতির্বিদ্যা আর জ্যোতিষবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণের চেষ্টা করে ব্যাপারটি দেখা যাক। বিজ্ঞান যদি মূল কোন তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে কোন সমস্যার সম্মূখীন হয় তখন বিজ্ঞানীরা প্রচলিত ওই মূল তত্ত্বকে সামান্য সংস্কার করে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করেন। জ্যোতির্বিদ্যা হাজার হাজার বছর ধরে এ কাজ করে এসেছে। সেই প্রাচীন ব্যবিলনের, মিশরের, বা গ্রীসের জ্যোতিবিদ্যায়ও যখনই আরো ভাল পরিমাপের ফলে দেখা গেছে যে চাঁদ, সূর্য বা গ্রহের গতির হিসাব বিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণীর থেকে বা প্রচলিত ক্যালেন্ডারের হিসেব থেকে কিছু ভিন্ন হচ্ছে তখন চাঁদ-সূর্য-গ্রহের বিশ্ব-ছবিতে অথবা ক্যালেন্ডারে কিছু সংস্কার এনে এর সমাধান করা হয়েছে। এভাবে প্রাচীন গ্রীক বিশ্ব-ছবিতে আকাশ গোলকের সংখ্যায় পরিবর্তন আনা হয়েছে, পরে টলেমির হাতে এপিসাইকেলের সংখ্যাতেও পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। আর এ কারণেই জ্যোতির্বিদ্যা বরাবরই বিজ্ঞান ছিল।

জ্যোতিষবিদ্যায় এভাবে ধাঁধাঁ সমাধানের উপায় নেই— এমনকি জ্যোতিষবিদ্যায় ধাঁধাঁ সৃষ্টিই হয়না। এমনটি হয়না যে জ্যোতিষবিদ্যার ভবিষ্যদ্বাণী ভুল হওয়ার ফলে জ্যোতিষীর মনে ধাঁধা জাগলো, তিনি গবেষণায় লেগে গেলেন যে ভুলের সূত্রটি কোথায়। ধাঁধাঁও লাগেনা, গবেষণাও চলেনা। এই বিদ্যা চলে ঐতিহ্যগত সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের ওপর ভিত্তি করে— যেখানে পরিবর্তনের হাত দেয়া যায় না। গবেষণা করে যদি হাত দেয়া যেতো তা হলে শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়তো কেন সেই ঐতিহ্যগত নিয়ম-কানুনগুলো জ্যোতিষ্কের সঙ্গে ভাগ্যের যে সম্পর্ক দেখাতে চাচ্ছে তা সত্য নয়।

এমনি ভাবে কোন মেকি বিজ্ঞানেই ধাঁধাঁ সমাধানের উপায় থাকে না। মেসমারিজস যখন বার বার রুগীকে সম্মোহন করতে ব্যর্থ হয়েছে তখনো একে গবেষণা-যোগ্য সমস্যা হিসেবে না দেখে বরং মেসমারের তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগে চিকিৎসকের ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হয়েছে, তত্ত্বটির কোন সংস্কারের চেষ্টার প্রশ্ন ওঠেনি। সাইকোএলানাইসিস ফ্রয়েডের পর এ্যাডলার, ইয়ুং প্রমুখের হাতে রূপ বদল করেছে বটে কিন্তু সেটি মতবাদের ভিন্নতার কারণে করেছে, সমস্যা সমাধানে গবেষণার ফল হিসেবে আসেনি। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়া এক জনের মতবাদকে আরেকজনের মতবাদ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করলেই ধাঁধাঁ সমাধান হয়না, বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিপন্নও হয়না। প্রকৃত বিজ্ঞানের বড় আলামতই হলো গবেষণার মাধ্যমে সংস্কারের সুযোগ এবং তারপরও প্রয়োজন হলে বৈজ্ঞানিক ভাবে তার মিথ্যাকরণে নতুন তত্ত্বকে জায়গা করে দেয়ার সুযোগ।

ধারাবাহিক প্রগতির রাস্তা খোলা কিনাঃ

কার্ল পপারের মিথ্যাকরণ-যোগত্যার শর্তকে আরো কঠিন শর্তে পরিণত করেছেন আরেকজন বিজ্ঞান-দার্শনিক ল্যাকোটা। তাঁর মতে একটি তত্ত্ব বিচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞান হবার দাবী করতে পারে না— বিজ্ঞান হতে হলে তাতে ধারাবাহিকভাবে আরো প্রগতিশীল তত্ত্ব সৃষ্টির সুযোগ থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের লক্ষণটি হবে বর্তমান তত্ত্বের প্রয়োগ থেকে আরো উন্নত তত্ত্বের সৃষ্টি হওয়া আর সেগুলো নিজেরাও যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হওয়া। এটি ক্রমাগত হতে থাকাই হলো ধারাবাহিক প্রগতিশীলতা। উদাহরণ স্বরূপ প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যেও এই প্রগতিশীলতা ছিল। চাঁদ-সূর্যের গতিবিধি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের প্রয়োগ থেকে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের মত নাটকীয় ঘটনার কথা আগাম বলে দেয়া সম্ভব হয়েছে— যা ছিল আরো অভিনব ব্যাপার। আরো অনেক পর আবিষ্কার হয়েছে যে দীর্ঘ মেয়াদে যেই তারিখে একটি পূর্ণ সূর্য গ্রহণ হবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ওই সময়ে পৌঁছে দেখা গেছে যে তার ক্ষেত্রে সময়ের কিছু হেরফের হয়েছে। তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে যে আকাশ গোলকের প্রিসেশন নামক খুবই ধীর অন্য রকম একটি গতি

আছে। এই আবিষ্কার ছিল আরো সূক্ষ্ম উন্নততর এক সক্ষমতা, একটি উন্নততর তত্ত্ব। এই রকম প্রগতিশীলতার কারণে সেদিনের জ্যোতির্বিদ্যাকেও আমরা বিজ্ঞান হিসেবে চিনতে পারি।

একই সময়ের জ্যোতিষবিদ্যার মধ্যে কিন্তু সেই প্রগতিশীলতা খুঁজে পাওয়া যায়না, আজকের জ্যোতিষবিদ্যার মধ্যেও নয়। জ্যোতির্বিদ্যায় চাঁদ-সূর্য-গ্রহের যে গতিবিধি জানা গেছে তার ভিত্তিতে রাশিচক্র, হরোস্কোপ ইত্যাদিতে ভাগ্য গণনার নিয়ম-কানুন চিরকালের জন্য তৈরি করে নেয়া হয়েছে। এর থেকে নতুন কিছু সৃষ্টির চেষ্টা হয়নি যে প্রক্রিয়ায় বিষয়টি তৈরি হয়েছে তাতে ওটি সম্ভবও ছিলনা। জ্যোতিষবিদ্যায় প্রগতির সুযোগ ছিলনা, যা জ্যোতির্বিদ্যায় ছিল। এই পার্থক্যটি শেষ পর্যন্ত উভয় বিদ্যাকে আলাদা করে দিয়েছে। জ্যোতিষবিদ্যার কোন পর্যায়ে তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে বৈজ্ঞানিক ভাবে যাচাইয়ের চেষ্টা করা হয়নি। যেমন সূর্য-গ্রহণ সব সময় অমঙ্গল বয়ে আনে কিনা তার কোন যাচাই দেখা যায়নি। যা যাচাই হয়না তাতে কখনো নতুন কিছু আসলেও তার ফলে প্রগতি ঘটেছে কিনা তা বোঝার উপায়ও নেই। জ্যোতিষবিদ্যার মত অন্যান্য সব মেকি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই প্রগতিশীলতার অভাব দেখা যায়, যেটিই তাকে শেষ পর্যন্ত মেকি বিজ্ঞান সাব্যস্ত করতে যথেষ্ট।

বিজ্ঞানের সামগ্রিকতার সঙ্গে মিলমিশ আছে কিনা:

তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা মিলে বিজ্ঞানের মধ্যে একটি সামগ্রিকতা আছে। এ সামগ্রিকতা সৃষ্টি হয় সব শাখার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে, যা সম্ভব এদের প্রত্যেকটির তত্ত্বের প্রকৃতি, চর্চার পদ্ধতি, মডেলিঙের ভঙ্গি ইত্যাদির ঐক্যের কারণে। এই ঐক্য, বা এই সামগ্রিকতার সঙ্গে মিলমিশ খায়না এমন কোন বেসুরো তত্ত্বের বিজ্ঞান হবার দাবীকে সন্দেহের চোখে দেখা হতে বাধ্য। এটিও বিজ্ঞানকে মেকি বিজ্ঞান থেকে আলাদা করার ক্ষেত্রে একটি শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

একটি খুব সাধারণ উদাহরণ নেয়া যাক। যখন একটি জিনিসের ওপর অন্যটির প্রভাব থাকে, এখন সেই প্রভাব খাটানো জিনিসটির মাত্রা যত বেশি হবে, প্রভাবও তত বেশি হবে এটিই বিজ্ঞানের সর্বত্র প্রচলিত— সাধারণ জ্ঞানেরও সর্বত্র প্রচলিত। ফলে গতি বিজ্ঞানে বল যত বেশি হয় ত্বরণ তত বেশি হয়, কারণ বলের প্রভাবেই ত্বরণ সৃষ্টি হয়। কেমিস্ট্রিতে এসিডের সঙ্গে যত বেশি এ্যালক্যালী মেশানো হয় মিশ্রণটির এসিড-ধর্ম তত হ্রাস পেয়ে এ্যালক্যালী ধর্মের দিকে চলে যেতে থাকে। জীববিজ্ঞানে প্রাণী-দেহে যত অধিক বিষ ঢুকবে তাতে বিষক্রিয়া ততই বাড়তে থাকে। এটি বিজ্ঞানের সামগ্রিকতার একটি চিত্র। এর মধ্যে হোমিওপ্যাথি এসে যদি বলে যে তার ওষুধ পানি দিয়ে যত পাতলা করে নেয়া হবে ওষুধের কার্যকারিতা তত বাড়বে,

এমনকি ওষুধের অস্থিত্ব প্রায় খুঁজে পাওয়া যাবে না এমন পাতলা করলেও, তখন সন্দেহ সৃষ্টি হয় বৈ কি! এমন উল্টো ব্যাপার বিজ্ঞানের কোথাও কখনো দেখা যায়নি যে। আর তা যৌক্তিকও নয়। যদি না হোমিওপ্যাথি তার এই যুগান্তকারী নীতির সমর্থনে জোরালো এবং প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক কারণ না দেখাতে পারে তাহলে এই নীতিকে বিজ্ঞানের সামগ্রিকতায় স্থান দেয়া সম্ভব নয়। এমন কারণ কখনো দেখানো হয়নি, তাই গোড়া থেকেই হোমিওপ্যাথিকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বলতে আপত্তি ছিল।

এভাবে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত আলামতগুলোর দিকে লক্ষ্য করে সেগুলোর এমন কিছু ব্যত্যয়ের তালিকা তৈরি করা যায় যার বিভিন্নটির কারণে একটি বিষয় মেকি বিজ্ঞান হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারে। এমন তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ হতে পারে বটে তবে সচরাচর ঘটা ব্যত্যয়গুলো লক্ষ্য করে প্রধান কয়েকটিকে উল্লেখ করা যায়। মনোমুগ্ধকর কোন ব্যক্তিত্বের জোরালো মতবাদ হিসেবে এসেছে এটিই যদি কোন তত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি হয় তাহলে সেটি হবে এমনি একটি ব্যত্যয়। তিনি হয়তো বাহ্যিক ভাবে নানা সম্পর্কের যুক্তি দেখিয়ে মতবাদটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারবেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিয়ে দেবার পরীক্ষার সম্মুখীন না করলে সেটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হবেনা। একই ভাবে এমন একটি মাত্র এক্সপেরিমেন্টের বা পর্যবেক্ষণের দোহাই দিয়ে কোন কিছুকে বিজ্ঞান বলে দাবী করা যায়না, যে এক্সপেরিমেন্টকে ইচ্ছেমত পুনরাবৃত্তি করে আবার একই ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়। কোন তত্ত্বের সমর্থনে যদি শুধু বাছাই করে নেয়া একটি বা কয়েকটি ঘটনাকে বার বার উল্লেখ করতে হয় তা হলেও সেটি বিজ্ঞান হবেনা। কোন তত্ত্ব বা তথ্যকে হাতে কলমে পরীক্ষার সুযোগ না থাকলে বা তা করতে অনীহা থাকলেও তেমনটি হবে। কোন তত্ত্বকে খাড়া করার জন্য যদি শুধু তার পক্ষের উদাহরণ, তথ্য ও ফলাফলগুলোকে পাওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং বিপক্ষেরগুলো পাওয়ার ক্ষেত্র সমূহকে যদি এড়িয়ে যাওয়া হয়, বা পেলেও তুচ্ছ করা হয়, তা হলেও সেটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হবার সুযোগ খুব কম। উদাহরণ স্বরূপ এমন এক্সপেরিমেন্টের যদি আয়োজন করা হয় যাতে যে কোন পরিস্থিতিতে তত্ত্বটি সঠিক প্রমাণিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই, ভুল প্রমাণিত হবার কোন সুযোগই নেই তা হলে সেই এক্সপেরিমেন্টের নিরিখে কোন কিছু বিজ্ঞান প্রমাণিত হতে পারে না। অনেক সময় কোন মতবাদ খাড়া করা হয় বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন তত্ত্বকে নাকচ করার চেষ্টায়। সেক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বটি ইতোমধ্যে যে সব বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারছে নতুন মতবাদে সেগুলোর ভাল বিকল্প ব্যাখ্যা যদি না মিলে তাহলে তাতে জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটার চেয়ে বরং তার সংকোচনই ঘটে। কাজেই প্রমাণিত বিকল্প ব্যাখ্যা না দিয়ে শুধু নাকচ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসা তত্ত্বও বৈজ্ঞানিক হতে পারে না। নানা মেকি বিজ্ঞানের মধ্যে এসব ব্যত্যয়গুলো সচরাচর দেখা যায় বলেই ব্যত্যয়ের এই তালিকায় সেগুলোকে আনা হলো।

বিজ্ঞানকে 'না' বলার জন্যই সৃষ্টি হয় কিনা:

কিছু কিছু মেকি বিজ্ঞান খাড়া করা হয় নিজের কোন অবদানকে প্রয়োগ করার জন্য নয়, বরং তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে কোন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। কাজেই নিজের তত্ত্বের সঠিকতা তুলে ধরতে এর যত না আগ্রহ থাকে, বিজ্ঞানের ওই তত্ত্বের খুঁত ধরতেই বরং উৎসাহ থাকে বেশি। উদাহরণ স্বরূপ জীব বিবর্তন তত্ত্বকে নাকচ করার চেষ্টায় এরকম বেশ কিছু মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো জীববিজ্ঞানে নিজেদের কোন অবদান রাখার চেষ্টা করেনা। যেমন বিবর্তন তত্ত্ব জীব জগতের যে অসংখ্য রহস্যের সমাধান করেছে এসব 'না' বাচক মতবাদ তার কোনটির বিকল্প সমাধান দিতে সচেষ্ট নয়। বিবর্তন তত্ত্বের কোন্ যুক্তিতে কীরকম ফাঁক আছে তার উদ্ঘাটনই এদের একমাত্র চেষ্টা। বিরোধী তত্ত্ব নিজের তত্ত্বের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ না দিয়ে একবার বলেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবর্তন তত্ত্ব অসম্ভব ভাবে চান্সের ঘটনার ওপর নির্ভর করে। এর যৌক্তিক উত্তর দেবার পর বলেছে পূর্বের প্রাণী ও পরের প্রাণীর মাঝখানের অনেক ফসিল পাওয়া যায়নি (মিসিং লিংক)। ফসিল আবিষ্কৃত হবার পরও বের করার চেষ্টা করেছে অন্য কোন খুঁত। এমনি আরেকটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের অস্বীকার করা মতবাদগুলো। জলবায়ু পরিবর্তনের যতগুলো স্পষ্ট পরিমাপকৃত প্রমাণ বহু বিজ্ঞানী বিভিন্ন গবেষণায় তুলে ধরেছেন সেগুলোকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়াতেই যেন এ মতবাদগুলোর যত প্রেরণা। এ জন্য অবশ্য এদেরকেও বিজ্ঞান-বেশে আসতে হয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রামাণ্য তথ্যগুলো নিয়ে তর্ক তুলতে হয়। এগুলো প্রধানত দেখাতে চায় যে পরিবর্তনগুলোর স্বাভাবিক ভাবেই উত্থান-পতন হচ্ছে, এর মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা নেই এবং এজন্য ভবিষ্যতে কোন সংকট নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো এগুলোর সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যতই না তেল-কয়লা পুড়ি, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস আকাশে যেতে দিই তার ফলে জলবায়ুর কোন ইতর-বিশেষ ঘটবেনা। কোন কোন মহলের কাছে এরকম অস্বীকারের মেকি বিজ্ঞান খুবই প্রয়োজনীয়; তাই খুব উচ্চ পৃষ্ঠপোষকতা এরা পায়।

অনেক সময় ওভাবে কারো কাছে স্পষ্টত প্রয়োজনীয় না হয়েও অস্বীকারের অন্যান্য নানা মেকি বিজ্ঞান গড়ে উঠতে দেখা যায়। যাঁরা এসব গড়ে তোলেন প্রায়শ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সঙ্গে এবং তার দ্বারা সৃষ্ট পরিমাপ ও তথ্য ভান্ডারের সঙ্গে তাঁদের তেমন যোগাযোগ থাকে না। খুব হালকা যুক্তিতেই নিজেদের কথা তাঁরা বলতে থাকেন— কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক মানুষের যথেষ্ট মনোযোগ পান। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের চাঁদে যাওয়াকে অস্বীকার করা, টিকা দান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণ করা ইত্যাদি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এসব অস্বীকার-তত্ত্বের পেছনে কোন না কোন

স্বার্থ কাজ করে, এবং তা শেষ পর্যন্ত মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ধূমপানের বিপদকে অস্বীকার, মানব-সৃষ্ট দূষণ-মাত্রাকে অস্বীকার, জীব-বৈচিত্র ধ্বংসের ক্ষতিকে অস্বীকার ইত্যাদি। এগুলো যে বিজ্ঞান বহির্ভূত কথা তা প্রমাণ করা কঠিন নয় বটে, কিন্তু সর্ব সাধারণের কাছে দৃশ্যমান ও গ্রহণযোগ্য রূপে তা করা হয়না বলেই এসব মেকি বিজ্ঞান তাদের ক্ষতিকারক কাজ অব্যাহত রাখতে পারে। আসলে নানা ধরণের নানা মেকি বিজ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার জিনিসটি সম্পর্কেই প্রচুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

বিজ্ঞানকে চেনাটাই আমাদের রক্ষাকবচ, আমাদের আনন্দও বটে

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সাধারণ ভাবে সব মানুষ যদি বিজ্ঞানকে চিনে নিতে না পারে, আর সেটি চেনাবার কাজে বিজ্ঞানীরা সহ সবাই যদি নির্লিপ্ত থাকে, তা হলে ব্যক্তিগত জীবন থেকে একেবারে বৈশ্বিক জীবন পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের শুরুতেই আমরা দেখেছি যে অনেক সময় বিজ্ঞান নানা বিভ্রান্তিকর ভাবেও সর্ব সাধারণের কাছে আসতে পারে— বিজ্ঞান-বিবর্জিত 'বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী' থেকে যেমন আসে, নানা রকম প্রচার যন্ত্র থেকেও আসে। এখন দেখলাম বিজ্ঞানের বেশে নানা মেকি বিজ্ঞান থেকেও এগুলো আসে— যার অনেকগুলো নানা কারণে জনপ্রিয়ও হয়। খুব চিরাচরিত সোজাসাপটা কয়েকটি চিহ্ন দিয়েই বিজ্ঞানকে চিন্‌তে চাইলে ভুল হতে পারে, এবং ভুলের ফলাফল বেশ ক্ষতিকরও হতে পারে। কাজেই শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানকে ঠিক ভাবে চেনার মধ্যেই রয়েছে আমাদের রক্ষাকবচ। তাছাড়া আমাদের আনন্দ ও কৌতুহলের প্রশ্নটিও এর সঙ্গে জড়িত। বিজ্ঞান কী বলে সেটি জানাটি আমাদের অনেক আনন্দের কারণ হতে পারে— যে রকম অনাবিল আনন্দ আমরা একটি ভাল কবিতা বা সঙ্গীত থেকে পাই সে রকম। ঠিক তেমনি কী ভাবে বিজ্ঞান তা বলে সেটিও একই রকম আনন্দের উৎস হতে পারে। এমন দারুণ সফল বিজ্ঞান যা আমাদেরকে বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষমতা দিয়েছে, দিয়েছে প্রকৃতিকে জয়ের ক্ষমতাও— তার সাফল্যের চাবিকাঠি জানতে কৌতুহল থাকাটাই তো স্বাভাবিক।



ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞান লেখক হিসেবে এবং নানা মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে এদেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করে আজ অবধি তার সম্পাদনা করছেন। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), এখনো তিনি যার নেতৃত্বে। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার সহ বেশ কিছু সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কারপ্রাপ্ত এ লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর।

ড. ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস বাংলাদেশের অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর।

